রাগিণী

রাগিণী

(মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস)

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রথম সংস্করণ
ফাল্গুন, ১৩৫৮

প্রকাশক :
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
৪২নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট :
শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :
শ্রীসুকুমার চৌধুরী
বাণীশ্রী প্রেস
৮৩বি বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা—৬

দাম চার টাকা

সমর্পণ

কলা-শিল্পানুরাগিণী

হেতমপুরের বধূরাণী

নদীয়ার মহারাজকুমারী

শ্রীযুক্তা জ্যোৎস্নাময়ী দেবীর

করকমলে

স্নেহাশীর্বাদস্বরূপ

গ্রন্থখানি

সমর্পিত হইল

পরিচয়

'রাগিণী' উপন্যাসখানির পিছনে একটি কাহিনী আছে—সেটি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। বর্তমান বর্ষের প্রথমেই এই মৌলিক কাহিনীটি কোন সাময়িক পত্রিকার জন্যই রচনা করি। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে স্নেহভাজন সাহিত্যিক-সুহৃদ্ যশস্বী চিত্র-পরিচালক শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্তের আগ্রহে ভারতী-চিত্র-পীঠের সহিত এই কাহিনী সম্পর্কে চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় ইহা আর সাময়িক পত্রে বাহির করা সম্ভব হয় নাই। চুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই ইহার চিত্রায়নের কাজ শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্তের পরিচালনায় আরম্ভ হইলে তাঁহার অনুরোধে আমাকেই কাহিনীটি চিত্র-নাট্যের উপযোগী করিয়া সাজাইয়া দিতে হয়। ৭ই বৈশাখ (২১ এপ্রিল, ১৯৫১) চুক্তি হইলে, ৬ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে শ্যামলীর ভূমিকায় শ্রীমতী প্রণতি ঘোষ, শিবানীর ভূমিকায় শ্রীমতী যমুনা সিংহ, রামময়ের ভূমিকায় শ্রীপাহাড়ী সান্যাল, ঈশ্বর বাকচির ভূমিকায় শ্রীসন্তোষ সিংহ, মঙ্গলের ভূমিকায় শ্রীতুলসী চক্রবর্তী, মহামায়ার ভূমিকায় শ্রীমতী রাণীবালা, মনোরমার ভূমিকায় বেলারাণী প্রভৃতি নির্বাচিতা হইয়া স্যুটিংয়ে যোগদান করেন এবং চন্দ্রনাথের ভূমিকায় আধুনিক সঙ্গীতের প্রতিভাবান সাধক শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, ডাঃ ভাঁদুড়ীর ভূমিকায় নটরবি শ্রীছবি বিশ্বাস, ইন্দ্রাণীর ভূমিকায় নীলিমা দাস প্রভৃতির নাম শোনা যায়। তৎকালে কর্তৃপক্ষের উৎসাহের গতি বেগ দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে, শারদীয়া পূজা-বাসরে ছবিখানি মুক্তি লাভ করিবে। কিন্তু তাহা সম্ভব না হওয়ায় এবং রাগিণীর উপন্যাস-রূপ প্রকাশকল্পে প্রকাশকের সহিত

সর্তবদ্ধ থাকায়—তৎপক্ষের আগ্রহাতিশয্যে ছবির মুক্তির পূর্বেই গ্রন্থ প্রকাশে আমাকে বাধ্য হইতে হইয়াছে।

রাগিণী উপন্যাসখানি সংলাপ-প্রধান বলিয়া ইহার রচনা-শৈলীতে একটি নূতন ধারা গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে সংলাপগুলি সুস্পষ্টভাবে প্রণিধান করা এবং স্বল্প আয়াসে অভিনয়যোগ্য করিয়া লওয়াও সম্ভব হইবে।

এ সম্পর্কে সুবিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ শ্রীবিভূতি দত্ত, সঙ্গীতকার শ্রীজগৎ ঘটক, সঙ্গীত-সুধাকর স্নেহভাজন শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সঙ্গীত সাধকদের সহায়তা আমি সানন্দে স্বীকার করিতেছি। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জগৎ ঘটক রচিত গানগুলির সংযোগে পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থখানির উৎকর্ষ সাধনের ইচ্ছা রহিল। প্রতিষ্ঠাপন্ন ডি, এম, লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীগোপালদাস মজুমদারের সৌজন্যে গ্রন্থখানি তৎপরতার সহিত প্রকাশিত হইল। এজন্য ইঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

সাহিত্য-ভবন
৪২, বাগবাজার ষ্ট্রীট
১৪ই ফাল্গুন, ১৩৫৮

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রাগিণী

অবতরণিকা

এলাহাবাদে একদা তিনটি বাঙ্গালী তরুণ বিশেষভাবে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। চেহারায় চাল-চলনে বিদ্যায় এবং সঙ্গীত-সাধনায় ত্রয়ীর মধ্যে আশ্চর্য রকমের সমতার জন্য শিক্ষিত সমাজে তিন বন্ধু 'থ্রী মাস্‌কেটিয়াস' নামে অভিহিত হন। ইংরাজী সাহিত্যে যাঁহাদের অধিকার ছিল না—অথচ এই তিনটি তরুণের সকল বৃত্তান্তের খোঁজ-খবর রাখিতেন, তাঁহাদের নিকট ইঁহারা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বা ত্রিমূর্তি নামে আখ্যা লাভ করেন।

সাধারণতঃ পরিচিতদের আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে বহু পার্থক্য দেখা গিয়া থাকে ; একই প্রকৃতির দুইটি মানুষও সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু সমান বয়স সমান দেহসৌষ্ঠব সমান বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন এই তিনটি তরুণের প্রকৃতিগত আশ্চর্য সাদৃশ্যের জন্যই সংশ্লিষ্টমহল ইঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। এক্ষেত্রে প্রসঙ্গক্রমে এ-কথাও প্রযোজ্য যে, আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের মত ইঁহাদের সম্প্রীতিও বিস্ময়াবহ।

এলাহাবাদ ইউনিভারসিটি হইতে একই বৎসরে ইঁহারা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া গ্রাজুয়েটের মর্যাদা লাভ করেন। তৎপূর্বেই প্রবেশিকা পরীক্ষার পর কলেজে নাম লিখাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা তিনজন প্রথম পরিচিত হন এবং তাহা অল্পদিনের মধ্যেই ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠে ৺মেস বাড়ীর ত্রিতলের একমাত্র কক্ষটি দীর্ঘদিনের জন্য লীজ লইয়া এক সঙ্গেই ইঁহারা আস্তানা পাতেন। অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গীত-চর্চাতেও তিন বন্ধুই ছিলেন অভ্যস্ত—

সহজাত সংস্কারের মতই এই বিশেষ বিদ্যাটি শৈশব হইতেই ইঁহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এইজন্যই বাছিয়া বাছিয়া মেসের এই অসংলগ্ন ঘরখানি ইঁহারা দেখিবামাত্রই পছন্দ করিয়া ফেলেন। উদ্দেশ্য, এই অবস্থায় অধ্যয়নের অবসরে সর্বোচ্চতালার এই অসংলগ্ন ঘরে তিনবন্ধুর সঙ্গীতের আলাপ চলিলেও মেসের অন্যান্য মেম্বারদের মধ্যে কোন রূপ অসুবিধার সম্ভাবনা ঘটিবে না।

কলেজের ছুটির পর স্থানীয় এক বিখ্যাত কালোয়াতের নিকট তিন বন্ধু নিয়মিতভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষায় ব্রতী হন। বি-এ পরীক্ষার পূর্বেই সঙ্গীত-বিদ্যার পরীক্ষা দিয়া ইঁহারা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। শিক্ষাদাতা সঙ্গীতাচার্য তিনজনকেই আশীর্বাদ করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে ইঁহারা সঙ্গীতজগতে তিনটি নূতন দিক্‌পালের মত প্রভাব বিস্তার করিবেন। কালোয়াতজীর এই আশীর্বাদ কিছুকাল পরে তাঁহারই শ্রাদ্ধ-বাসরে অনুষ্ঠিত এক সুবৃহৎ আসরে সার্থক হইয়াছে দেখা গেল। সহরবাসী বহু বহু বিশিষ্ট সুধী সমক্ষে তিন বন্ধু পর পর তাঁহাদের শিক্ষালব্ধ উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত-সম্পর্কে যে আলাপ করিলেন, তাহাতেই তাঁহাদের দক্ষতা অসামান্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল—একদিনেই তাঁহারা বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। ইহার পরে সুধী-সমাজে এবং সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে তিন বন্ধুর চাহিদা এমনই বর্দ্ধিত হইল যে, তাঁহারা বুঝি কলেজের পড়াশোনা এবং আহারনিদ্রার অবসরও পান না! নানা স্থান হইতে আহ্বান আসিতে থাকে। কিন্তু আহ্বায়কদিগকে ইঁহাদের সর্তানুসারে প্রত্যেক আসরে তিন বন্ধুকেই আহ্বান করিতে হয়, একা একা কেহই কোন গানের আসরে কোনরূপ প্রলোভনেই যোগ দিবেন না—ইহাই যেন তিন বন্ধুর সঙ্কল্প। সুতরাং সেক্ষেত্রে এই ত্রয়ীর সংযোগ ভিন্ন কোন কণ্ঠ হইতে গানের ঝঙ্কার তোলা সম্ভবপর ছিল না।

এরূপ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট সমাজে তিনবন্ধু যদি থ্রী মাসকেটিয়ার্স, ব্রহ্ম-বিষ্ণুমহেশ্বর বা ত্রিমূর্তি নামে অভিহিত হন, তাহাতে বিস্মিত হইবারও কিছু নাই।

এই পর্যন্ত হইল তিন বন্ধুর শিক্ষা-জীবনের কথা ও কাহিনী।

* *
*

গ্রাজুয়েট হইবার পর সুরু হইল ইহাদের কর্মজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে তিন বন্ধুর ইচ্ছানুসারে সংযোগ রক্ষিত হইলেও কর্মক্ষেত্র ত আর পরস্পরের ইচ্ছামত প্রস্তুত হইতে পারে না। অগত্যা, দীর্ঘদিনের অবিচ্ছেদ্য ও একান্ত সংশ্লিষ্ট জীবনযাত্রায় নিদারুণ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা আসন্ন হইয়া তিন বন্ধুকে চিন্তাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল।

গোয়ালিয়র ষ্টেটে সঙ্গীতাচার্যের পদে নিয়োগপত্র পাইলেন রামময় ভট্টাচার্য।

ইহার পরেই হরিহর রায়ের আহ্বান আসিল মুক্তাগাছা রাজবাটী হইতে—রাজকীয় সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে তাঁহাকে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

অবশেষে বারাণসী রাজ ষ্টেটের তহশীলদারের চাকুরী পাইলেন শিবনাথ লাহিড়ী। দেশীয় রাজ্যে তহশীলদারের পদমর্যাদা বৃটিশ সরকারের কোন জেলার হাকিমের অপেক্ষা কোন দিক দিয়াই খাটো নয়—বরং দপদপা আরও বেশী।

তাই রামময় ও হরিহর ভাবী তহশীলদার বন্ধুকে বলিলেন: দেখো হে, থ্রী মাসকেটিয়ার্স ওরফে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নামের দেমাক যেন খুইও না—জমি জমা আর টাকার স্তূপের মধ্যে গীর্দেবীর বীণাখানি চাপা

পড়ে না যায় ; কেননা, তিন বন্ধুর মধ্যে তুমিই ভিন্ন পেশা নিয়ে এখন দল ছাড়া হোলে !

শিবনাথ হাসিতে হাসিতে জবাব দিলেন : ষ্টেটের তহশীলদারী নেবার মানেই মহারাজের সঙ্গীতসভাতেও ধীরে ধীরে সেঁধিয়ে পড়া— ওখানেও গানের কদর আছে। তা ছাড়া, তিন বন্ধুতে গোড়া থেকেই যখন পণ করে রেখেছি—কখনো আদর্শ-ভ্রষ্ট হবো না !

রামময় একথা শুনিয়া খপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন : বেশ, তাহলে এসো—ছাড়াছাড়ির মুখে সেই পণটি আবার নূতন করে মনের সঙ্গে যোগ করে নিই ; এর উপরে—ঐ সঙ্গে যদি আরো কিছু নূতন কথা বসানো যায়, ভেবে চিন্তে এখনই ঠিক করে ফেলা ভালো।

ফলে, ছাত্র-জীবনে তিন বন্ধু যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেইটি নূতন করিয়া আরো কিছু কিছু নূতন কথার সংযোগে কাগজে লিপিবদ্ধ করা হইল এবং সেই পণপত্রের প্রতিলিপি একখানি করিয়া প্রত্যেকের নিকট গচ্ছিত রহিল। তিন বন্ধুর প্রতিজ্ঞাপত্রের কথাগুলি অবিকল এইরূপ :

> কর্ম-জীবনে আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেও ছাত্র-জীবনের সম্প্রীতি আমাদের মধ্যে বরাবর অক্ষুণ্ণ থাকিবে। বিবাহের পর আমাদের সন্তান সন্ততি হইলে আমাদের দৃষ্টান্তে তাহারাও পরস্পর প্রীতিবদ্ধ রহিবে। উপরন্তু, আমাদের জাতি বর্ণ গোত্রাদি পরস্পরের অনুকূল থাকায়—পুত্র কন্যাদের বয়ঃক্রম প্রতিকূল না হইলে তাহাদিগকে দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ করিতে আমরা প্রত্যেকে বাধ্য থাকিতেছি। ঈশ্বর না করুন,

আমাদের মধ্যে কাহারও জীবনে কখনো
আর্থিক দুর্ভোগ আসিলে আমরা মিলিতভাবে
সেই দুর্ভোগ নিবারণে বদ্ধপরিকর হইব।
আমরা যে-কোন কার্যে ব্রতী হইনা কেন,
ছাত্রজীবন হইতে যে আদর্শে অনুপ্রাণিত,
কদাচ তাহা হইতে বিচ্যুত হইব না। সর্ব-
নিয়ন্তাকে সাক্ষ্য রাখিয়া আমরা এই পণ-পত্রে
স্বাক্ষর করিতেছি। জীবন-যাত্রায় আমরা
অন্তর দিয়া এই অঙ্গীকার করিতেছি—
আমাদের বংশধরগণও ইহা সম্যকরূপেই
উপলব্ধি করিয়া পিতৃপক্ষের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা
নিষ্ঠাসহকারে পালন করিতে বাধ্য থাকিবে।

সেদিন এলাহাবাদে মেসের কক্ষে বসিয়া তিন বন্ধু এইরূপ তিনখানি অঙ্গীকার-পত্র সম্পাদনের পর প্রত্যেকে স্বাক্ষর করিলেন এবং ইউনি-ভারসিটির সারটিফিকেট পত্রের সহিত সদ্য সম্পাদিত এই পত্র সযত্নে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

ইহার পর একদিন তিন বন্ধু এক সঙ্গেই তাঁহাদের দীর্ঘকালের বাসগৃহ হইতে বাহির হইয়া পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে রওনা হইয়া গেলেন।

প্রথম প্রথম কর্মস্থল হইতে নিয়মিতভাবে পরস্পরের মধ্যে পত্রের আদান প্রদান চলিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে তাহার পরিমাণ সংক্ষিপ্ত হইয়া অবশেষে বিজয়া দশমীর সাদর-সম্ভাষণ জ্ঞাপনের সময়টিতে আসিয়া অতীতের স্মৃতি কোন প্রকারে বজায় রাখে।

* * *

এলাহাবাদে মেসের বাড়ীতে ছাড়াছাড়ির পর তিন বন্ধুর মধ্যে পুনরায় সাক্ষাৎকার ঘটিল দীর্ঘ বারো বৎসর পরে কলিকাতা টাউনহলে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনকে উপলক্ষ করিয়া। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতবেত্তা রূপে তিনজনেই তখন দেশ-বিখ্যাত এবং যথাক্রমে গোয়ালিয়র, কাশী ও মুক্তাগাছা এই তিনটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-পীঠভূমির ইহারা গৌরব স্বরূপ। সুতরাং সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণই পাথেয়াদি পাঠাইয়া তিন বিশিষ্ট সঙ্গীত সাধককে কলিকাতায় আনিয়াছেন।

সম্মেলনের অধিবেশনের আগের দিন ডেলিগেট-ক্যাম্পের ফরাসে তিন বন্ধুর বৈঠক বসিয়া গেল। দীর্ঘ বারোটি বৎসর যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে—তাঁহাদের মনে হইতেছিল, বুঝি এলাহাবাদের মেসে বসিয়াই গল্প করিতেছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তিন বন্ধু পরস্পরের জীবন-যাত্রার আগাগোড়া হিসাব লইতে মাতিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সুদীর্ঘ সংলাপের মোটামুটি মর্ম এই রূপ:

গোয়ালিয়রবাসী বন্ধু রামময় ভট্টাচার্য জানাইলেন যে, সঙ্গীতে অধিকার থাকায় গোয়ালিয়র রাজের সভায় তিনি পাইয়াছেন আশাতীত প্রতিষ্ঠা। এখন সঙ্গীত তাঁহাকে এমনই অভিভূত করিয়াছে যে, তাঁহার জীবনটাই সঙ্গীতময় হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় সঙ্গীতের মাহাত্ম্য ও সবিশেষ তত্ত্ব প্রচারেই তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এজন্য বিবাহের অবসর পান নাই এবং অতঃপর সে ইচ্ছাও নাই। সঙ্গীত সাধনাতেই অবশিষ্ট জীবনটি সচ্ছন্দে ও সানন্দে কাটাইয়া দিবেন।

কাশীর তহশীলদার বন্ধু শিবনাথ লাহিড়ীর কথায় জানা গেল যে, তহশীলদারী চাকুরীর উপর তিনি কাশীরাজের সভাতেও বিশেষ মর্যাদা

পাইয়াছেন। মহারাজা তাঁহাকে বারাণসীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদের সম্মান এবং স্বতন্ত্র বৃত্তি দিয়াছেন। কাশীতে বাড়ী করিয়াছেন। বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছেন। গৃহিণী একটি পুত্ররত্ন উপহার দিয়াছেন; শিশুটি তাঁহারই মত স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর—এখন চারিবৎসরে পড়িয়াছে।

মুক্তাগাছার বন্ধু হরিহর রায় বলিলেন যে, সঙ্গীতানুরাগী মুক্তাগাছা-রাজের স্নেহ যত্ন ও আদর আপ্যায়নে পরম সুখেই তাঁহার দীর্ঘ দিনগুলি কাটিয়াছে। তবে সম্পতি কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য দেখা দিয়াছে। ঐ অঞ্চলের এক সুপণ্ডিত কবিয়ালের কন্যাকে তিনি সহসা বিবাহ করায় রাজাবাহাদুর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। উক্ত কবিয়ালের প্রতি তিনি নাকি বহুদিন হইতেই অপ্রসন্ন। কিন্তু এই বিবাহের ফলে অসামান্য রূপ গুণবতী পত্নীর সাহচর্যে তিনি যেমন সুখী হইয়াছেন, তাঁহার শ্বশুরের সংগৃহীত পল্লীবাঙ্লার প্রাচীন কবিদের সঙ্গীত-সম্ভার পাইয়া তেমনই লাভবান হইয়াছেন। তাঁহার পত্নীও বিদূষী এবং সুগায়িকা।

শিবনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন: সন্তানাদি হয়েছে?

হরিহর জানাইলেন: সম্ভাবনা আছে—ব্রাহ্মণী অন্তঃসত্বা।

রামময় সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন: সাধু, সাধু! এখন বিধাতার ইচ্ছায় হরিহরের ব্রাহ্মণী যদি একটি কন্যারত্ন স্বামীকে উপহার দেন, তাহলে আমাদের সেই প্রতিজ্ঞা সার্থক হতে পারে। শিবনাথ ত বললেন—ওঁর ছেলের বয়স সবে চার বৎসর চলেছে। এখন হরিহরের একটি কন্যা হলেই রাজযোটক হবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—হরিহরের একটি কন্যাই হোক।

কথাটার সমর্থন করিয়া শিবনাথ সানন্দে বলিলেন: আমিও এই প্রার্থনাই করছি—এরপর এই শুভ সম্ভাবনাটি সত্য হবা মাত্রই হরিহর যেন সংবাদ দিতে ভুল কোর না হে! সময়ের এই ব্যবধান দেখে আশা

হচ্ছে যে, আমাদের অঙ্গীকার সার্থক করবার জন্যে বিধাতা পুরুষ তোমাকে একটি কন্যারত্নই দান করবেন।

সহাস্যে হরিহর বলিলেন: এখন দেখা যাক, ইচ্ছাময় কি করেন! তাঁর যদি সত্যই এ ইচ্ছা হয়, তাহলে হয়ত এক দিন সকন্যা হঠাৎ কাশীধামে গিয়ে তোমাকে তাক লাগিয়ে দেওয়া যাবে।

শিবনাথও তৎক্ষণাৎ গম্ভীর মুখে বলিলেন: শুধু সকন্যা—সস্ত্রীকও বল! তাঁকে রেখেই যেতে চাও নাকি? তাহলে কিন্তু সেখানে প্রবেশ নিষেধ জানবে!

শেষের কথাটা বলিয়াই শিবনাথ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

দ্বাদশ বৎসর পরে এইভাবে স্বল্প কালের সাক্ষাৎকার, আলাপ-আলোচনা এবং ছাড়াছাড়ি। আবার তিন বন্ধু পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে পাড়ি দিলেন।

এই ঘটনার পর আরও ষোলটি বৎসর কাল সমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে তিন বন্ধুর মধ্যে আর সাক্ষাৎকারের কোন অবকাশ ঘটে নাই কিম্বা সর্বনিয়ন্তার ইচ্ছাতেই তাহা সম্ভব হয় নাই।

দীর্ঘ ষোড়ষ বৎসর পরে এই আখ্যায়িকার যবনিকা তুলিয়া নূতন এক পরিস্থিতি আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

প্রথম পর্ব্ব

সেদিন সকালে কাশী ষ্টেসনে ট্রেন থামিলে প্লাটফরম নবাগত যাত্রী সমাগমে ভরিয়া গেল ; সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ভাষী নরনারীদের কোলাহলে স্থানটি মুখর হইয়া উঠিল। জনস্রোত প্লাটফরম হইতে ধীরে ধীরে ষ্টেশনের বাহিরে সুবিস্তীর্ণ হাতায় আসিতেই যানবাহনের চালকগণের মধ্যেও চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গেল। ঘেরা গাড়ী, টাঙ্গা ও একাগুলি সেই বিপুল জনস্রোতে জলযানের মত পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল।

দীর্ঘাকৃতি শীর্ণকায় এক বর্ষীয়ান পুরুষ দিব্য স্বাস্থ্যবতী অনিন্দ্যসুন্দরী ষোড়শী কন্যার হাতখানি ধরিয়া সেই ভীড়ের ভিতর দিয়া অদূরবর্ত্তী রাজপথের দিকে ভারবাহী দুইটি কুলীর পিছনে পিছনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। কুলীরা ইঁহাদেরই মালপত্র লইয়া আগে আগে যাইতেছিল। বিপুল জনতা এবং গাড়ীওয়ালাদের যাত্রী ধরিবার জন্য দারুণ ব্যগ্রতা দেখিয়া প্রবীণ বয়স্ক পিতা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেও তরুণী কন্যাটি কিন্তু অত্যন্ত কৌতুকবোধ করিতেছিল। এত ভীড়—এক সঙ্গে নানা দেশী লোকের এমন সমাবেশ এবং অদ্ভুত রকমের অসংখ্য একা গাড়ী দেখিয়া তাহার মনে যেন আর আনন্দ ধরিতেছিলনা। একা গাড়ীর কথা সে কেতাবে পড়িয়াছে, লোকের মুখেও শুনিয়াছে, কিন্তু চোখে এই প্রথম দেখিতেছে। কন্যার একান্ত আগ্রহেই তাহার পিতা ভালো দেখিয়া একখানি একা ভাড়া করিলেন। কৌতূহলাক্রান্ত উছল চিত্তে কন্যা পিতার সহিত একার গদীতে চাপিয়া বসিল। সঙ্গের তোরঙ্গ ও অন্যান্য জিনিসগুলি কুলীরা একায় তুলিয়া দিল।

সাধারণতঃ কুলী বিদায় উপলক্ষে উভয় পক্ষে কতই বচসা শোনা যায় —যাত্রীজীবনে ইহা যেন নিয়মিতভাবে সংঘটিত একটি অপ্রীতিকর অধ্যায়! কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এক্কায় উঠিয়া এই প্রবীণ যাত্রীটি যে হারে কুলী বিদায় করিলেন, তাহাতে তাহারা সহর্ষে সমস্বরে জয়ধ্বনি তুলিয়া অনেকেরই বিস্ময়োৎপাদন করিল। এক্কার চালকও ইহাতে আশান্বিত হইয়া ভাড়ার ভার এই বদান্য ব্যক্তির উপরেই সমর্পণ করিয়া ঘোড়ার পীঠে চাবুক হাঁকরাইল।

রাজঘাটের দীর্ঘপথ, বিশ্বেশ্বর গঞ্জ, টাউনহল, পার্ক, বড় ডাকঘর, কাশীর চক, কোতোয়ালী, বাঁশফটকা প্রভৃতি পার্শ্বে রাখিয়া এবং কাশীর এই দ্রষ্টব্য স্থান বা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচয় দিতে দিতে এক্কা চালক অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই গোধোলিয়ার বিখ্যাত চৌমাথায় আসিয়া সুধাইল যে, বাঙালী-টোলার সম্মুখেই তাঁহারা আসিয়াছেন, এখন কোন মহল্লায় যাইতে চাহেন? 'মহল্লার নাম শুনিয়া এক্কাওয়ালা গোধোলিয়ার মোড় হইতে পশ্চিম দিকে অগস্ত্যকুণ্ডা রোডের মধ্যে এক্কা চালাইয়া প্রবেশ করিল। এই পথে অল্প দূর পর্যন্ত গাড়ী যাতায়াত করিয়া থাকে; এক্কাও ধীরে ধীরে এই সঙ্কীর্ণ ও বন্ধুর পথ ধরিয়া অগ্রসর হইল।

গোধোলিয়ার চৌমাথা হইতে অগস্ত্যকুণ্ডা রোড ধরিয়া কিছুদূর যাইলেই পথের ধারে পুরাতন একটি ফটক দেখা যায়। এক্কা এই ফটকের ভিতর দিয়া বিস্তীর্ণ একটি লনের মধ্যে প্রবেশ করিল। এককালে লনটি যে সুশ্রী বাগিচারূপে লোকের আনন্দবর্দ্ধন করিত, স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে দুই চারিটি শীর্ণকায় ক্রোটন ও ফুলের গাছ কোন রকমে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহাদের অতীত সমৃদ্ধির সেই পরিচয় দিতেছিল। লনটির প্রান্ত-ভাগে একখানি অট্টালিকা, লন হইতে তাহার কিয়দংশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই বাড়ীর দরজার দুই পার্শ্বে প্রস্তরময় সুপ্রশস্ত চৌতারা।

একা তাহার পুরোভাগে আসিয়া থামিল। একায় বসিয়া প্রবীণ ব্যক্তি দেখিলেন—গৃহদ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ রহিয়াছে। তিনি ক্ষিপ্রভাবে একা হইতে নামিয়া রুদ্ধ দ্বারে লাগানো কড়া দুইটি নাড়িয়া ডাকিলেন: শিবনাথ, বাড়ী আছ হে? শিবনাথ—

পরক্ষণেই দ্বার উন্মুক্ত করিয়া হৃষ্টপুষ্ট এক প্রৌঢ় ব্যক্তি চৌকাঠের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকটির গায়ের বর্ণ কালো হইলেও তাহাতে দিব্য একটি শ্রী আছে; দেহের বাঁধুনী বেশ বলিষ্ঠ, মাথার চুল খুব ছোট করিয়া কাটা, গলায় তুলসীর মালা, গায়ে একটি ফতুয়া, পরণের ধুতিখানি আড়ময়লা ও খাটো, পা দুটি নগ্ন; মুখখানি শান্ত এবং সৌম্য হইলেও মনে হয় যে, তাহার উপর বিস্ময়ের একটা গভীর ছায়া পড়িয়াছে। লোকটিকে দেখিয়া পিতা পুত্রী উভয়েই তাহাকে গৃহ-ভৃত্য বলিয়া অনুমান করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের আবির্ভাবে তাহার মুখে এভাবে বিস্ময়ের রেখা ফুটিয়া উঠিবার কারণ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না।

আগন্তুকই প্রথমে হাত দুইখানি যুক্ত করিয়া কতকটা অভিবাদনের ভঙ্গিতেই সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল: কোথা থেকে আপনারা আসছেন বাবু?

নবাগত প্রবীণ ব্যক্তি বলিলেন: আসছি অনেক দূরদেশ থেকে বাপু। আচ্ছা, এই ত শিবনাথ লাহিড়ীর বাড়ী—মস্ত গাইয়ে মানুষ, তার ওপর মহারাজের এষ্টেটের তহশীলদার?

আগন্তুক ঘাড়টি দুলাইয়া তেমনই বিনয়ের সঙ্গে বলিল: আজ্ঞে, হ্যাঁ বাবু!

প্রবীণ ব্যক্তি গলার স্বরে জোর দিয়া বলিলেন: তাকে বল যে হরিহর এসেছে—তার মেয়েকে নিয়ে।

আগন্তুকের বিস্মিত মুখখানা এই কথায় যেন ফ্যাকাশে হইয়া গেল। একবার সে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে নবাগত মানুষটির আপাদ মস্তক দেখিয়া লইল. তাহার পর এক্কায় উপবিষ্টা মেয়েটির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া সহসা অপ্রকৃতিস্থের মত অতি দ্রুতপদে মুক্ত দ্বারপথে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

এক্কায় বসিয়া প্রবীণ বয়স্ক হরিহর রায়ের তরুণী কন্যা শ্যামলী সপ্রতীভ দৃষ্টিতে প্রৌঢ় লোকটির গতি ভঙ্গি দেখিতেছিল; তাহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সেও এক্কা হইতে নিচে নামিয়া দ্রুতপদে পিতার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল:

শ্যামলী: তোমার বন্ধুর নাম করতেই ও লোকটার মুখখানা যেন শুখিয়ে গেল বাবা! কেন বল ত?

হরিহর: কি জানি!

এখন আর বুঝিতে বাধিবে না যে, কলিকাতার সঙ্গীত সম্মেলনে ডেলিগেট-ক্যাম্পের বৈঠকে তিন বন্ধুর সেই বিশ্রম্ভালাপের প্রায় ষোড়শ বর্ষ পরে মুক্তাগাছার বন্ধু হরিহর রায় সেই বৈঠকের প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁহার কন্যা শ্যামলীকে লইয়া কাশীধামের বন্ধু শিবনাথ লাহিড়ীর বাড়ীতে এই প্রথম উপস্থিত হইয়াছেন।

* *

*

বাড়ীর ভিতরে এক ফালি উঠান। তাহার এক প্রান্তে পাথরে নির্মিত টানা রক বা লম্বা চৌতারা। সেই রকের উপর ভিতরের দীর্ঘ টানা দালানে প্রবেশ করিতে হয়। উঠানের অন্যদিকে উচ্চ ভীতের উপর সুপ্রশস্ত অলিন্দের মত খানিকটা খোলা চাতাল—স্থানটি সিমেণ্ট করা। ইহার পরেই পাকের ঘর। এই চাতালের উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন বাড়ীর

গৃহিণী মহামায়া দেবী। যে ব্যক্তি বাহিরে গিয়া হরিহরকে সুধাইতেছিল—কোথা হইতে তাঁহাদের আসা হইয়াছে; এই বাড়ীর অতি বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য সে—নাম তাহার মঙ্গল।

হরিহরের কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি ভিতরের উঠানে গিয়া মাতৃস্বরূপিণী গৃহস্বামীনীকে সেগুলি নিবেদন করিয়া গাঢ়স্বরে মঙ্গল বলিতেছিলঃ ওনার কথা শুনে মনে হোচ্ছে মা, এখানকার খবর উনি পাননি!

মহামায়া দেবীর দুই চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গিয়াছিল, অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে তিনি কহিলেনঃ কর্তার সেই বন্ধু রে! এঁরই কথা তিনি প্রায়ই বলতেন বাবা! কর্তা অনেক খোঁজ করেছিলেন, কত চিঠি লিখেছেন ওঁকে এখানে আসবার জন্যে! যখন এলেন·······

অশ্রুভারে তাঁহার স্বর এখানে রুদ্ধ হইয়া গেল। পরক্ষণে আত্মসম্বরণ করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেনঃ স্বর্গে থেকে তিনি হয়ত দেখছেন!

মঙ্গলের দুই চক্ষুও বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল; আর্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিলঃ মা, তাহলে এখন ······

মহামায়াদেবী ম্লান মুখখানি ধীরে ধীরে তুলিয়া বলিলেনঃ মোট-ঘাটগুলো গাড়ী থেকে তাড়াতাড়ি নামিয়ে বাইরের ঘরে ওঁকে বসাও বাবা, আমিও যাচ্ছি।

* *
*

ওদিকে হরিহর বাহিরের সেই টানা চৌতারার উপর বসিয়া পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলেন। তাঁহাদের পরিচয় শুনিবার পর বিচিত্র ভঙ্গিতে নির্বাকভাবে বাড়ীর মানুষটির প্রস্থানে তিনিও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পথে আসিতে আসিতে কত কথাই

মনে মনে কল্পনা করিয়াছিলেন—তাঁহার আগমনবার্তা শুনিয়াই শিবনাথ আনন্দে বাড়ী কাঁপাইয়া তুলিবে, তাঁহার কন্যা শ্যামলীকে দেখিয়া কত কি বলিবে! কিন্তু এখন মনে হইতেছিল যে, একটা দিকই শুধু ভাবিয়াছিলেন তিনি, আর একটা দিকের কল্পনাও করেন নাই কোনদিন……

এই সময় শ্যামলীর কথায় তাঁহার চিন্তাজাল ছিঁড়িয়া গেল :

অমন করে কি ভাবছ বাবা? এক্কাওয়ালার ভাড়া….

চমকিত হইয়া হরিহর বলিলেন : ও! হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম। এই নাও মা—

তাড়াতাড়ি জামার পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন। টাকাটা লইয়া শ্যামলী চলিয়া গেল। ঠিক এই সময় মঙ্গলকেও বাড়ীর ভিতর হইতে করযোড়ে বাহিরে আসিতে দেখিয়া হরিহর বলিলেন : শিবনাথকে খবর দিয়েছ বাপু?

মঙ্গল ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া সবিনয়ে বলিল : ব্যস্ত হবেন না বাবু! মাকে খবর দিয়েছি—তিনি আসছেন। বাইরের ঘরে গিয়ে বসবেন আসুন.

মঙ্গলের কথা হরিহরের ভালো লাগিল না; তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন : তা না হয় বসছি—কিন্তু শিবনাথ কোথায়?

মঙ্গল তেমনই সবিনয়ে ও ম্লানমুখে উত্তর করিল : মা আসছেন, সবই শুনতে পাবেন বাবু! আপনি চলুন দয়া করে। আমাকে এখুনি আপনাদের মালপত্তরগুলো আনতে হবে!

* *
*

যে টানা চৌতারায় বসিয়া কথা বলিতেছিলেন হরিহর—তাহার উপরেই বাহিরের বৈঠকখানা; জানালাগুলি রুদ্ধ অবস্থায় ছিল। ঘর-

খানি পরিপাটিরূপে সাজানো। পাশাপাশি বিছানো নিচু তক্তপোষের উপর বিস্তীর্ণ ফরাস। শুভ্র ওয়াড়যুক্ত সারি সারি তাকিয়া। ঘরের আসবাবপত্র এবং বিবিধ বাদ্যযন্ত্র দেখিয়া সঙ্গীতসাধকের বৈঠকঘর বলিয়া বুঝা যায়। দেওয়ালে একখানি সুবৃহৎ ছবি। সেদিকে দৃষ্টি পড়িতেই হরিহর উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন—রামময়, শিবনাথ ও হরিহর—তিন বন্ধুর আলেখ্য বড় করিয়া আঁকাইয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছেন শিবনাথ। ছবির নিম্নে বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—থ্রী মাসকেটিয়ার্স: ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।

হরিহরকে বৈঠক ঘরে বসাইয়া মঙ্গল এক্কার মালপত্রগুলি আনিবার জন্য তাড়াতাড়ি বাহিরে গেল পরক্ষণে ভিতরের দিকের দরজাটির নিকট ম্লানমুখে মহামায়াদেবী আসিয়া দাঁড়াইতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত হরিহরের সর্বাঙ্গ যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল—তাঁহার আর বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না।

পরক্ষণে কম্পিতপদে ফরাস হইতে উঠিয়া আর্তকণ্ঠে বলিলেন: একি! বৌঠান! বৈধব্য বেশ! বুঝেছি—সব বুঝেছি, আর কিছুই বলতে হবে না,—অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুখিয়ে যায়!

কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন হরিহর। সেই সময় শ্যামলীও ম্লানমুখে টলিতে টলিতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। মঙ্গলের কাছে সেও খবরটি শুনিয়াছিল।

দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মহামায়া দেবী বলিলেন: ইদানীং যেন আপনার আশাপথ চেয়ে থাকতেন। কেবলই বলতেন—আমি যেন দেখছি, তারা আসছে! আজ সত্যি হলো তাঁর কথা।

আর্তস্বরে হরিহর বলিয়া উঠিলেন: উ! মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন!

শ্যামলীও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মানা

মহিলাটি কে তাহা বুঝিতে পারিয়া সে এই সময় দ্রুতপদে দরজার কাছে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি সস্নেহে তাহাকে চুম্বন করিয়া কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন: সুখী হও মা, তোমাকে পেয়ে আমার মনে হচ্ছে—মা-লক্ষ্মী যেন পায়ে হেঁটে আমার ভীটেয় এসেছেন। কিন্তু তোমার মা?

শ্যামলীর চোখ দুটি একথায় ছলছলিয়া উঠিল—সেই দৃষ্টি অদূরে উপবিষ্ট পিতার মুখে নিবদ্ধ করিতেই হরিহরকে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইল। বলিলেন: এখানে আসবার পথে সেই ত শৃঙ্খল হোয়েছিল বৌঠান! শিবনাথ বলেছিলেন—সপরিবার আসা চাই, নৈলে কিন্তু প্রবেশ নিষেধ জানবে! সাতটি বছর তিনি বিছানায় শুয়ে যমের সঙ্গে যুঝেছিলেন—মাস তিনেক হলো মুক্তি পেয়েছেন। যাবার সময় নিজেই মাথার দিব্যি দিয়ে বলে যান—শ্যামলীকে নিয়ে যেন এখানে আসি!

জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া মহামায়া বলিলেন: এসে ভালই করেছেন ঠাকুরপো! চন্দ্রর মাথার উপর কেউ নেই। আপনি তার অভিভাবক হয়ে এখানে থাকুন। মঙ্গল, শীগগীর হাত মুখ ধোবার জল আনো। তুমি আমার সঙ্গে এসো শ্যামলী।

* *

*

শিবনাথ লাহিড়ীর বাড়ীর কাছাকাছি প্রতিবেশী ঈশ্বর বাকচির বাড়ী। অবস্থা মন্দ নয়; সংসারে স্ত্রী মনোরমা ও কুমারী কন্যা শিবানী। স্বামি-স্ত্রীর একান্ত ইচ্ছা যে, চন্দ্রনাথের সঙ্গে কন্যা শিবানীর বিবাহ দিবেন। ফলে, চন্দ্রনাথের মা মহামায়া দেবী পুত্রের পরীক্ষার ওজর ধরিয়া বলেন—পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত ছেলে বিবাহ করিবে না। কিন্তু ইহারা আশা ছাড়েন নাই। মহামায়া দেবীর সঙ্গে মনোরমা 'মনের কথা' সম্বন্ধ পাতাইয়া

ছিলেন। কন্যা শিবানীকে লইয়া প্রায়ই এ বাড়ীতে তিনি আসেন এবং নানাভাবে মহামায়ার মনোরঞ্জন করেন। এমনি সময় বন্ধুত্বের দাবী লইয়া স্বশ্রেণীর—হরিহর রায় বিবাহযোগ্যা এক কন্যাকে লইয়া মহামায়াদেবীর বাড়ীতে আসিয়াছেন এবং আসিয়াই সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন শুনিয়া মনোরমা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। স্বামীর সহিত সেই সম্পর্কে কথা হইতেছিল। আহারান্তে ঈশ্বর বাকচি খবরের কাগজ পড়িতেছেন, এমন সময় মনোরমা হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন:

মনোরমা: যা ভেবেছিলুম—তাই হলো।

ঈশ্বর: অর্থাৎ—

মনোরমা: ধিঙ্গী মেয়েটাকে নিয়ে বুড়ো ঐ বাড়ীতেই শেকড় গেড়ে বসলো। তারপর—ওরাও নাকি পালটি ঘর।

ঈশ্বর: বল কি?

মনোরমা: এইজন্যেই তোমাকে পই পই করে বলেছিলুম—কথাটা পাকা করে আশীর্ব্বাদটা সেরে ফেল! তা তুমি কি গা করলে? তোমার সেই আঠারো মাসে বছর!

ঈশ্বর: আমি কি চেষ্টার কসুর করেছিলুম! বৌঠান যে বললেন—এম-এ পরীক্ষা না দিয়ে ছেলে বিয়ে করতে রাজী নয়। তা, তুমিই আজ ওবেলা গিয়ে গিন্নীর কাছে কথাটা না হয় একবার পাড় না! আশীর্ব্বাদ নাই বা হলো—কথা পাকা হতে ত দোষ নেই।

মনোরমা: যাবোই ত—আমি কি ছেড়ে দেব নাকি? যখন ওর সঙ্গে 'মনের কথা' পাতাই—তখন থেকে কথা হয়ে আছে।

ঈশ্বর: আর দেখ—তলে তলে একটু খোঁজ খবরও নাও! কর্তার সাঙাত হয়ে যে এসেছে—সত্যিই তাঁর সাঙাত ছিল কিনা,—

তারপর কোথায় চাল চুলো, স্ত্রী মারা গেছে বলেছে—তা কোথায় বিয়ে করেছিল, কি রকম ঘর, তলে তলে এগুলোর খোঁজ কর; পরে কাজে লাগবে।

* *

*

অপরাহ্ন। রান্নাঘরের সামনে চাতালের উপর বসিয়া মহামায়া দেবী সুপারি কাটিতে কাটিতে পার্শ্বে উপবিষ্টা 'মনের কথা' মনোরমা দেবীর সহিত কথা বলিতেছিলেন।

মহামায়া: না ভাই, ঠাকুরপোকে সন্দেহ করবার কিছু নেই। কর্তার কাছেও আমি ওঁর কথা সব শুনেছি। উনি বন্ধু সেজে আসেন নি!

মনোরমা: না আসেন ভালোই! কিন্তু যে দিন-কাল পড়েছে ভাই—তাই ভয় হয়। এমনি করে বিশ্বাসের জন্যেই ত কত সংসার নষ্ট হয়েছে। তাছাড়া কি জানো ভাই, আজ বাদে কাল যখন তোমার সঙ্গে কুটুম্বিতা হতে চলেছে! উনি আবার কি রকম নিষ্ঠেকিষ্টে খিটখিটে মানুষ তা ত জানো!

মহামায়া: তা ব'লে আপনার জনকে মেনে নেব না!

মনোরমা: যাদের কখনো দেখিনি, কোন কথাও কোনদিন শুনিনি, জানিনে ভাই কি করে তারা আপনার জন হয়!

মহামায়া: সে গল্প উনি আজই সকলকে বলবেন বলেছেন—তুমিও ভাই শুনো। তখন সন্দেহ হয়, তাঁকেই জিজ্ঞাসা ক'র।

মনোরমা: না, না, সে কথা ত বলছি নে ভাই! আর যাই বলিনা কেন, তোমাদেরই ভালোর জন্যে। হ্যাঁ, ভাল কথা—উনি বলছিলেন, তোমার মনের কথাকে জিজ্ঞেস কর—চন্দ্রর

পরীক্ষার ত এখনো দিন আছে—তা এরই মধ্যে একটা ভালো দিন দেখে আশীর্ব্বাদটা সেরে ফেললে হ'ত না!

কথাটা শুনিয়াই মহামায়া দেবীর মুখখানি ভার হইয়া উঠিল। ঠিক এই সময়ে শ্যামলী দ্রুতপদে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া মনোরমাও মুখ ভার করিলেন। ইহা মহামায়ার দৃষ্টি এড়াইল না।

মহামায়া: বাবাকে পান দিয়ে এসেছ মা?

শ্যামলী: (ঘাড় নাড়িয়া) হ্যাঁ—মাসীমা!

মহামায়া: ইনিও মাসীমা হন—প্রণাম কর।

শ্যামলী হেঁট হইয়া মনোরমাকে প্রণাম করিল। তিনি প্রখর দৃষ্টিতে প্রণতার পানে তাকাইয়া বলিলেন:

মনোরমা: থাক, থাক—হয়েছে।

শ্যামলী: বাবা সেই গল্প এখন বলবেন বলে ডাকছেন মাসীমা!

মহামায়া: চলো মা, তুমিও চল মনের কথা—তোমারও শোনা দরকার।

* * *

বাহিরের সুসজ্জিত বৈঠকখানা। অপরাহ্ন। ফরাসে একটি তাকিয়া অবলম্বনে বসিয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছেন হরিহর। নীচে—একটু তফাতে মেঝের উপর শতরঞ্চিতে বসিয়াছেন—মহামায়া, মনোরমা ও শ্যামলী। দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া পরিচারিকা কামিনী এবং দরজার কাছে মঙ্গল দাঁড়াইয়া আছে।

হরিহর: ঐ ছবিখানি দেখে ২৮ বছর আগেকার কথা মনে পড়ছে। সে এক গল্প।

মহামায়া: সে গল্প কর্তার মুখে আমি শুনিছি। তবুও আপনি বলুন ঠাকুর পো—আপনার মুখেও শুনি।

হরিহর: শিবনাথ লাহিড়ী, রামময় ভট্টাচার্য আর এই হরিহর রায়—

একই শ্রেণীর তিন ব্রাহ্মণ সন্তান এলাহাবাদের মেসে থেকে পড়াশোনা করেন, সেই সঙ্গে গানও শেখেন। মেসের ও কলেজের ছেলেরা এদের সম্প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতা দেখে নাম রাখে—থ্রী মাস্‌কেটিয়ার্স। আর সহরবাসীরা বলত—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। একই বছরে তিন বন্ধু একই ডিভিসনে বি-এ পাশ করলেন—সঙ্গীত বিদ্যালয় থেকেও ডিপ্লোমা পেলেন। সহরের লোক তাদের গান শুনবার জন্যে যেন পালন! কিন্তু কোথাও গানের মজলিস বসলে তিন বন্ধুকে ডাকতে হবে—নৈলে কেউ যাবে না—এমনি তিন বন্ধুর প্রীতি। কিন্তু চির-দিনতো আর সমান যায় না। বিধাতার নির্বন্ধে তাঁদের কর্মস্থান নির্দিষ্ট হলো তিনটি বিভিন্ন প্রদেশে। শিবনাথের জন্য কাশী, রামময়ের জন্য গোয়ালিয়ার, আর হরিহরের অদৃষ্টে এলো মুক্তাগাছা। ছাড়াছাড়ির দিনে তিনবন্ধু একখানা টেবিল ঘিরে বসে ভবিষ্যতের জন্যে বাঁধাবাঁধির এক প্ল্যান তৈরী করলেন।

ইহার পর এলাহাবাদের মেসে উপরের কক্ষে তিনবন্ধুর সেই প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা, প্রতিজ্ঞার কথা এবং প্রত্যেকের নিকট এক এক খণ্ড প্রতিজ্ঞাপত্র রক্ষার কাহিনী বিস্তারিতভাবে বলিয়া বারো বৎসর পরে কলিকাতার সম্মেলনের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন হরিহর।

স্তব্ধ হইয়া সকলেই হরিহরের অতীত কাহিনী শুনিতেছিলেন। এলাহাবাদের প্রসঙ্গের পর কলিকাতার সঙ্গীত সম্মেলনের প্রসঙ্গ তুলিয়া হরিহর তিনবন্ধুর বৈঠকে যেভাবে আলাপ আলোচনা হইয়াছিল, অবিকল বলিয়া গেলেন। শ্রোতৃদের মনে হইতেছিল যে, ফরাসে বসিয়া তিনবন্ধুই যেন কথা বলিতেছেন। যথাঃ—

শিবনাথ: ভাগ্যিস্ গানের কনফারেন্স হয়েছিল—তাই ১২ বছর পরে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সংযোগ হলো। এখন এসো, হিসেব নিকেশ করা যাক্। ব্রহ্মা থেকেই সুরু হোক—(রামময়ের দিকে তাকাইলেন)।

রামময়: জানো ত, ব্রহ্ম শূন্যময়; কাজেই সংসার নেই—হিসেবে শূন্যি! সব ছেড়ে গানেই ডুবে আছি।

হরিহর: বিষ্ণুদেব—

শিবনাথ: লক্ষ্মীলাভ হয়েছে—গৃহস্থালীও জমেছে। ছেলের নাম চন্দ্রনাথ—চারে পড়েছে! এখন মহেশ্বরের যদি কন্যা থাকে আর বয়সে না বাধে—

হরিহর: বছর দেড়েক হলো আমিও লক্ষ্মী পেয়েছি এবং বর্তমানে তিনি সন্তান-সম্ভবা—

রামময়: তাহলে উপরওয়ালার কাছে প্রার্থনা করা যাক—লক্ষ্মীদেবী যেন একটি কন্যারত্নই প্রসব করেন। শিবনাথ ত বলল, ওর ছেলের বয়স চার; এর পর হরিহরের মেয়ে হলে রাজ-যোটক হবে। ভগবান নিশ্চয়ই আমাদের বণ্ডের মর্য্যাদা বজায় রাখবেন।

শিবনাথ: তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক ব্রহ্মদেব! আমারো এই প্রার্থনা। আমি তাহলে এখন থেকেই নিমন্ত্রণ করে রাখছি হরিহরকে!

হরিহর: ইচ্ছাময় যদি মুখ রাখেন, সকন্যা তোমার আলয়ে গিয়ে তাক লাগিয়ে দেব হে!

শিবনাথ: এবং সস্ত্রীক বলো; নভুবা—প্রবেশ নিষেধ জেনো।

এই পর্যন্ত বলিয়া হরিহর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কিছুক্ষণ

নীরব রহিলেন। একটু পরে পুনরায় গাঢ় স্বরে বলিলেন: তিনবন্ধুর সেই শেষ দেখা এবং তাঁদের শেষ কথা। তাই ভাবি, আজ যদি শিবনাথ থাকতেন! অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া মহামায়া দেবী বলিলেন:

মহামায়া: কলকাতা থেকে ফিরে এসে—তিনিও আমাকে এসব কথা বলেছিলেন। আপনার কাছ থেকে কোন খবর না পেয়ে অনেকগুলো চিঠিও লিখেছিলেন।

হরিহর: সেই থেকে আমাকেও নানাস্থানী হয়ে বেড়াতে হয়েছিল বেদেদের মত। নিজে কঠিন অসুখে পড়ি—বহুদিন ভুগে যদিও বা বেঁচে উঠলাম, কিন্তু যে সঙ্গীত সম্পদ ঈশ্বর দিয়েছিলেন, তাকে বর্জন করতে হয়।

মহামায়া: শ্যামলীর কাছে সব শুনিছি। ডাক্তারদের কথায় গান-বাজনা আপনাকে বন্ধ করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি কিছুই জানতে পারেন নি।

হরিহর: জানাবার ফুরসদও পাইনি, আর প্রবৃত্তিও হয় নি। নিজে যেই উঠে দাঁড়ালাম—অমনি স্ত্রী নিলেন শয্যা। দীর্ঘ সাতটা বছর ধরে চলল তাঁর চিকিৎসা। আমার জীবনটাই যেন অভিশপ্ত বৌঠান। শেষ পর্যন্ত এলাম যেখানে শান্তির আশায়—সেখানেও দেখি অদৃষ্ট দেবতা আগে থেকেই আশার প্রদীপটি নিবিয়ে রেখেছেন—এসেই পেলাম এক প্রচণ্ড আঘাত।

মহামায়া: এখন সব সামলে আপনাকে শক্ত হতে হবে—শ্যামলীর মুখ চেয়ে। আমি চন্দরকে সব কথা লিখিছি।

* *

*

এলাহাবাদ। কলেজ হোষ্টেলের ছোট একটি রুম। দুটি মাত্র সিট সে ঘরে। প্রত্যেক সিটের পাশে ছোট টেবিল ও একখানি করিয়া চেয়ার। চন্দ্রনাথ চেয়ারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চিঠি পড়িতেছিল। অপর সিটের ছাত্র অবনী একখানি বহি পড়িতে পড়িতে মধ্যে মধ্যে আড় চক্ষে চন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিতেছিল। উভয়েই স্বাস্থ্যবান তরুণ, রূপবান, সুশ্রী ও প্রিয়দর্শন।

চন্দ্রনাথ পড়িতেছিল :

কর্তা তাঁহার যে বন্ধুদের কথা বলিতেন, বিশেষ করিয়া হরিহর রায় নামক যে বন্ধুটির প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন বহুদিন ধরিয়া—তিনি সম্প্রতি এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে একমাত্র কন্যা শ্যামলী। মেয়েটি যেরূপ বুদ্ধিমতী, তেমনই তাহার রূপ ও আক্কেল বিবেচনা। শ্যামলীকে পাইয়া আমার যে কি আনন্দ হইয়াছে তাহা বলিবার নয়। তুমি অতি অবশ্য কিছুদিনের জন্য এখানে আসিবে। আমার ও তোমার কাকাবাবুর আশীর্ব্বাদ লইবে।

আশীর্ব্বাদিকা—তোমার মাতা।

চন্দ্রনাথ মুখভার করিয়া বসিয়া পড়িল এবং হাতের চিঠিখানা সজোরে টেবিলের উপর ঠুকিয়া রাখিল। সহপাঠী অবনী তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল :

অবনী : কি ব্যাপার! চিঠিখানার উপরে ওভাবে ক্রোধ প্রকাশের কারণ ?

চন্দ্রনাথ : আর ব'ল না। ভাবছিলাম, একটা মাস বাড়ীতে গিয়ে নিরালায় পড়ব—তা আর হলো না।

অবনী : কেন ?

চন্দ্রনাথ : বাড়ীতে ভেজাল জুটেছে। আমার বাবার ছাত্রজীবনে

বন্ধুদের সঙ্গে বণ্ড লেখালেখির গল্প তোমায় বলেছিলাম না, শুনে সেদিন হেসেছিলে!

অবনী: হাঁ, হাঁ, তাতে কি হয়েছে?

চন্দ্রনাথ: সেই বণ্ডের এক বন্ধু য়্যাদ্দিন পরে বাড়ীচড়াও হয়ে জেঁকে বসেছেন! আর সঙ্গে এনেছেন শ্যামলী নামে এক কন্যা।

অবনী: হ্যাল্লো—তাই নাকি?

চন্দ্রনাথ: মা সেই কথা সানন্দে জানিয়ে আমাকে যেতে লিখেছেন।

অবনী: তাহলে ত আনন্দের কথা হে!

চন্দ্রনাথ: আনন্দ নয়—ভয়। আত্মসম্মানের দিকে না চেয়ে যে লোক একখানা চোঁতা কাগজের উপরে দাবী রেখে মেয়েকে নিয়ে আসতে পারে—তার লক্ষ্যই হচ্ছে কন্যা দায় থেকে মুক্ত হওয়া। কিন্তু আমি সে পাত্রই নই; তাই—যাওয়া বন্ধ করতে হলো।

* *

*

প্রাতঃকাল। বৈঠকখানায় ফরাসে বসিয়া হরিহর পাখোয়াজ বাজাইতেছিলেন। বাজনা শুনিয়া বাহিরের লনে লোক জমিয়া গিয়াছে। এমন বাজনা বুঝি তাহারা কখন শুনে নাই! ঈশ্বর বাকচিও এদিকেই আসিতেছিলেন; সমবেত লোকদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন—ওস্তাদ লাহিড়ীবাবুর যে নতুন বন্ধু আসিয়াছেন—ভারি গুণী লোক, তিনিই বাজাইতেছেন। ঈশ্বর বাকচি এই লোকটির সহিত বোঝাপড়া করিতেই এ-বাড়ীতে আসিয়াছেন—পা টিপিয়া টিপিয়া তিনি ভিতরে ঢুকিলেন। এই সময় শ্যামলীকে ক্ষৌমবস্ত্র পরিয়া আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি অন্তরালে দাঁড়াইলেন।

ভিতরে হরিহর তন্ময় হইয়া বাজাইতেছেন। এমন সময় শ্যামলী প্রবেশ করিল। একখানি লাল পাড় গরদের সাড়ী পরিয়াছে শ্যামলী—তাহার হাতে কমণ্ডলু; মুখে উৎকণ্ঠার চিহ্ন। শ্যামলী ডাকিল:

শ্যামলী: বাবা—

কন্যার কথা হরিহর শুনিতে পাইলেন না। শ্যামলী পুনরায় ডাকিল: বাবা!

হরিহর: কি মা—

শ্যামলী: কি করছ বাবা? ডাক্তারের কথা ভুলে গেলে?

হরিহর: ও হো! সত্যিই ভুলে গিয়েছিলাম। এক ঘর বাজনা দেখে লোভ আর সামলাতে পারিনি মা! তাই—

শ্যামলী: ভালো করনি বাবা!

হরিহর: এই রেখে দিলাম মা! তবে—এও বলি, গান গাওয়াই নিষেধ—বাজনায় তেমন কিছু—

শ্যামলী: না বাবা, পাখোয়াজ বাজালে মগজে চাড় লাগে; তারপর, আমি ত জানি—পাখোয়াজ ধরলেই ধ্রুপদ পেয়ে বসে।

হরিহর: পাগলী মেয়ে! তা তুমি ত মা সকালে সন্ধ্যায় এ ঘরে এসে গানের চর্চা করতে পার!

শ্যামলী: আমার লজ্জা করে বাবা—

হরিহর: লজ্জা কিসের মা? চন্দর এলে আমি তাকে বলব—যাতে তোমাকে....

শ্যামলী: না বাবা, তুমি এখানে কাউকে বলতে পাবে না যে আমি গান জানি।

এই সময় বাহির হইতে মহামায়া দেবীর কণ্ঠ শোনা গেল। তিনি ডাকিতেছিলেন:

মহামায়া : শ্যামলী—

শ্যামলী : ঐ যা—তোমাকে বলতে এসে ভুলে গেছি। মাসীমার সঙ্গে বিশ্বনাথ দেখতে যাচ্ছি বাবা !

হরিহর : বেশ ত—

শ্যামলী : তুমি কিন্তু যেন আর ওসব নিয়ে—

হরিহর : না মা, না—আমার কি প্রাণের ভয় নেই !

* *

*

বাহিরে উঠান। মহামায়া ও শ্যামলী। লনে বৈঠকখানার দিকে অনেকগুলি লোক সমাগম দেখিয়া মহামায়া বলিলেন :

মহামায়া : অমা, এত লোক সব এসেছে কেন ?

মঙ্গল : কাকাবাবু আজ পাখোয়াজ বাজাচ্ছিলেন—কি মিষ্টি হাতগো মা ! তাই না শুনে রাস্তা থেকে এই রঙ্গে লোক ছুটে এসেছে !

মহামায়া : তাই নাকি ! আহা—আমার শোনা হলো না !

এই সময় শ্যামলী ফিরিয়া আসিয়া বলিল :

শ্যামলী : বাজনা বাজাতে গান গাইতে ডাক্তাররা বাবাকে মানা করেছেন ; এদিকে ওঘরে অনেক বাজনা দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারেন নি !

মঙ্গল : এক্কা এসেছে মা !

এক্কা ভিতরে আসিল। মহামায়া ও শ্যামলী এক্কায় উঠিলেন।

* *

*

ইতিমধ্যে গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া ঈশ্বর বাকচি বৈঠকখানায় গিয়াছেন এবং হরিহরের সহিত আলাপ জমাইয়া ফেলিয়াছেন।

ঈশ্বর : বিলক্ষণ—বিলক্ষণ! মহাশয়ের মত গুণী ব্যক্তির শুভাগমনে এ পল্লীই ধন্য হয়েছে। আহা! কি বোলই শোনালেন—যেন কথা বলে গেল! তবে দুঃখ এই—ভালো করে শোনা হলো না। আপনি কিছু জানতে পাচ্ছেন না—জানালাটা খুলে দিই, দেখুন কাণ্ড!

ঈশ্বর বাকচি তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিতে দেখা গেল প্রাঙ্গণে কতকগুলি লোক তখনো দাঁড়াইয়া আছে।

হরিহর : কি ব্যাপার?

ঈশ্বর : আর কি! আপনার বাজনা শুনে কেউ নড়তে চায় না! ওরা সব শিবনাথের আলাপ শুনেছে কিনা! বলতে কিন্তু বাধছে—যদি দয়া করে একখানা—

এই পর্যান্ত বলিয়াই পাখোয়াজটি হরিহরের কোলের কাছে রাখিয়া চোখে ও মুখের যে ভঙ্গি করিলেন, তাহাতে অভিপ্রায়টি আর অস্পষ্ট রহিল না।

হরিহর : দেখুন বাকচি মশাই, ভগবান মেরে রেখেছেন যে! নৈলে দেখতেন...আচ্ছা, বলছেন যখন—অগত্যা নিজের কণ্ঠের বদলে যন্ত্রের আলাপই আর একবার না হয় শুনিয়ে দেই।

হরিহর পাখোয়াজটি বাজাইতে বসিলেন। ঈশ্বর বাকচিও তানপুরা লইয়া—সেই সঙ্গে তাল দিতে দিতে সহসা কি ভাবিয়া শিবনাথের মুখে শোনা বিখ্যাত একটা ধ্রুপদের চরণ ধরিলেন তাঁহার অশিক্ষিত কণ্ঠে ও সুরে। গানের অপমানে গানের সাধক অমনি সিংহের মত গর্জন করিয়া দীর্ঘকালপরে ধ্রুপদ ধরিলেন। সারা ঘর ও প্রাঙ্গণ গমগম করিয়া উঠিল, সুরের যেন প্লাবন বহিল। ঈশ্বর বাকচি চীৎকার করিয়া বাহোবা দেন—গানও চরম পর্য্যায়ে উঠিয়া দুর্বার গতির আকস্মিক বিপর্য্যয়ের

মতই এক নিদারুণ বিপত্তি ঘটাইল; একটা আর্তস্বর তুলিয়া গায়ক মূর্চ্ছিত হইয়া পাখোয়াজ শুদ্ধ পড়িয়া গেলেন।

* *
*

এলাহাবাদের কলেজ হোষ্টেলের সেই কক্ষ। অবনী তাহার সিটের পার্শ্বে চেয়ারে বসিয়া চুলের প্রসাধন করিতেছিল; এমনি সময় একখানা খোলা চিঠি হাতে করিয়া চন্দ্রনাথ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তেজিতভাবে বলিল:

চন্দ্রনাথ: নাঃ—এরা দেখছি আমাকে পাগল না করে ছাড়বে না—আমার পরীক্ষাটাই নষ্ট হবে।

অবনী: আবার কি হলো?

চন্দ্রনাথ: মা'র চিঠি সেদিন শুনেছ ত? পিতৃবন্ধু ও তাঁর কন্যার গুণকীর্তন করে আমাকে যাবার জন্যে লিখেছিলেন! এখন আমাদের প্রতিবেশী ঈশ্বর বাকচি মশাই কি লিখছেন শোনো। চন্দ্রনাথ পড়িতে লাগিল:

বাবা চন্দ্রনাথ!

তুমি শুনিয়াছ কিনা জানি না, তোমাদের বাড়ীতে তোমার এক পিতৃবন্ধুর শুভাগমন হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে আসিয়াছে এমন একটি লজ্জাহীনা দুর্বিনীতা বাচাল কন্যা—যাহাকে লইয়া আমাদের মহল্লায় রীতিমত আলোচনা চলিয়াছে। তোমার মাতাঠাকুরাণী এই অজ্ঞাতকুলশীলা কন্যা ও তাহার পিতাকে সংসারভুক্ত করিয়া লইয়া আমাদের অন্তরে নিদারুণ বেদনা দিয়াছেন। পরম্পরায় শুনা যাইতেছে যে, তিনি নাকি এই কন্যাটিকে তোমার গলায় বাঁধিয়া দিবার

সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং ইহাতে তোমার পিতার সম্মতি ছিল এই কথা প্রচার করিয়া লোক হাসাইতেছেন। তুমি অবিলম্বে আসিয়া ইহার প্রতীকার না করিলে বিশেষ অনিষ্টপাত হইবে জানিবা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ

অবনী : এই শুভানুধ্যায়ীটি কে ?

চন্দ্রনাথ : আমাদের প্রতিবেশী।

অবনী : এই মাত্র, না অন্য কিছু ঘনিষ্ঠতা—

চন্দ্রনাথ : এঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার মাতাঠাকুরাণীর এক সময় নাকি বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল ; তারই সুযোগ নিয়ে এঁরা ইদানীং এঁদের একটি অচল কন্যাকে আমার গলায় বেঁধে দিয়ে চালাবার জন্যে সচেষ্ট !

অবনী : তাই বলো !

এই সময় বাহির হইতে পোষ্ট আফিসের পিয়নের কণ্ঠস্বর শোনা গেল :

টেলিগ্রাম আয়া বাবুজী—চন্দ্রোনাথ লাহিড়ী।

চন্দ্রনাথ : ভিতরে এসো।

পিয়ন টেলিগ্রাম দিয়া সহী লইয়া চলিয়া গেল। চন্দ্রনাথ খাম খুলিয়া পড়িতে পড়িতে স্তব্ধ হইয়া গেল।

অবনী : কি খবর ?

চন্দ্রনাথ : মা তার করছেন—Shyamalies father expired. Start at once.

অবনী : য়্যাঁ ! শ্যামলীর পিতা মারা গেছেন ! তোমার সঙ্গে ভদ্রলোকের দেখাও হলো না ?

* * *

চন্দ্রনাথের বাড়ীর অন্দরমহলে রান্নাঘরের সামনে সেই চাতাল। মহামায়া দেবী বঁটি লইয়া কুটনা কুটিতেছেন। শ্যামলী বিমর্ষমুখে পাশে বসিয়া চাউল বাছিতেছিল। এমন সময় চন্দ্রনাথ আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। দাসী কামিনী কুয়ার তলায় কাজ করিতেছিল—সেই প্রথমে দেখিতে পাইয়া বলিল:

কামিনী: দাদাবাবু এসেছেন মা!

চন্দ্রনাথ উঠান হইতেই চাতালে হেঁট হইয়া মাকে প্রণাম করিল। মা ও শ্যামলী উভয়েই মুখ তুলিয়া চাহিলেন। মা'র চোখ দুটি বড় হইয়া ছেলের মুখে নিবদ্ধ হইল। শ্যামলী মুখখানা কুলার চাউলে পুনরায় জোর করিয়া আবদ্ধ করিল।

মহামায়া: আমার চিঠি পেয়েই যদি চলে আসতিস বাবা, তাহলে শ্যামলীর বাবার সঙ্গে দেখা হ'ত। কি বরাত নিয়ে এসেছিলেন—তাঁকেও দেখতে পেলেন না, তোর সঙ্গেও একটিবার দেখা হলো না।

চন্দ্রনাথ: কি হয়েছিল?

মহামায়া: কিছু না। গান বাজনা করতে ডাক্তারের মানা ছিল—বুকের ব্যামোর জন্যে। যাবার দিনও শ্যামলীকে নিয়ে যখন বিশ্বনাথ দর্শনে যাই—অনেকদিন পরে আবার বাজনা নিয়ে বসেছিলেন। শ্যামল বারণ করে গেল। কিন্তু তার পরে যেন কাল হয়ে এলেন ওবাড়ীর বাকচি ঠাকুরপো! তাঁর পীড়াপীড়িতে গান গাইতে গাইতে—সেই যে ঢলে পড়লেন, আর উঠলেন না।

চন্দ্রনাথ : য়্যাঁ—তাই নাকি ?

মহামায়া : মুখ হাত ধুয়ে ঘরে যাও বাবা—আমি যাচ্ছি।

শ্যামলী এই সময় চোখ দুটি মেলিয়া চন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া দিব্য সপ্রতিভ ভাবে বলিল :

শ্যামলী : চন্দ্রদা ! আমার অশৌচ ; সেইজন্যে প্রণাম করতে পারলুম না—ওটা তোলা রৈল।

চন্দ্রনাথ শ্যামলীর কথা শুনিয়া অবাক বিস্ময়ে তার পানে একটিবার তাকাইয়াই তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। মহামায়ার মুখের কোণে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটিল।

* *
*

চন্দ্রনাথের বাড়ীর অন্দরমহলে দ্বিতলে দুইখানি মাত্র ঘর। একখানি ঘর চন্দ্রনাথ ব্যবহার করিত—এই ঘরে তাহার বিছানা, বইএর আলমারি প্রভৃতি থাকে। অপর ঘরে মহামায়াদেবীর জিনিসপত্র সব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয় এবং এই ঘরে তিনি শ্যামলীকে লইয়া রাত্রিবাস করেন। ঘরের ভিতরে খুব চওড়া খাট—এক শয্যায় দুইজনে শয়ন করেন। চন্দ্রনাথের ঘরখানি খালি থাকায় অধিকাংশ সময় শ্যামলী সেই ঘর ব্যবহার করে। তার বই, গানের খাতা, বইএর একটা তোরঙ্গ এই ঘরেই রাখে—বইপত্র তোলা নামার সুবিধার জন্য।

চন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকে—অনেকগুলি জিনিস তাহার নিকট অপরিচিত মনে হয়। টিপয়ের উপরে কয়েকখানা খাতা ও বই দেখিয়া তুলিয়া লইতেই—মলাটের উপরে পরিষ্কার অক্ষরে লেখা নামটি চোখে পড়ে—শ্রীমতী শ্যামলী দেবী। যেন কোন অস্পৃশ্য বস্তু

স্পর্শ করিয়াছে—এমনভাবে বই খাতা রাখিয়া দেয়। তোরঙ্গটির পানে চাহিয়া তাহার উপরে রাখা জিনিসটি সরাইতেই দেখে সাদা রঙ দিয়া বড় বড় হরফে লেখা রহিয়াছে—শ্রীমতী শ্যামলী দেবী। চন্দ্রনাথ শিহরিরা সরিয়া আসে। জামাটা খুলিয়া আনালায় রাখিতে গিয়া দেখে—চুল্ বাঁধা ফিতা সেখানে ঝুলিতেছে। তাহার আর জামা রাখা হয় না। আনলার পাটাতনে জুতা রাখিয়া চটিজোড়াটি লইতে গিয়া দেখে—একজোড়া লেডীস্ স্যাণ্ডেল রহিয়াছে সেখানে। সে অমনি লাফাইয়া পিছাইয়া আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া মঙ্গলকে ডাকিতে থাকে :

চন্দ্রনাথ : মঙ্গলদা—মঙ্গলদা—মঙ্গলদা—

মঙ্গল হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল :

মঙ্গল : কি—কি—হয়েছে কি দাদাবাবু! ব্যাপার কি ?

চন্দ্রনাথ : আমি কোথায় এসেছি বলতে পার ?

মঙ্গল : মানে ? কোথায় এসেছ বুছতে পারছ না ? নতুন মানুষ হয়ে এলে নাকি ?

চন্দ্রনাথ : নতুম রকম কিছু না দেখলে কি একথা বলি মঙ্গলদা ? এই ছাখ···

তাড়াতাড়ি মঙ্গলকে ধরিয়া তাহার মুখটা ঘুরাইয়া একটি একটি করিয়া দ্রষ্টব্য বস্তুগুলি দেখাইয়া দিল—বই খাতা ফিতা তোরঙ্গ স্যাণ্ডেল প্রভৃতি। মঙ্গল দুই চক্ষু বড় করিয়া চাহিয়া সহাস্যে বলিল :

মঙ্গল : ও-হো—তাই বলো! আরে, ওসব যে শ্যামলদিদির সম্পত্তি। তোমার ঘরখানা খালি পড়ে আছে দেখে উনি এই ঘরে দিনের বেলায় ওঁর নেকাপড়া করেন। আর রেতের বেলায় গিন্নীমার ঘরেই থাকেন। তা না হয় বলছি—ওনার জিনিস-গুলো সব গিন্নীমার ঘরে—

চন্দ্রনাথ : না—তার আর দরকার নেই। তুমি বাইরের ঘরে আমার থাকবার ব্যবস্থা করে দাও মঙ্গলদা!

মঙ্গল : সে কি কথা দাদাবাবু! তাকি হয় কখনো ?

চন্দ্রনাথ : খুব হয়—তুমি আর কথা বাড়িয়ো না। আমার যা যা দরকার তুমি ত জানো—বাইরের ঘরে নিয়ে এসো ; আমি সেখানেই আছি।

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়াই চন্দ্রনাথ চলিয়া গেল।

মঙ্গল : শোন কথা! দেখ দিকিনি, মা শুনে কি বলবেন—আর শ্যামল দিদি বা কি ভাববেন। দাদাবাবুর গোঁ তো জানি—

গজগজ করিতে করিতে মঙ্গল চন্দ্রনাথের কথামত জিনিসগুলি তুলিতে যাইবে, এমন সময় শ্যামলী কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল :

শ্যামলী : চন্দরদার জিনিসপত্তর নিয়ে কোথায় যাচ্ছ মঙ্গলদা ?

মঙ্গল : বাবুর খেয়াল হয়েছে বাইরের ঘরে থাকবেন, তাই—

শ্যামলী : সব কথাই আমার কানে গেছে। এটা যখন ওঁর শোবার ঘর, ওঁকে এই ঘরেই থাকতে হবে। আমি গিয়ে বুঝিয়ে বলছি।

শ্যামলী বাহির হইয়া গেল। মঙ্গল হতভম্বের মত ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার পর শ্যামলীর অনুসরণ করিল।

* *
*

বাহিরের বৈঠকখানা। চন্দ্রনাথ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া গায়ের জামা খুলিতেছে, পিছন হইতে শ্যামলী প্রবেশ করিয়া ডাকিল :

শ্যামলী : চন্দ্রদা—

চন্দ্র : কে ? ও:—

শ্যামলী : আপনি কি মঙ্গলদাকে আপনার জিনিসপত্তর নামিয়ে আনতে বলেছেন ?

চন্দ্র : হ্যাঁ।

শ্যামলী : কেন ?

চন্দ্র : বাইরের ঘরে থাকতেই আমার ভাল লাগে তাই—

শ্যামলী : ভাল লাগে ! না, জোর করে ভাল লাগাচ্ছেন !

চন্দ্র : মানে ?

শ্যামলী : মানে আমার চেয়ে আপনি ভাল বোঝেন। দেখুন, শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা করবেন না। আপনারই ঘর, চিরদিন যেমন থেকে এসেছেন আজও থাকবেন। আমার জিনিস-গুলো আমি এখুনি সরিয়ে নিচ্ছি।

ইতিমধ্যে মঙ্গল ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল :

মঙ্গল : শ্যামলী দিদি তোমার জিনিসপত্তর কিছুই আনতে দিলেন না, আমার বাবু দোষ নেই কিন্তু।

চন্দ্র : কারুর কোন দোষ নেই। যত দোষ আমারই !

শ্যামলী : এখানে দোষের কথা বাজে, আসল হোচ্ছে অভিমান। নিজেকে এমন করে দোষী সাব্যস্ত করাও আপনার পক্ষে কম অন্যায় হচ্ছে না কিন্তু ! ঘরে ঢুকে আমার জিনিষগুলো দেখেই আপনি মনে করেছেন ঘরটা বোধ হয় আপনার মা আমাকে দিয়ে দিয়েছেন ?

চন্দ্র : তুমি যেভাবে গুছিয়ে কথা বলছ, শুনে মনে হচ্ছে যেন কত দিনের আলাপ ?

শ্যামলী : আলাপটা অনেক দিনেরই একথা মিথ্যে নয়। চোখে দেখা দেখি না থাকলে কি হয়, পরিচয়টা আমাদের অনেক আগের।

চন্দ্র : তবে আর 'আপনি' রেখেছ কেন ? ওটাকে তো তুলে দিলেই হয়।

শ্যামলী : হ্যাঁ, তুলেই দেব। এইমাত্র যাঁকে দেখলাম, অশৌচ গায়ে এখনও যাঁকে প্রণাম কোরতে পারিনি, হঠাৎ তাঁকে 'তুমি' বলি কি কোরে? কাল বাদে পরশু বাবার কাজ। কাজটা হোয়ে যাক, ভাল কোরে প্রণাম করি....তাছাড়া অনুমতি যখন দিয়ে রাখলেন, তখন তুলে তো দেবই। যাই হোক, আপনার ঘর দোর গোছগাছ করে দিচ্ছি, নিচে শোবার জিদটি ত্যাগ করবেন দয়া করে।

কথাগুলি বলিয়াই শ্যামলী ঝড়ের মত কক্ষ ত্যাগ করিল।

চন্দ্র : ইনিই কি বাড়ীর কর্তা হোয়েছেন নাকি ?

মঙ্গল : না, কর্তা হননি—তবে গিন্নী হবেন বলে শুনছি।

চন্দ্র : হুঁ! গিন্নী !! গিন্নী অমনি হোলেই হলো আর কি !

* *

*

ঈশ্বর বাকচির বাড়ীর বাহিরের ঘর। ঈশ্বর ও মনোরমা। মনোরমা ঘরের পাট করিতে করিতে স্বামীকে বলিতেছিলেন :

মনোরমা : দেখলে ত, বুড়ো মরে গিয়েও মেয়ের জন্যে কেমন কাজ বাগিয়ে রেখে গেছে ?

ঈশ্বর : গেলেও ধোপে টিঁকবে না।

মনোরমা : তার মানে ? বলে—মেয়ে এখন হেঁসেলে গিয়ে হাঁড়ি ঠেলছে ! এরপর কে ওরে ঠেকায় ? আমার যেমন পোড়া কপাল ! শিবের মতন বর হাতের কাছে পেয়েও শিবানীর বরাতে....

ঈশ্বর : হবে—হবে, ভেবো না ; সবুরে মেওয়া ফলে। এইজন্যেই

বিদ্যাপীঠের বোর্ডিং থেকে অনেক চেষ্টা যত্ন করে শিবুকে নিয়ে এসেছি।

মনোরমা : সে বুঝেছি—কিন্তু মেয়েকে বাড়ী এনে কি করতে চাও?

ঈশ্বর : তালিম দিতে চাই—এখন মেয়ের এলেমের ওপরেই সব··· (ইঙ্গিত করিয়া) বুঝলে? আমি নিজেই ওবেলা শিবানীকে ও বাড়ীতে নিয়ে যাব। হাজার হোক—চন্দর ওর ছেলেবেলাকার সাথী, এক সঙ্গে খেলেছে।

মনোরমা : দেখ!

* *
*

চন্দ্রনাথ বৈঠকখানায় বসিয়া একটি আধুনিক গান গাহিতেছিল। ঘরের পিছনে গলির মত একটি ঘুলঘুলির মধ্যে দাঁড়াইয়া সংগোপনে শ্যামলী একখানি খাতায় পেনসিল দিয়া গান এবং সুর সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ টুকিয়া লইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে সময় বুঝিয়া হঠাৎ ঘরের মধ্যে পাশের দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া বলিল :

শ্যামলী : গানখানি আমাকে শেখাবে চন্দ্রদা?

চন্দ্রনাথ : আবদার নাকি? গান শেখা কি তোমাদের রান্নাবান্নার মতন সোজা—যে কাছে বসে শুনলেই শেখা হয়ে গেল।

শ্যামলী : হিসেব করে কথা বলতে শেখ চন্দ্রদা! রান্না যদি এত সহজ ভাব, রান্নাঘরে মার কাছে বসে শিখে নাও ত দেখি কত মুরদ।

চন্দ্রনাথ : তোমার কাজে যাও— এখন বিরক্ত ক'র না।

শ্যামলী : গান শিখতে আসাও একটা কাজ—শিখতে চাইলে বিরক্ত

করা হয় না। কাছে বসিয়ে দেখনা—আমি শিখতে পারি কি না?

চন্দ্রনাথ: গলা মিষ্টি হলেই গান শিখে মধুবর্ষণ করা যায় না—এ হচ্ছে মস্ত একটা সাধনা।

শ্যামলী: বেশ ত, তুমি গুরু হয়ে আমাকে শিষ্যা করে নাও না—আমিও সাধনা করব।

চন্দ্রনাথ: না, না, না; তোমার এখন শিক্ষা হবে না—সে বয়স গেছে। এই ইচ্ছাই যদি ছিল—য্যাদ্দিন কি করেছিলে? বাপের কাছ থেকে আদায় করতে পারনি? আমাকে জ্বালাতন ক'রনা বলছি—আমার দ্বারা হবে না।

শ্যামলী: তোমার দ্বারাই হবে—আমার জেদ ত জানো না! যদি না শেখাও—তুমি যা গাইবে, আমি সে সব কাণ দিয়ে খেয়ে তোমায় তাক লাগিয়ে দেব—তোমার পসার মেরে দেব! ভালো চাও ত—এখনো আমাকে তোমার সাকরেদ করে নাও বলছি!

চন্দ্রনাথ: কিছুতেই না। আমারো ধনুর্ভঙ্গ পণ—কিছুতেই তোমাকে গান শেখাবো না। কেন জানো—তুমি গান শেখ, এ আমি চাই না।

শ্যামলী: এই কথা!

বাহির হইতে ঈশ্বর বাগচি ডাকিলেন: চন্দর আছ?

শ্যামলী দ্রুতপদে দরজা দিয়া পার্শ্বের ঘুলঘুলিতে গেল। চন্দ্রনাথ অভ্যর্থনার সুরে বলিল: ভিতরে আসুন।

ঈশ্বর বাকচি কন্যাকে ইঙ্গিতে বাহিরেই অপেক্ষা করিতে বলিয়া

ভিতরে গেলেন এবং বৈঠকখানার মধ্যে সেই ফরাসের এক প্রান্তে ঝাঁকিয়া বসিয়া চন্দ্রনাথের সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :

ঈশ্বর : সেই চিঠিখানা পাঠাবার পরেই হঠাৎ ঐ দুর্ঘটনা ঘটে যায় বাবা—এই ঘরেই। সেই লজ্জায়—তুমি এসেছ জেনেও দেখা করতে পারিনি।

চন্দ্রনাথ : যা হবার হয়ে গেছে কাকাবাবু—আপনি ওসব কথা ভুলে যান।

ঈশ্বর : ভুলব বলেই ত বাবা, শিবানীকে দেখতে গিয়েছিলাম বিদ্যা-পীঠে। আমার কাছে যেই শুনলে তুমি এসেছ—আর ছাড়লে না, ছুটি নিয়ে আমার সঙ্গেই বাড়ীতে এলো।

চন্দ্রনাথ : শিবানী তাহলে এখনো পড়ছে ?

ঈশ্বর : বিলক্ষণ ! তোমার কথাতেই ত ওকে বিদ্যাপীঠে পাঠিয়ে ছিলাম—এবার ম্যাট্রিক দেবে ; পড়া শোনায় ভালো,—আর গানে নাকি ভারি নাম করেছে !

চন্দ্রনাথ : গানে ! কিন্তু ওর ত গানের গলা নয়—সেই জন্যেই বলেছিলাম, ওকে লেখাপড়া শেখাতে।

ঈশ্বর : কিন্তু বাইরের লোকে কি তা শোনে বাবা ! এত বড় গানের ওস্তাদের বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক, তার ওপর তোমার ছাত্রী—সবাই তাই ত ধরে বসেছে। কি নাটক হবে ওদের বিদ্যাপীঠে, তাই বেছে বেছে ওকেই দিয়েছে গানের পার্ট। তোমার কাছে শেখবার জন্যেই ত আহ্লাদে আটখানা হয়ে ছুটে এসেছে।

চন্দ্রনাথ : কিন্তু আমার পরীক্ষা যে এসে পড়েছে—কাকাবাবু ! আমি ত সময় পাব না—

ঘরের বাহিরে শিবানী এবং ঘরের অন্যদিকে ঘুলঘুলির ভিতরে

শ্যামলী ইহাদের কথা শুনিতেছিল। শিবানী এই সময় ভিতরে আসিয়া চটুল ভঙ্গিতে চন্দ্রনাথের পানে চাহিয়া সহাস্যে বলিল :

শিবানী : বা—রে! তাহলে আমার পার্টের কি হবে বল ত? আমি যে তোমার ভরসাতেই পার্টটা নিয়েছি চন্দ্রদা! আর গান ত মোটে তিন খানা! ক'দিনই বা লাগবে—আমি নিজে এসে শিখে যাব।

ঈশ্বর : যাক্—এখন যা করবার হয় কর বাবা, তোমাদের মধ্যে বোঝাপড়া হোক, আমি এই ফুরসদে একবার ভিতরে গিয়ে বৌঠানের সঙ্গে দেখা করে আসি।

ঈশ্বর বাকচি লাঠিটি হাতে লইয়া ঠক ঠক আওয়াজ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। ঘুলঘুলির মধ্যে দাঁড়াইয়া শ্যামলী ঈশ্বর বাকচিকে ভিতরে যাইতে দেখিল।

বৈঠকখানায় ফরাসে—চন্দ্রনাথ যথাস্থানে উপবিষ্ট। মনের বিরক্তি মুখে প্রকাশ করে নাই সে। শিবানী ফরাসের একপ্রান্তে বসিয়া দুই পা দুলাইয়া চন্দ্রনাথের সহিত কথা বলিতেছে :

শিবানী : হ্যা—চন্দ্রদা, তোমাদের বাড়ীতে বাঙাল দেশের একটি মেয়ে এসেছে শুনলাম!

চন্দ্রনাথ : বাঙালী মেয়ে বল! তুমি কি তাঁকে দেখনি?

শিবানী : (হাসিয়া) কি করে দেখব! আমি ত আজই সবে এসেছি। শুনছিলাম নাকি মস্ত এক গাইয়ের মেয়ে! নিজেও খুব গাইতে জানে বুঝি?

চন্দ্রনাথ : গাইয়ের মেয়ে হলেই যে গায়িকা হতে হবে—তার কোন মানে আছে?

শিবানী : ওমা! নেই আবার!

চন্দ্রনাথ: না। বিদ্বান বাপের ছেলে মেয়ে হোলেই কি বিদ্বান হয়? এও তেমনি। তা ছাড়া, ওঁর বাবা বারো বছর কাল গানই গাননি—বুকের অসুখের জন্যে গাইতে মানা ছিল। সেই মানা না মেনে গান গেয়েই ত মারা পড়লেন এখানে এসে।

শিবানী: মেয়েটি তাহলে বাপের কাছেও গান শেখে নি?

চন্দ্রনাথ: শুনলে না—কি করে শিখবে? আমার মনে হয়—মেয়েদের গান না শেখাই ভালো!

শিবানী: তার মানে—ও বিদ্যেটা তোমারাই একচেটে করে রাখো?

চন্দ্রনাথ: জানো, শ্যামলী গান শিখতে চেয়েছিল আমার কাছে। কিন্তু আমি রাজি হইনি।

শিবানী: বুঝিছি; সেই জন্যে ভয় হচ্ছে! আমাকে শেখাতে বসলেই পাছে তোমার শ্যামলী এসে যদি আব্দার ধরে বলে—আমাকেও শেখাও!

ঠিক এই সময় ধীরে ধীরে শ্যামলী কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল:

শ্যামলী: আপনি ভুল বুঝেছেন! চন্দ্রদার কাছে স্বচ্ছন্দে আপনি গান শিখুন—আমার কাছ থেকে কোন বাধা আসবে না।

শিবানী: ও! আপনিই বুঝি শ্যামলী? বেশ ত, আসুন না আমরা দুজনেই শিখি। দেখি, উনি না শিখিয়ে কেমন করে পারেন?

শ্যামলী: না ভাই, উনি বলেছেন, কিছুতেই আমাকে শেখাবেন না।

শিবানী: উনি বললেই হলো—আপনার এমন মিষ্টি গলা!

শ্যামলী: কিন্তু উনি যে বলেছেন—গলা মিষ্টি হলেই গান শিখে মধুবর্ষণ করা যায় না। এর পর শেখাবার জন্যে উনি নিজে সাধলেও আমি বলব—না। শেখবার আগ্রহ থাকলে শুনেও শেখা যায়।

বলিতে বলিতে শ্যামলীর মুখখানা দৃপ্ত হইয়া উঠিল—চন্দ্রনাথ ও শিবানী এক দৃষ্টে শ্যামলীর প্রদীপ্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

* *

*

চন্দ্রনাথের অন্দর মহল উঠান ও তাহার উপরে চাতালের পরেই এক ফালি দালান। সেখানে একখানি কার্পেটের আসনে বসিয়া ঈশ্বর বাকচি বৈকালী জলযোগ করিতে করিতে মহামায়া দেবীর সহিত গল্প করিতেছেন। কামিনী পিছনে দাঁড়াইয়া পাখার বাতাস দিতেছে।

ঈশ্বর : এ সব কিন্তু বাড়াবাড়ি হলো বৌঠান!

মহামায়া : সে কি ঠাকুরপো, বাড়ীর পাশে বাড়ী—অথচ কালে ভদ্রে আস। ঠাকুর ঝারা থেকে উঠলেন—তুমিও এলে। ঠাকুরের প্রসাদ—কি আর এমন বেশী! কামিনী, ঠাকুরপোর খাওয়া হলে শিবানীকে—

ঈশ্বর : থাক্ থাক্—সে একটু পরে আসবে'খন। তার ইস্কুলে গান হবে কি না—চন্দরের কাছে শিখছে।

মহামায়া : চন্দর গান শেখাচ্ছে?

ঈশ্বর : একথা কেন বৌঠান?

মহামায়া : ও ছেলের কথা ব'ল না ঠাকুরপো! মেয়েরা গান শেখে—ও তা চায় না। এই শ্যামলী এসে পর্যন্ত কত সাধাসাধি করেছে; কিন্তু ওর ঐ এক কথা—না।

এই সময় শ্যামলী ও শিবানী প্রবেশ করিল। শিবানী মহামায়াকে গড় করিয়া সহাস্যে বলিল:

শিবানী : জেঠাই মা, চিনতে পারেন?

মহামায়া : দু মাস না দেখে যদি মেয়েকে ভুলে যাই—তাহলে যে সংসার

করাই বৃথা হয় বাছা। শ্যামলী, আমার ঠাকুরপো—তোমারো কাকাবাবু হন, গড় কর।

শ্যামলী দূরে থাকিয়া হেঁট হইয়া গড় করিল। আড়চোখে তাহার দিকে চাহিয়া ঈশ্বর বাকচি বলিলেন :

ঈশ্বর। থাক্—থাক্—

শ্যামলী : আপনাকে গড় করবার জন্যে আমি কি কম খোঁজাখুঁজি করেছিলুম!

ঈশ্বর : কেন বল ত?

শ্যামলী : আমার বাবার ব্রত ভঙ্গ করে যিনি তাঁকে বৈতরণীর পারে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে গড় করতে ইচ্ছা হয় না?

ঈশ্বর : তুমি ত বেশ প্যাঁচ দিয়ে কথা বলতে জান দেখছি। কিন্তু মানুষ কি সাধ করে কাউকে বৈতরণী পার করাতে পারে বলতে চাও?

শ্যামলী : উপলক্ষ হওয়া ত আশ্চর্য্য নয়! বারো বছর ধরে বাবাকে আগলে আগলে বেড়াচ্ছিলাম, তারই এক অসতর্ক ফাঁকে যমদূতের মতন এসে আপনি যে কাণ্ড সেদিন করে গেছেন কাকাবাবু, আর যেই ভুলুক—আমি কিন্তু ভুলতে পারব না!

ঈশ্বর বাকচির হাত হইতে জলের গ্লাসটি সশব্দে পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি তিনি উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন :

ঈশ্বর : কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা তোমার—আমাকে বললে যমদূত!

শিবানী : বাবার কাছে মাপ চেয়ে ও কথা আপনার প্রত্যাহার করা উচিত।

শ্যামলী : অন্যায় করা কিম্বা অন্যায় বলা আমার অভ্যাস নয়। মুখে আমি যা বলি তা বদলায় না।

ঈশ্বর : 	বৌঠান, আপনিও যে চুপ করে আছেন দেখছি! এই দুর্মুখ বাচাল মেয়েটার আস্পর্দ্ধা—

দরজার কাছে এই সময় চন্দ্রনাথকে দেখা গেল। সেখান হইতেই রুক্ষস্বরে সে বলিয়া উঠিল :

চন্দ্রনাথ : 	আ! কি হয়েছে?

ঈশ্বর : 	ছোটলোকের এই নচ্ছার মেয়েটা—

শ্যামলী : 	ভদ্রভাবে কথা বলবেন আপনি।

ঈশ্বর : 	ও! ভারি ভদ্রতা শেখাতে এসেছেন! ভিখিরী বাপের হাত ধরে—কোথাকার কে—জাতকুলের ঠিক নেই—এখানে উড়ে এসে জুড়ে বসে একেবারে—

ক্রোধের আবেগে ঈশ্বর বাকচির মুখের কথা বন্ধ হইয়া গেল।

শ্যামলী : 	থামুন বলছি। মনে রাখবেন—যে দাবী তৈরী করে আপনি এ বাড়ীতে অনাহূত হয়ে এসেছেন, তার চেয়ে আমাদের আসার ও আমার থাকার দাবী ঢের বেশী।

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়াই শ্যামলী ছুটিয়া গিয়া মহামায়ার পা দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া গাঢ় স্বরে বলিল :

শ্যামলী : 	মাসীমা! আপনি করুন বিচার। যদি আমি অন্যায় বলে থাকি, নিজের হাতে আমাকে শাস্তি দিন—তাড়িয়ে দিন বাড়ী থেকে। নৈলে—

বলিতে বলিতে শ্যামলীর গলা ধরিয়া আসিল এবং কথা আর কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল না। এই অবস্থায় মহামায়া দেবী শামলীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন :

মহামায়া : 	না মা, তুমি কিছুই অন্যায় বলনি।

* * *

ঈশ্বর বাকচির বাড়ীর ঘর। ঈশ্বর ও মনোরমা কথা বলিতেছেন।

মনোরমা : তুমি অতটা মাথাগরম না করলেই পারতে।

ঈশ্বর : তা ব'লে একটা ডেঁপো মেয়ের মুখের কথা শুনে মুখ বুজিয়ে থাকবো? `

মনোরমা : মুখ খুলেই বা লাভ কি করে এলে বলো? মাঝ থেকে ও বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্কই ঘুচে গেল!

ঈশ্বর : এর পরও—কি তুমি আশা কর? ও মেয়েকে গিন্নী অমন করে আস্কারা দিলে জেনেও?

মনোরমা : তুমি হচ্ছো মেয়ের বাপ, তা বলে ঐ নিয়ে মান কাড়িয়ে বসে থাকলে হবে না ত! মেয়ের মনের খবর রেখেছ? জানো, ও চন্দরকে—

শিবানী এই সময় প্রবেশ করিয়া বলিল :

শিবানী : মা, শুনেছ—চন্দরদা কাল রাতের গাড়ীতেই এলাহাবাদ চলে গেছেন?

মনোরমা : শোনো! হ্যাঁরে শিবি, চন্দরকে তোর কি রকম মনে হয়?

শিবানী : ওঁর ঘাড়ে এখন ভূত চেপেছে! নিজে মস্ত গাইয়ে, সেই অ্যামাকে গেলেন! মেয়েরা গান শেখে এ উনি চান না। থাকতো এখানে—দেখাতুম শেখায় কি না!

বলিতে বলিতে শিবানী বেগে চলিয়া গেল।

মনোরমা : শুনলে মেয়ের কথা? মেয়ের মন কোথায়—মনে কর?

ঈশ্বর : হুঁ, তাহলে ত হাল ছাড়া ঠিক নয়। কিন্তু তা'বলে ঐ দুজ্জাল ছুঁড়িটাকে ও বাড়ী ছাড়া না করলে ভদ্রস্থ নেই, আর—হালেও পানি মিলবে না!

মনোরমা : সে পারো ত কর না—আমি কি বারণ করছি।

ঈশ্বর: আচ্ছা, দেখ্‌ছি কি করা যায়—

মনোরমা: আর দেখবে কবে? হাত ছাড়া হয়ে গেলে দেখবে?

ঈশ্বর: বারাণসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দেশ। অনাচার এখানে চলবে না! ন্যায়রত্ন মশাইকে আমি সব জানিয়েছি—ছুঁড়ির কুলজী ধরে টান দেবেন তিনি। দেখ না কি হয়!

* *

*

এলাহাবাদ মেসের সেই ঘর। চন্দ্রনাথ ও অবনী কথোপকথন করিতেছিল।

অবনী: তা তুমি পালিয়ে এলে কেন? দুই সতীনের ঝগড়ার পালার মতন দুই নায়িকার লড়াই না হয় দেখতে দিন কতক।

চন্দ্রনাথ। ঠাট্টা নয় হে! আমার পক্ষে তখন হয়ে দাঁড়িয়েছিল—বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা!

অবনী: শ্যামলী মেয়েটিকে কিন্তু দোষ দেওয়া যায় না—বরং she is praised for her bravery and self-consciousness.

চন্দ্রনাথ: আমি বলব—অতটা নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি হয়েছে; আমার মা যাই বলুন।

অবনী: তিন বন্ধুর প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রেখেছেন তোমার মা।

চন্দ্রনাথ: দেখ, মানুষের মনোভাব এখন দিনে দিনে বদলাচ্ছে। ৩৭ বছর আগে ঝোঁকের মাথায় তাঁরা যে সঙ্কল্প করেছিলেন, আজকের দিনে সেটা কি নির্বিচারে মেনে নেওয়া যায়? হ্যাঁ, তবে মা যখন শ্যামলীকে আশ্রয় দিয়েছেন, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ওকে ভালভাবে পাত্রস্থ করা।

অবনী: তাহলে শ্যামলীর ওপর তোমার কোন আকর্ষণই নেই বলতে চাও?

চন্দ্রনাথ: আকর্ষণ কাটাবার জন্যেই আমাকে সরে আসতে হয়েছে।

অবনী: কিন্তু পরীক্ষার পর ত বাড়ী যেতে হবে?

চন্দ্রনাথ: না। পরীক্ষা দিয়েই গোয়ালিয়রে চলে যাব। বাবার আর এক বন্ধু সেখানে থাকেন। ক্লাসিক গানে তিনি দিকপাল— তাঁর কাছে ঐ বিদ্যাটা শিখতে হবে। বাবারও এই ইচ্ছা ছিল।

* *

*

রামাপুরা। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠী। দূরে—এক পাশে ছাত্রগণকে অধ্যয়ন রত দেখা যাইতেছে। অন্য পাশে কতিপয় ছাত্রীও অধ্যয়ন নিমগ্না।…সম্মুখের দিকে দেখা যাইতেছে—গৌরবর্ণ, মুণ্ডিত-মস্তকের মধ্যস্থলে দীর্ঘশিখা, হাস্যমুখ বর্ষীয়ান অধ্যাপক ন্যায়রত্ন মহাশয় মৃগচর্মের আসনে উপবিষ্ট। তাঁহার সম্মুখে একখানি কুশাসনে ঈশ্বর বাকৃচি বসিয়া ন্যায়রত্নের মুখে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছেন।

ন্যায়রত্ন: দেখ ঈশ্বর, সমাজপতি আর বিচারপতি—উভয়ের দায়িত্বই বড় কঠিন। এখানে বিচারে পক্ষপাতিতা এলে তার অপরাধ জনিত ক্ষতি সমাজকেও বহন করতে হয়। সুতরাং শ্যামলী মেয়েটির সম্বন্ধে তুমি যে অভিযোগ করেছ, তার জন্যে ব্যাপকভাবে আমাকে নানাদিকে অনুসন্ধান করতে হচ্ছে।

ঈশ্বর: কিন্তু এ যেন সেই মশা মারতে কামান দাগা হচ্ছে ন্যায়রত্ন মশাই! আপনি ত জানেন, কাশীতেও ইদানীং এই শ্রেণীর

নষ্ট মেয়েরা কি ভাবে পাপের বোঝা এনে সমাজকে গোল্লায় দিচ্ছে !

ন্যায়রত্ন। কিন্তু তার জন্যে শুধু ঐ অবলাদের দোষী করা চলে না; পিছনের বৃত্তান্ত খুঁজলে পুরুষদের অনাচারগুলোই নগ্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই দেখ না, তুমি যে মেয়েটিকে নষ্ট বলে সমাজচ্যুত করতে চাইছ, আমি কিন্তু এ পর্যন্ত তার সম্বন্ধে যতটুকু জানতে পেরেছি—তাতে বিস্মিতই হয়েছি।

ঈশ্বর: বলেন কি ? আপনি বিস্মিত হয়েছেন ?

ন্যায়রত্ন: তুমিই ত অভিযোগ করেছিলে ঈশ্বর—তোমার কথিত সেই হাঙ্গামার পর চন্দ্রনাথ গৃহত্যাগী। এমন কি, এম-এ পরীক্ষার পরও সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেনি।

ঈশ্বর: তাহলেই বুঝুন—কার জন্যে চন্দ্রনাথকে গৃহত্যাগী হতে হয়েছে।

ন্যায়রত্ন: সেদিন অন্নপূর্ণা মন্দিরে চন্দ্রনাথের মাতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি বললেন—চন্দ্র আমার বিদ্বান ছেলে হলে কি হবে, কিন্তু পরের মেয়ে শ্যামলী আমার সত্যকার ছেলের কাজ করছে।

ঈশ্বর: উনি বাড়িয়ে বলেছেন ন্যায়রত্ন মশাই! ঐ ছুঁড়িটা ওঁকে যাদু করেছে। কিন্তু আপনিই বলুন ত—মেয়েদের লজ্জা সরম গোল্লায় দিয়ে ছেলের মত হয়ে কাজ করাটাই কি নিন্দের নয় ? জানেন—শিবনাথ লাহিড়ীর ভিটের উঠোনটা চষে চাষের ক্ষেত বানিয়েছে ঐ ধামাল মেয়েটা! ফসল যা ফলে—চাষার বেহদ্দ হয়ে পাইকের ডেকে বিক্রী করে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে! দরকার হলে গাছকোমর বেঁধে হাতাহাতি করতেও

পেছপাও হয় না—পুরুষ ব'লে কেয়ারই করে না। এই হলো ওঁর ছেলে!

ন্যায়রত্ন : কিন্তু চন্দ্রনাথের মায়ের মুখে মেয়েটির প্রশংসা ত ধরে না। বললেন, শ্যামলীই আমার ছেলের কাজ করছে। আমিও বলি ঈশ্বর, আমাদের সমাজে এখন এমনি মেয়েরই প্রয়োজন হয়েছে। আচ্ছা, আমি তোমাকে সঠিক কথা দিচ্ছি ঈশ্বর, সাত দিনের মধ্যেই তদন্ত সেরে আমি এ মামলার রায় দেব।

*   *

*

চন্দ্রনাথের বহির্বাটীর বৃহৎ উঠানটির শ্রী এখন অন্যরূপ হইয়াছে। খোলা দেউড়ীতে সবুজ রংয়ের কাঠের ঘন ঘন গরাদে যুক্ত দরজা বসিয়াছে—যে দরজা দিয়া অবাধে প্রথম দিন একা করিয়া শ্যামলীরা প্রবেশ করিয়াছিল। এখন তাহা সর্বক্ষণ বন্ধ থাকে। শ্যামলীর ব্যবস্থায় সমস্ত প্রাঙ্গণটি সবুজ গাছে ভরিয়া গিয়াছে। যেদিকে চন্দ্রনাথের বৈঠকখানা—সেদিকে মনোরম ফুল-বাগিচার সৃষ্টি হইয়াছে। বাহিরের দেউড়ী হইতে ভিতরের দেউড়ী পর্য্যন্ত স্থানটির মাঝ দিয়া রাস্তা গিয়াছে; তাহার দুই পাশে নানা জাতীয় মরশুমী ফুলের শ্রেণী!—একদিকে তরি-তরকারীর ক্ষেত। মাচায় লাউ ঝুলিতেছে। টমেটো, বেগুন, শশা ফলিয়াছে অজস্র। পাঁচিলের দিকে কলাগাছের শ্রেণী—মাঝে মাঝে পুরুষ্ট পেপে গাছ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি গাছে ফলও ধরিয়াছে।

উষাকাল। এত সকালে অস্পষ্ট আলোকেই মঙ্গল বাগানে কাজ করিতেছিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় দেউড়ীর কাছে আসিয়া রুদ্ধ দরজার গায়ে লাগানো লোহার বড় বড় কড়া দুইটি নাড়িতেই মঙ্গল সচকিত-ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল—তাহার পর দেউড়ীর দিকে তাড়াতাড়ি গিয়া

দেউড়ী খুলিয়া দিয়া ও পুনরায় বন্ধ করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিল। তারপর গামছাখানি গলায় দিয়া মাটিতে হেঁট হইয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পায়ের তলায় ভক্তিভরে গড় করিয়া মঙ্গল বলিল:

মঙ্গল: প্রাতঃকালেই ঠাকুর মশায়ের চরণধুলো পড়ল—কি সৌভাগ্য আমাদের।

ন্যায়রত্ন: মঙ্গল হোক তোমাদের। বিশেষ প্রয়োজনেই আমাকে আসতে হয়েছে বাবা! বাড়ীতে কে আছেন! সবাই উঠেছেন ত?

মঙ্গল: আজ্ঞে, খুব ভোরেই আমরা উঠি ঠাকুর মশাই! হ্যাঁ, তবে মা ঠাকরোণ কামিনী পিসিকে সাথে নিয়ে গঙ্গা নাইতে গেছেন।

ন্যায়রত্ন: এত ভোরে?

মঙ্গল: এ যে তেনার অভ্যেস হয়ে গেছে ঠাকুর মশাই! ঝড় হোক, জল হোক্—রাত থাকতে উঠে বেরুবেন, গঙ্গা নেয়ে ঠাকুর দেবতা সব দর্শন করে রোদ ওঠবার আগেই ফিরে আসবেন।

ন্যায়রত্ন: শ্যামলীও কি তাঁর সঙ্গে গেছেন?

মঙ্গল: না, না, তিনি বাড়ীতেই আছেন—তাঁরও ত কাজ কম নয়!

ন্যায়রত্ন: হ্যাঁ, আমি তা জানি। তুমি বাবা একবার শ্যামলী মাকে ডেকে দেবে—তাঁর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

মঙ্গল: যে আজ্ঞে, আমি যাচ্ছি। তাহলে বৈঠক ঘর খুলে দিই, আপনি বসবেন আসুন।

ন্যায়রত্ন: চলো।

ন্যায়রত্ন মঙ্গলের পিছনে পিছনে প্রাঙ্গণের ফসল ও বাগিচা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে চলিলেন।

* *

*

দোতলার সেই ঘর। শ্যামলী ইতিমধ্যে স্নান সারিয়া সিক্ত চুলের রাশি পিঠে ঝুলাইয়া স্বরলিপি দৃষ্টে গান সাধিতেছিল। ঘরের বাহিরের দিকে জানালাগুলি সব বন্ধ রহিয়াছে। দরজাটিও ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মঙ্গল রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিল। সবেমাত্র শ্যামলীর গান সাধনা শেষ হইয়াছে। দ্বারে শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। মঙ্গলকে দেখিয়া সুধাইল :

শ্যামলী : মা আজ এরই মধ্যে ফিরেছেন নাকি?

মঙ্গল : না গো শ্যামলদি, মার ফিরতে এখনো দেরী আছে। কিন্তু এদিকে যে এক নতুন উৎপাত দেখছি গো!

শ্যামলী : কি হয়েছে?

মঙ্গল : ঠাকুর মশাই এই ভোরে হঠাৎ বাড়ী বয়ে এসেছেন যে।

শ্যামলী : ঠাকুর মশাই!

মঙ্গল : ন্যায়রত্ন ঠাকুর গো! তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে বাইরের ঘরে বসে আছেন।

শ্যামলী : তাই নাকি? তা···আমার···

মঙ্গল : না গো, শ্যামলদি, না—সে ভয় করুনি। তুমি যে—মা ঠাকরুণ স্নানে গেলেই ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে গান সাধতে বস'—মানুষ ত ছার, কাক চীলও জানতে পারে না! এখন এসো ত।

* *
*

বাড়ির বাহিরের বৈঠক ঘরখানি তেমনি ফরাস বিছানো এবং চারিদিকে বাদ্যযন্ত্রগুলি সাজানো রহিয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় ফরাসে বসিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছেন।

শ্যামলী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নম্রভাবে ফরাসের কাছে আসিয়া গলায় অঞ্চল দিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম করিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহার সীমন্তে হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন :

ন্যায়রত্ন : সুখী হও মা!—তুমিই ত শ্যামলী ?

শ্যামলী : আজ্ঞে হ্যাঁ। নামটি আমার মাতামহের দেওয়া।

ন্যায়রত্ন : তোমার মাতামহের নাম ?

শ্যামলী : ঈশ্বর নকুলেশ্বর কবিকঙ্কণ।

নাম বলিয়াই শ্যামলী যুক্তকরে উদ্দেশে মাতামহকে প্রণাম করিল।

ন্যায়রত্ন : নকুলেশ্বর কবিকঙ্কণ···মুক্তাগাছায়····কিন্তু এই নামে····

শ্যামলী : আমার মাতামহ মুক্তাগাছার মহারাজার সভাকবি ছিলেন।

ন্যায়রত্ন : তাই বল—তুমি কবিকঙ্কণের দৌহিত্রী! তাহলে—মলিনা····

শ্যামলী : আমার মায়ের নাম।

ন্যায়রত্ন : বা! সব মিলে যাচ্ছে। কবিকঙ্কণ আমার সতীর্থ ছিলেন। কাশী থেকে তিনি যখন মুক্তাগাছায় যান, তাঁর কন্যা মলিনা তখন বালিকা। তুমি মলিনার মেয়ে? বালিকা মলিনার সুন্দর মুখখানা এখানো মনে পড়ে।

শ্যামলী : তাহলে সেই মলিনার মেয়েকে বাকচি খুড়ো আর 'হাঘরে' মেয়ে বলে হেনস্তা করতে পারবেন না—যখন সে আজ এক দরদী দাদু পেয়েছে।

ন্যায়রত্ন : বাকচির মামলা যে ডিসমিস হবে, এ আমি আগে থেকেই জানতাম দিদি—এখন কার সাধ্য তোমাকে হেনস্তা করে।

শ্যামলী : এখন যে আমার কি আহ্লাদ হচ্ছে দাদু!

ন্যায়রত্ন : আমার আহ্লাদও বড় কম হয়নি দিদি! কি জানি কেন—

তোমাকে দেখেই মনে হলো—যেন দেবী বীণাপাণি বীণখানি রেখে মানবীর মূর্তি ধরে আমাকে দেখা দিলেন! এমন মিষ্ট স্বর কখনো শুনিনি—এমন লক্ষ্মীমেয়েও বুঝি দেখিনি। সত্য করে বল ত দিদি, এত ভোরে শুচিস্মতি হয়ে কিসের সাধনা করছিলে?

শ্যামলী: আপনার কাছে লুকাবোনা দাদু—তবে আমার এই গুপ্ত সাধনার কথা কেউ জানে না এ বাড়ীতে—এক ঐ মঙ্গলদা ছাড়া।

ন্যায়রত্ন: আমিও ব্যক্ত করব না দিদি। তুমি নির্ভয়ে বল।

শ্যামলী: মাসীমা স্নানে গেলেই আমি গোপনে গানের সাধনা করি দাদু। আমার কবি দাদু আর বাবার দেওয়া গানগুলিই আমাকে প্রেরণা দেয়।

ন্যায়রত্ন: নিজেই সাধনা কর?

শ্যামলী: হ্যাঁ দাদু। গুরুকৃপায় বঞ্চিত হয়েও নিষ্ঠাকে সম্বল করে সাধক একলব্য শস্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁর সাধনাই আমার আদর্শ।

ন্যায়রত্ন: আশ্চর্য—সত্যই অত্যাশ্চর্য! তুমি আমাকেও অবাক করে দিলে শ্যামলী। ৫০ বছর ধরে আমি অধ্যাপনা করছি—কিন্তু এমন নিষ্ঠার কথা এই প্রথম শুনলাম। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি—এ সাধনায় তুমি যে সিদ্ধিলাভ করবে তাতে ভুল নেই! আমি কি দেখছি জানো—তোমার ললাটে বাণীর বীণাচিহ্নটি শ্বেতচন্দনচর্চিত হয়ে ফুটে উঠেছে—গীদেবী বীণপাণির পরিপূর্ণ মূর্তি আমি তোমার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কথাগুলি শ্যামলীকে একই সঙ্গে বুঝি আনন্দিত

লজ্জিত ও অভিভূত করিল এবং তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া গেল নির্মল মুখখানির উপরে। সঙ্গে সঙ্গে সাড়ীর অঞ্চলটি গলায় টানিয়া দিয়া শ্যামলী পুনরায় শ্রদ্ধার সঙ্গে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পদযুগলে প্রণতা হইল।

* *

*

শঙ্কর বাকচির বাড়ীর বহির্মহলে প্রাচীর বেষ্টিত সল্প স্থানটুকু বাগিচার মত। একটি বাতাপি নেবু এবং দুই চারটি ফুলের গাছ দেখা যায়। এখানে ছেলেমেয়েরা খেলাধূলা করে। এদিন বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া, শিবানীকে সাজাইয়া—পাড়ার কতকগুলি ডেঁপো ছেলে এবং তাহাদের সঙ্গে দু তিনটি ফাজিল মেয়েও হুল্লোড় করিতেছিল। ইস্কুলের অভিনয়ে কিরূপ নাচিয়াছে—তাহার একটা বিকৃত ও হাস্যোদ্দীপক আদর্শ দেখাইতেছে শিবানী এবং তাহার অনুসঙ্গীরা তাহাকে ঘিরিয়া রঙ্গ করিতেছে।

হাবু নামে একটি ডেঁপো ছেলে বলিতেছিল: নাইস্!

নদো নামে আর একটি ছেলে বাহোবা দিয়া বলিল: বিউটিফুল!

পাচী নাম্নী একটি মেয়ে বলিল: শিবানী তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

রামী বলিল: সত্যি ভাই, কি খাসা নাচতে শিখেছে!

উৎসাহ পাইয়া শিবানী তখন নৃত্য প্রদর্শনে বেগময়ী হইয়া উঠিয়াছে। ছেলে মেয়েরা অতি উল্লাসে করতালি দিয়া বলিল: বা! বা! বাহোবা!

শিবানীর নাচ যখন খুব জমিয়া উঠিয়াছে, সেই সময় বাহির হইতে ন্যায়রত্ন মহাশয় দরজা ঠেলিতে ছিলেন। ভিতরের দিকে খিল আলগা থাকায় দ্বার খুলিয়া গেলে ন্যায়রত্ন প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ছেলেমেয়েগুলি হুল্লোড়ে এত উন্মত্ত যে তাঁহাকে কেহই লক্ষ্য করিল না। ন্যায়রত্ন

মহাশয় কিছুক্ষণ এই কাণ্ড দেখিয়া দৃঢ়স্বরে ধমক দিতেই তাহারা চমকাইয়া উঠিল এবং শিবানীকে ফেলিয়া অপর সকলে মুক্ত দ্বারপথে পলাইয়া গেল। শিবানী আর পলাইবার অবসর পাইল না; সলজ্জভাবে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। ন্যায়রত্ন রুক্ষস্বরে বলিলেন:

ন্যায়রত্ন: সঙ সেজে কি হচ্ছিল শুনি?

শিবানী: নাচ দেখাচ্ছিলাম। ইস্কুলের নাটকে আমি নেচেছিলাম কিনা! ওরা দেখেনি, তাই—

ন্যায়রত্ন: নেচে দেখাচ্ছিলে? ধেড়ে ধেড়ে বকা ছেলেদের সঙ্গে মিশে হুল্লোড় করতে লজ্জা করে না?

শিবানী: ওরা যে বল্লে—আমার কি দোষ? বা—রে—

শিবানী তাড়াতাড়ি বাগানের দিক দিয়া ঘুরিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। এদিকে বাহিরের ঘরের দরজা দিয়া ঈশ্বর বাকচি প্রবেশ করিলেন।

ঈশ্বর: কি সৌভাগ্য! ন্যায়রত্ন মশাই যে! আসতে আজ্ঞা হোক—আসতে আজ্ঞা হোক! বৈঠকখানায় বসুন!

ন্যায়রত্ন: না, আর বসব না। এখানেই সংক্ষেপে আমার কথাগুলো বলে যাই।

ঈশ্বর: আজ্ঞে—

ন্যায়রত্ন: দেখ ঈশ্বর, ঈশ্বরের এমনি আশ্চর্য মহিমা যে, তোমাকে দিয়ে অভিযোগ তুলেই শ্যামলীকে তিনি চিনিয়ে দিলেন!

ঈশ্বর: তার মানে?

ন্যায়রত্ন: মানে—শ্যামলী হচ্ছেন ময়মনসিং মুক্তাগাছার নকুলেশ্বর কবিকঙ্কণের দৌহিত্রী। তুমিও তাঁকে চিনতে। আমরা এক সঙ্গে অধ্যাপনা আরম্ভ করি এই কাশীতে। স্ত্রীবিয়োগ হ'তে

নকুল মুক্তাগাছায় ফিরে যায়—বালিকা-কন্যা মলিনাকে নিয়ে। শ্যামলী সেই মলিনার কন্যা।

ঈশ্বর: যঁ্যা! বলেন কি?

ন্যায়রত্ন: তোমার মামলা টিঁকল না। আমি আজ হঠাৎ গিয়ে, শ্যামলীকে দেখে এলাম; আর এখানে তোমার কন্যাকেও দেখলাম। তুমি বাইরের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিজের গৃহের দিকেই ফেল—তাতে নিজের এবং সমাজের কল্যাণ হবে।

কথাগুলি বলিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার বাকচির দিকে চাহিয়া ন্যায়রত্ন চলিয়া গেলেন। ঈশ্বর বাকচি স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

* *

*

রান্নাঘরের সামনে সেই চওড়া চাতালটি। ভিতরে রান্নাঘর। অন্যদিকে কূয়াতলা। নিম্নে ক্ষুদ্র উঠান। উঠানের উপরে রওয়াক—তাহার পরে দালান যুক্ত ঘর। সেই দালানের এক পাশ দিয়া দোতালার সিঁড়ি। দালানের ভিতরে দুইখানি ঘর—তাহার উপরের ঘর দুইখানিও এইরূপ। ঘরের সামনে খোলা ছাদ।

চাতালে প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে মহামায়া দেবী রান্নার যোগাড় করিয়া দিতেছিলেন। পাশে বসিয়া শ্যামলী কুটনা কুটিতেছিল। দেওয়ালের দিকে রান্নাঘরের খোলা দরজাটির কাছে কামিনী শীল নোড়া হইতে চাঁচিয়া চাঁচিয়া বাটা মসলা একখানি পাত্রে তুলিয়া রাখিতেছিল। প্রতিবেশিনীদের মধ্যে একটি বিধবা আর দুইটি সধবা—ইহারা মহামায়া দেবীর সংসারের কথাগুলি সকৌতুকে উপভোগ

করিতেছেন বুঝিয়া শ্যামলী মনে মনে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল।

মহামায়া : আমার ছেলের কথা আর ব'ল না—চারটে পাসই করুক, আর সভা-উজ্জ্বল ছেলে বলে যত খ্যাতিই পাক না কেন—আমার বরাতে হয়েছে উল্টো—ও ছেলে যেন সেই ষাঁড়ের গোবর।

১ম প্রতি : অমন কথা ক'য়োনা দিদি! তোমার ছেলে চন্দ্রনাথের জোড়া আছে?

মহামায়া : ও কথা শুনতেই ভালো বোন! আক্কেল বিবেচনা বলতে আমার ছেলের কিছু যদি আছে? পরীক্ষা দিয়ে একখানা চিঠি ফেলেই ছুটলেন বিদেশে। এম-এ পাশ করলেন, তার খবরটাই দিলে না! শ্যামলী খবরের কাগজে ওর নাম দেখে পড়ে শোনালে!

২য় প্রতি : সে কি গিন্নীমা, ছেলে নিজে তোমাকে জানায় নি? চিঠিও লেখেনি?

মহামায়া : চিঠি লেখেনি—কি করে বলি বাছা, তবে সে টাকায় বেলায়; তখন চিঠির ওপরে চিঠি—তার ওপরে তারও পাঠায়। তবে আর বলছিলুম কি?

৩য় প্রতি : ওমা, তাই নাকি?

মহামায়া : দুঃখের কথা কাকেই বা বলি! যা কিছু পুঁজি ছিল—চার চারটে পরীক্ষার পিছনে সব ত শেষ হয়ে গেল। এরপর গোয়ালিয়রে ছুটলেন গান শিখতে। তার কি বল না—লিখেই খালাস—টাকা পাঠাও। কিন্তু টাকা আসবে কোথা থেকে—সে বুদ্ধি কি ছেলের আছে?

১ম প্রতি : ও মা, সে কি গো ! গান শিখতেও টাকা ?

মহামায়া : লেখা পড়ার চেয়েও বেশী খরচ দিদি। আবার তার কত ভজকট ! এই একটা বছরে ক্ষেপে ক্ষেপে যে টাকা পাঠাতে হয়েছে—হাজারের ওপর তো নিচে নয় ! না—শ্যামলী ?

শ্যামলী : সে টাকা ত আর জলে ফেলেননি মাসীমা—যে দুঃখ করছেন ! ও তো একটা মস্ত বিদ্যে !

মহামায়া : তাও বলি, আমার ক্ষ্যামতায় কি হ'ত ? শ্যামলের বাবা যা কিছু ওকে দিয়ে গিয়েছিল, ও নিজেই জোর করে সে টাকাগুলো পাঠালে গা ! বোকা মেয়ে বুঝলে না—

শ্যামলী : মাসীমা, উনুন ধরে উঠেছে—

১ম প্রতি : আচ্ছা দিদি, এখন উঠি—দুদণ্ড কি বসবার জো আছে, ওদিকে আবার····হাঁ বাইরের উঠোনে যে সোনা ফলিয়েছে দিদি—

২য় প্রতি : এলে ত আর শুধু হাতে যেতে দেন না গিন্নীমা—

৩য় প্রতি : তাই ত—এই দ্যাখনা ! আমার মেয়ে বসন ত কদিন ধরে লাউএর ডগার জন্যে পাগল !

মহামায়া : ও সব আমার এই পাগলী মেয়ের কাণ্ড !

তিনটি প্রতিবেশীর হাতের কাছেই লাউএর ডগা এবং একফালি করিয়া লাউ ছিল—সবাই তুলিয়া লইয়া উঠিলেন ও চলিয়া গেলেন।

শ্যামলী : আপনার ওপরে আমার ভারি রাগ হচ্ছিল মাসীমা ! ঘরের কথা ওঁদের কাছে বলতে গেলেন কেন ? এখনি ওঁরা পাড়ায় ঢাক পিটে বেড়াবেন ত !

মহামায়া : বেড়াক গে ! আমি ত আর অন্যায় কিছু বলিনি বাছা !

এই সময় মঙ্গল দ্রুতপদে ভিতরে আসিয়া বলিল :

মঙ্গল : গিন্নীমা চেয়ে দেখ—কে এসেছে।

পরক্ষণে চন্দ্রনাথকেও প্রবেশ করিতে দেখা গেল। মহামায়ার মুখ আনন্দে উদ্ভাষিত হইলেও তিনি যেন জোর করিয়া মুখখানা ফিরাইয়া লইলেন। শ্যামলী তাড়াতাড়ি উঠিয়া উঠানে নামিয়া হেঁট হইয়া চন্দ্রনাথকে গড় করিল।

শ্যামলী : চন্দরদা! এসেছ?

চন্দ্রনাথ : একি! একটা বছরেই যে ধূমসী হয়ে উঠেছে শ্যামলী!

মহামায়া নীরবে হাতের জিনিস লইয়া রান্নাঘরে যাইতেছিলেন; এমন সময়ে চন্দ্রনাথ চাতালের কাছে গিয়া উঠান হইতে হেঁট হইয়া চাতালে মাথা নত করিয়া মায়ের পদধূলি লইতে হাত বাড়াইল।

চন্দ্রনাথ : আমার ওপরে রাগ করেছ বুঝি মা, তাই অমন করে মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিলে?

মহামায়া : আমার সঙ্গে ত এখন শুধু ডাকের সম্বন্ধ বাবা! পেটে ধরেছিলুম তাই! আঁতের টান থাকলে কি এ রকম করতে পারতে?

মহামায়া হাতের অঙ্গুলি ছেলের চিবুকে ঠেকাইয়া সে অঙ্গুলি মুখে দিয়া চুম্বন করিলেন সস্নেহে।

চন্দ্রনাথ। মা! বিশ্বাস করো—আমি এতটা বুঝতে পারি নি। আর তুমিও ত জানো মা, লেখাপড়ায় ভালো ছেলে হলেও আমার বুদ্ধিশুদ্ধির বড় অভাব। সেই ভেবে আমায় : ২৫ সবাই জানে—কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কদাপি নয়।

শ্যামলী : আপনার ছেলের দোষ ত্রুটি যাই থাকুক মাসীমা, ওঁর পেটে মুখে আলাদা কিছু নেই। তবে—বুদ্ধির অভাবই শুধু

নয়, যেটুকু আছে তাও মোটা; আপনি সব ভুলে গিয়ে ছেলেকে আশীর্বাদ করুন—যেন ওঁর সুবুদ্ধি হয়।

শ্যামলীর কথাগুলি চন্দ্রনাথের ভালো লাগিল না,—কথার সঙ্গে মুখের চাপা হাসি তাহার গায়ে যেন কেমন একটা জ্বালা ধরাইয়া দিল। প্রখর দৃষ্টিতে শ্যামলীর পানে একবার তাকাইয়াই যে দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল।

* *
*

ঈশ্বর বাকচির বাড়ীর সেই কক্ষ। ঈশ্বর ও মনোরমা চন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তনের খবর পাইয়া সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন।

মনোরমা: হাঁ গা, চন্দর নাকি ফিরে এসেছে?

ঈশ্বর: হ্যাঁ, শুনছিলাম ত—আজ সকালে এসেছে।

শিবানীকে এই সময় সাজিয়া গুজিয়া বাহিরে যাইতে দেখিয়া মনোরমা সুধাইলেন:

মনোরমা: কোথায় যাওয়া হচ্ছে এখন ঢং করে?

শিবানী মুখখানা ঘুরাইয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল:

শিবানী: ঢংয়ের কি দেখলে? চন্দরদাকে আমার পাসের খবরটা দিতে যাচ্ছি। যদি খেতে চান, নেমন্তন্ন করে আসব কিন্তু।

কথাটা বলিয়া কোন উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই হন হন করিয়া সে চলিয়া গেল।

ঈশ্বর: ভালো! আমরা হাল ছাড়লেও, মেয়ে কিন্তু ঠিক ধরে আছে।

মনোরমা: কেমন লোকের মেয়ে!

* *
*

নিচের দালানে চন্দ্রনাথ খাইতে বসিয়াছে। মা মহামায়া কাছে বসিয়া বাতাস করিতে করিতে ছেলেকে খাওয়াইতেছেন। শ্যামলী কোমরে আঁচল জড়াইয়া বেশ আঁট সাঁট হইয়া আহার্য পরিবেষণ করিতেছে।

মহামায়া : সেই কথাই বলছিলুম বাবা! শুধু গান বাজনা নিয়ে পড়ে থাকলে ত আর সংসার চলবে না। উনি যা রেখে গেছলেন, তোমাকে পড়িয়ে মানুষ করতে, আর এই সংসার চালাতে সবই শেষ হয়ে গেছে।

চন্দ্রনাথ : হ্যাঁ, মঙ্গলদা কি সব বলেছিল বটে।

মহামায়া : এখন একটা ভালো দেখে চাকরী বাকরি যোগাড় করে বাবা সংসারী হও।

চন্দ্রনাথ : ও-সব চাকরি-বাকরি আমার দ্বারায় হবে না মা—ও আমি পারব না।

মহামায়া। তবে ঘরের পয়সা খরচ করে অতগুলো পাস দেবার কি দরকার ছিল তোমার ?

চন্দ্রনাথ : চাকরী করব বলেই ত আর পড়া শুনা করিনি মা, ওগুলো হচ্ছে—সংস্কার। এ যুগে পাস না করলে কেউ মানেনা—তাই। তবে তুমি ভেব না মা, গান বাজনাও এখন অর্থকরী হয়েছে—এ থেকেই পয়সা উপায় করা যাবে।

এই সময় শিবানী আসিয়া দালানে দাঁড়াইয়া সহাস্যে বলিল :

শিবানী : এরি মধ্যে খেতে বসে গেছ চন্দর দা!

চন্দ্রনাথ : শিবানী যে—ভালো ত ? তুমিও দেখছি খুব বড় হয়েছ!

শিবানী : আর তুমি বুঝি খোকাটি হয়েছ চন্দর দা ?

মহামায়া : এসো মা—ব'স।

শিবানী: এখন আর বসব না জেঠাই মা! চন্দরদা এসেছেন শুনে দেখতে এসেছিলাম। জানো চন্দর দা, আমি এবার ম্যাট্রিক পাস করেছি?

চন্দ্রনাথ: তাই নাকি? বা! আমি ত কাকাবাবুকে বলেছিলাম—তোমাকে পড়াতে। আমি জানি, লেখাপড়া শেখবার মত মাথা তোমার আছে। পাস করেছ শুনে সত্যই খুব আহ্লাদ হলো।

শিবানী: খাওয়াতে হবে কিন্তু।

শ্যামলী এই সময় একটি পাত্রে গরম দুধের বাটি বসাইয়া পরিবেষণ করিতে আসিল—বাটিটি ভোজন পাত্রের পাশে বসাইয়া সহাস্যে বলিল:

শ্যামলী: পাস করেছেন বলে? তা উনিও ত এম-এ পাস করেছেন, তার ওপর গানের পাস—

শিবানী: তার মানে! শোধ বোধ হয়ে গেছে—এই ত? আপনার যেমন ছোট মন, সেই মতন বললেন! আমি কিন্তু খাওয়াব বলেই নেমন্তন্ন করতে এসেছি।

মহামায়া: তা যাই কর আর বল বাছা, শ্যামলের মন ছোট—এ কথা আমি কিন্তু মানব না।

চন্দ্রনাথ: তাহলে এই কথাই থাক্ শিবানী—তুমি যেমন খাওয়াবে, আমরাও তেমনি তোমাকে খাওয়াব।

শিবানী: Thank you. এই ত আমার চন্দরদার মনের কথা! একেই বলে, বড় মন—বুঝলেন?

কথাগুলি বলিয়াই শিবানী ভ্রূভঙ্গি করিয়া শ্যামলীর দিকে চাহিল। শ্যামলী চলিয়া যাইতেছিল, ঝাঁ করিয়া ফিরিয়া উত্তর দিল: তাহলে বড় করে একটা গিঁট দিয়ে রাখুন আপনার আঁচলে।

দুই চোখ পাকাইয়া শিবানী সুধাইল : এ কথা বলবার মানে ?

শ্যামলী গম্ভীর মুখে বলিল : এর মানে ত পড়েই রয়েছে, শোনেননি :

বড়'র সম্প্রীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ।

সকলকেই নির্বাক দৃষ্টিতে শ্যামলীর পরিহাস-প্রদীপ্ত মুখখানার দিকে চাহিয়া থাকিতে হইল। শিবানীর মুখে কথা যোগাইল না, চন্দ্রনাথ আলাপের সূচনা হইতেই জানে যে, এই মেয়েটির সহিত কথায় আঁটিয়া উঠা খুবই কঠিন, কেহ তাহাকে কথার প্রহরণ দ্বারা অতর্কিতে আঘাত করিলে পরক্ষণেই পাল্টা আঘাত দিয়া তাহাকে সে পরাজয় স্বীকার করাইবেই—এই দিক দিয়া তাহার বাক্যবাণপূর্ণ তূণ যেন অক্ষয়। শিবানী অকারণ শ্যামলীকে আঘাত দেওয়ায় মহামায়া দেবীও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন ; এখন শ্যামলীর কথার প্রতিঘাতে তাহাকে হতভম্ব হইতে দেখিয়া তিনিও মনে মনে প্রসন্ন হইলেন। এদিন আর কথাবার্তার সুবিধা হইবে না বুঝিয়া শিবানী কাহাকেও কিছু না বলিয়া দ্রুত-পদে চলিয়া গেল।

* *

*

আহারান্তে চন্দ্রনাথ সাজানো বৈঠকখানায় শুভ্র ফরাসের উপর বসিয়া বাদ্য যন্ত্রগুলি পরিদর্শন করিতে করিতে মঙ্গলকে সুধাইল :

চন্দ্রনাথ : হ্যাঁ—মঙ্গলদা, আমি যাবার পর এ-ঘরে তোমার শ্যামলদির কালোয়াতি বোধ হয় অবাধেই চলত ?

মঙ্গল : কি বলছ তুমি দাদাবাবু!

চন্দ্রনাথ : যেন ন্যাকা হলে—বুঝতে পারছ না! বাড়ীতে এসেই শুনলাম, শ্যামল নাকি মা'র কাজের ছেলে হয়েছে। সেই অধিকারে এ ঘরে বসে—আর তাঁর আনাড়ি হাতে ঐ দামী দামী বাজনা-

গুলির দফারফা করে রেখেছেন তো—এই কথাই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে।

মঙ্গল রাধামাধব! রাধামাধব! শ্যামলদি এ ঘরে এসে তোমার ফরাসে উঠে বসেছিল কোনদিন? লোকে ঠাকুর দেবতার ছবিকে যেমন তোয়াজ করে, তেমনি করে ঐ সব যন্তরগুলি ঝেড়ে মুছে রাখা, তার পর ধূপ ধুনোর ধোঁয়া দেওয়া ওনার ছিল নিত্যিকার কাজ।

চন্দ্রনাথ: তাই নাকি?

শ্যামলীও এই সময় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল:

শ্যামলী: যখের মতন তোমার বাদ্যযন্ত্রগুলি য্যাদ্দিন আগলে রেখেছিলাম চন্দরদা! এর জন্যে খোঁটাও খেয়েছি অনেকের কাছে—তবু পথ ছাড়িনি। এখন তুমি এলে—আমারও ছুটি।

চন্দ্রনাথ: তুমি যে এবার অনধিকার চর্চ্চা করনি—তাতে আমি খুসি হয়েছি।

শ্যামলী: তাই নাকি! তাহলে আমাদের অধিকারের সীমাটুকু কতদূর জানতে পারি?

চন্দ্রনাথ: যে সীমার মধ্যে তুমি আছ—এই আর কি! যাতে সবার সুখ্যাতিও পেয়েছ—সংসার দেখা শোনা, তরি-তরকারি ফলানো, এর সঙ্গে কিছু পড়াশোনা। বাস্—এই পর্য্যন্ত তোমার এগোবার সীমা। কিন্তু এর উপর শিবানীর মতন যদি গান বাজনা তোমাকে পেয়ে বসে, তাহ'লেই হয়েছে আর কি!

শ্যামলী: বুঝেছি—গানবাজনা অর্থাৎ সঙ্গীত সাধনাটাই হচ্ছে আমাদের

পক্ষে অনধিকার চর্চা! অথচ এরই সাধনার জন্যে তোমরা যাঁর আরাধনা কর—তিনি কিন্তু দেবতা নন—দেবী। তাহলে আমাদের বোঝা উচিত—মর্তে দেবী হওয়াও ঝকমারি।

চন্দ্রনাথ: তোমার সেই বদভ্যাস এখনো ঠিক আছে দেখছি—বাজে তর্ক করা।

শ্যামলী: এটাও অনধিকারচর্চা নিশ্চয়ই?

এ কথার পর মুখখানা ফিরাইয়া চন্দ্রনাথ ঘুরিয়া বসিল কথার উত্তর না দিয়া। শ্যামলী মুচকিয়া হাসিয়া বলিল:

শ্যামলী: ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যতই তুমি বলনা কেন চন্দরদা—মেয়েদের গান শেখা উচিত নয়; আমি কিন্তু ওকথা কিছুতেই মানব না, গান আমাকে শিখতেই হবে।

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়াই সে সবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

* *
*

কয়েকদিন পরে। রান্নাঘরের সেই চাতাল। সন্ধ্যার প্রাক্কাল। মহামায়া দেবী শ্যামলীর চুল বাঁধিতেছিলেন। চুল বাঁধার কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় শিবানী বৈকালী সাজে সজ্জিত হইয়া খিড়কীর দরজা দিয়া প্রবেশ করিল। উঠানে আসিতেই চাতালের উপর উভয়কে দেখিতে পাইয়া বলিল:

শিবানী: জেঠাইমা, চন্দরদা আজ রাত্তিরে আমাদের বাড়ীতে খাবেন। মা আমাকে দিয়ে বলে পাঠালেন।

মহামায়া: বেশ, চন্দরকে বলব'খন। আসনখানা পেতে দাও ত কামিনী, শিবানী বসবে।

শিবানী : না জেঠাইমা, এখন আর বসব না—একবার চন্দরদাকেও বলে যাই—যে ভুলো মন। চন্দরদা কোথায় জেঠাই মা ?

মহামায়া : তার কি, আর কোন ঠাঁই আছে বাছা—বাইরের ঘরে বসে সুর ভাঁজছেন দেখগে।

শিবানী : তাই নাকি ! দেখি ত।

শিবানী কৌতূহলী হইয়া বাহিরের দিকের দরজা খুলিয়া চলিয়া গেল।

শ্যামলী : মাসীমা, চন্দরদা বোধ হয় বেরিয়েছেন। ও মেয়ে এখনি গিয়ে ওঁর যন্ত্রপাতি হয়ত ঘেঁটেঘুঁটে একসা করে দেবে—

মহামায়া : মিছে বলনি মা ! এ হয়েছে এক আপদ। তুমি মঙ্গলকে ডেকে বলে দাও ত বাইরের ঘরের দরজায় যেন চাবি দেয়।

শ্যামলী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আরসী ও চুল বাঁধিবার সরঞ্জামগুলি লইয়া দালানের দিকে গেল।

* *

*

সন্ধ্যা হইয়াছে। মঙ্গল এইমাত্র বাহিরের ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে। তাহার পরেই শিবানী চন্দ্রনাথকে ডাকিতে ডাকিতে বৈঠক-খানায় প্রবেশ করিল। কিন্তু কাহাকেও না দেখিয়া পায়ের স্যাণ্ডেল দুটি খুলিয়া ফরাসের উপর উঠিয়া বসিয়া আপন মনে বলিল :

শিবানী : ওমা—কেউ নেই। বাবা ! কত রকমের বাজনা দেখ ! একেই বলে—বাঁশবনে ডোম কানা !····

বলিয়াই পাখোয়াজটি বাজাইয়া তবলায় চাঁটি দিল। বেয়ালাটি পাড়িয়া ছড়ি লাগাইয়া জুত করিতে না পারিয়া অবজ্ঞায় ঠেলিয়া রাখিল। এবার লইল এস্রাজটি। তাহার তারে জোরে জোরে ছড়ি চালাইয়া ওস্তাদদের অনুকরণে ওস্তাদী গান একটা ধরিল। এই সময়

শ্যামলী আসিয়া কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া গণ্ডে আঙ্গুল দিয়া দাঁড়াইল। শিবানী জোরে জোরে এস্রাজে ছড়ি চালাইয়া তান ধরিয়া চলিয়াছে।

শ্যামলী : একি করছেন?

শিবানীর গ্রাহ্য নাই; আরও জোরে ছড়ি চালানোর সঙ্গে গান চলিল।

শ্যামলী : (হাসি চাপিয়া আরও জোরে) কি ছেলেমানুষী করছেন আপনি! থামুন। চন্দরদা এসব পছন্দ করেন না।

কিন্তু কে তাহার কথা শুনিবে! শিবানী একবার চাহিয়া ভ্রূভঙ্গি করিয়া এমন জোরে ছড়ি টানিল যে এসরাজের তার সশব্দে ছিঁড়িয়া গেল। ঠিক এই সময় চন্দ্রনাথও প্রবেশ করিল।

শ্যামলী : বাঁচলুম! এসে পড়েছ চন্দরদা? এখন তোমার ছাত্রীকে সামলাও,—আমাকে আমল দিলেন না!

কথাগুলি বলিয়াই শ্যামলী চলিয়া গেল। চন্দ্রনাথ এতই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছে যে, মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না—তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি শিবানীর মুখে। কিন্তু শিবানী তাহা গ্রাহ্য না করিয়া তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলিল:

শিবানী : এ! তোমার এসরাজের তারটা একবারে পলকা ছিল—ছড়ি চালাতেই ছিঁড়ে গেল।

চন্দ্রনাথ : তোমার এ দুর্মতি কেন হলো শুনি?

শিবানী : বা-রে! বাজনা ঘরে থাকলেই লোকে বাজায়; গলা থাকলেই যেমন গান গায়। গাইয়ে হয়ে তুমি যে উল্‌টো বললে চন্দরদা!

চন্দ্রনাথ : এখন তুমি দয়া করে ওখান থেকে উঠে সোজা পথ ধরে চলে যাও দেখি!

শিবানী : কি! তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ চন্দরদা! জানো, আমি তোমাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছি!

চন্দ্রনাথ : ও সৌভাগ্যে আমার কাজ নেই—ওঠ বলছি !

শিবানী : দাঁড়াও, তারটা আগে জুড়ে দিই।

চন্দ্রনাথ ফরাসে গিয়া শিবানীর হাত হইতে এসরাজটি কাড়িয়া লইয়া বলিল :

চন্দ্রনাথ : যাও। নৈলে এখনি আমি মঙ্গলকে ডেকে তোমাকে—

শিবানী : কি বললে ? দাঁড়াও ত, তার আগে—

হঠাৎ তবলা বাঁধিবার হাতুড়িটির উপর শিবানীর লক্ষ্য পড়িল এবং তাহা তুলিয়া লইয়া নিজের মাথায় হানিবার মত ভঙ্গিতে বলিল :

শিবানী : এই হাতুড়ি মাথায় মেরে আমি রক্তগঙ্গা হই—আর পুলিস এসে তোমার হাতে দড়ি দিক্—

চন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে বিহ্বল হইয়া পড়িল এবং ঔদ্ধত্য তাহার কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল ; তৎক্ষণাৎ চোখে মুখে মিনতি ফুটাইয়া সবিনয়ে বলিতে লাগিল :

চন্দ্রনাথ : থাম শিবানী, থাম—কর কি ! লক্ষ্মীটি ! আমি মাপ চাইছি—আমি—

ঠিক এই সময় শ্যামলী অতর্কিতভাবে আসিয়া পিছন হইতে সহসা শিবানীর হাত হইতে হাতুড়িটি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে অবাক করিয়া দিয়া কহিল :

শ্যামলী : চোখ বার করে দেখছেন কি ? চন্দরদা গাইয়ে মানুষ কিনা, তাই আপনার হাতে হাতুড়ি দেখে ভড়কে গেছলেন ; কিন্তু আমি ত গাইয়ে নই—সাধারণ একটা মেয়ে, তাই আপনাকে চিনেছিলাম !

শিবানী : দিন বলছি হাতুড়ি—

শ্যামলী : থাক, আর ভয় দেখিয়ে কাজ নেই। নিজের হাতে নির্জের

মাথায় হাতুড়ি মারবার দুঃসাহস যে আপনার নেই—সে আমি জানি। এখন ভালয় ভালয় বাড়ী যান। নৈলে আমি পাড়াশুদ্ধ সবাইকে ডেকে বলব, এই নিরীহ গাইয়ে মানুষটির ঘরে আপনি ডাকাতি করতে এসেছিলেন!

শিবানী কি বলিবে, কি করিবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া রুদ্ধ রোষে ফুলিতে লাগিল। শ্যামলীর মুখে তদ্দৃষ্টে হাসি ফুটিয়া উঠিল এবং সেই তীক্ষ্ণ হাসিতে শিবানীর মুখখানা যেন ঝলসাইয়া দিয়া শ্লেষের সুরে সে বলিল: এখন বুঝলেন ত, আমার মনটি ছোট হোলেও শক্ত—ভাঙ্গে না। এবার আমার সেই ছড়াটি মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে বাড়ী যান দেখি ভালমানুষের মেয়ের মত।

সেদিন শ্যামলী যে ছড়াটি বলিয়াছিল, এখনকার কথাগুলি যেন শিবানীর চোখে আঙুল দিয়া তাহার অর্থ পরিষ্কার করিয়া দিল; তাহার মনের মধ্যে সেই ছড়াটির শব্দগুলি পুনরায় তুমুল বেগে ঝঙ্কার তুলিল:

বড়র সম্প্রীতি বালির বাঁধ,
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ!

* *
*

ঈশ্বর বাকচির বাড়ীর কক্ষ। মনোরমা তিক্ত কণ্ঠে কন্যা শিবানীকে অনুযোগ করিতেছিলেন:

মনোরমা: নিজেই ছুটলি লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে। তার পর মিছি মিছি এমনি কাণ্ড বাধিয়ে এলি যে, নিজের মুখখানাই পুড়ে গেল।

শিবানী: আমি এর শোধ—তুলব, তুলব, তুলব।

তর্জনী তুলিয়া দৃঢ়স্বরে কথাগুলি বলিতে বলিতে শিবানী দুম দুম করিয়া পা ফেলিয়া চলিয়া গেল। পরক্ষণে ঈশ্বর বাকচি আস্তে আস্তে সন্তর্পণে প্রবেশ করিয়া বলিলেন :

ঈশ্বর : কি বলে ও ? পাড়ায় ত আর মুখ দেখানো যায় না। সবাই তোমার মেয়েকে দুষছে। এই মেয়ে নিয়ে শেষে এক-ঘরে না হতে হয় !

মনোরমা : এখন ভিটে বাড়ি সব বাঁধা দিয়ে—যেমন করে হোক মেয়েকে পার করবার উপায় দেখ।

* *
*

চন্দ্রনাথের বাড়ি। দ্বিতলের ঘর। শ্যামলী যথাস্থানে বসিয়া নিবিষ্ট মনে গানের স্বরলিপির চর্চা করিতেছিল। মঙ্গল পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শ্যামলীর এই নীরব সাধনা দেখিতে দেখিতে বলিল :

মঙ্গল : দাদা বাবু আসা ইস্তক তোমার যে আর গান সাধা হচ্ছেনা শ্যামলদি !

শ্যামলী : আমার জন্যে তুমি ভেবনা মঙ্গলদা ! আমার শিক্ষা যে এখন মনের পথে চলেছে। তুমিত দেখছো—

মঙ্গল : কিন্তু তোমার এ লুকুচুরি আমার যে আর বরদাস্ত হয় না দিদি ! আমি কিন্তু আর চুপ করে থাকবনা—বলব দাদাবাবুকে।

শ্যামলী : পাগল হয়েছ মঙ্গলদা, তুমি ত মহাভারত পড়েছ—একলব্যের গল্প ত জানো। তবে ? এযুগেও কি সে সাধনাকে সত্য করতে পারা যায় না ?

মঙ্গল : অবাক করলে দিদি! হ্যাঁ, তবে তুমি মনে করলে হয়ত পারবে শ্যামলদি।

* *
*

প্রাতঃকাল। বৈঠকখানার ফরাসে বসিয়া চন্দ্রনাথ একটি গান সাধিতেছিল। এই সময় শ্যামলী চা আনিল। চন্দ্রনাথের ভ্রূক্ষেপ নাই; আপন মনেই গান সাধিতেছে।

শ্যামলী : চা এনেছি চন্দরদা!

শ্যামলীকে দেখিয়া চন্দ্রনাথ গান বন্ধ করিয়া বলিল : ও!
সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়াইয়া পিয়ালাটি লইয়া আস্তে আস্তে চা পান করিতে লাগিল। শ্যামলী সহাস্যে সুধাইল :

শ্যামলী : আচ্ছা চন্দরদা, যে গান খানা এইমাত্র গাইছিলে, কার বাঁধা?

চন্দ্রনাথ : সে খোঁজে তোমার দরকার?

শ্যামলী : ও কথা বলতে নেই চন্দরদা! সেদিন একখানা বইএ পড়ছিলাম—শিশুদের মনে কোন কিছু জানবার আগ্রহ হলে, জানানো উচিত।

চন্দ্রনাথ : তুমি কি শিশু?

শ্যামলী : তুমি ত আমাকে তাই ভাবো।···বলবে না?

চন্দ্রনাথ : কেন, তুমি কি মার কাছে শোননি—এখানে স্কুলে যখন পড়ি, তখন থেকে আমি গান বাধতাম। যে গান আমি এইমাত্র গাইছিলাম, আমারই রচনা—আমি নিজের বাঁধা গানই বেশী গাই।

শ্যামলী : ও! তাহলে আজকাল যে 'আধুনিক' বলে গানের একটা নতুন চলন হয়েছে, তুমি বুঝি তার স্রষ্টা?

চন্দ্রনাথ : অনধিকার চর্চা ক'রনা বলছি শ্যামলী!

শ্যামলী মুখখানা আঁচলে চাপিয়া পলাইয়া গেল।

* *
*

রান্নাঘরের সেই চাতাল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মহামায়া দেবী আহ্নিক করিতে বসিয়াছেন। চন্দ্রনাথ বাহিরের দরজা দিয়া উঠানে আসিয়া বলিল :

চন্দ্রনাথ : আমাকে ডাকছিলে মা?

মহামায়া : হাঁ, একটা কথা বলব বাবা! শ্যামলী কামিনীর সঙ্গে আরতি দেখতে গেছে তাই ফুরসদ মিলেছে। তার সামনে ত বলতে পারি না।

চন্দ্রনাথ : কথাটা কি মা?

মহামায়া : শ্যামলীকে তুমি বড় হেনস্তা কর বাবা! এ কিন্তু ঠিক নয়।

চন্দ্রনাথ : আমি শ্যামলীকে হেনস্তা করি? সে বুঝি বলেছে?

মহামায়া : মহাভারত! সে মেয়েই শ্যামলী নয়—যে তোর নামে নালিশ করবে।

চন্দ্রনাথ। : তবে এ কথা ওঠে কেন?

মহামায়া : আমি যে দেখিছি চন্দর। তুই যখন গান গাইতে বসিস, ও যেন কি রকম হয়ে যায়—ওর মন বুঝি চলে যায় তোর গানের কাছে। কিন্তু ও কাছে গেলেই তুই অমনি মুখ ভার করিস্। আর, ও বেচারীও ফুলকোমুখী হয়ে—

চন্দ্রনাথ : কি হবে ওর আমার গান শুনে বলতে পার মা? ওর মাথা দিয়ে কি গাছ বেরুবে? যে সব কাজ নিয়ে ও আছে—

ওর পক্ষে সেই ভালো। আমার ইচ্ছা—মেয়েরা গানের যেন ত্রিসীমায় না যায়।

মহামায়াঃ তুই তাহলে শ্যামলীকে চিনিসনি চন্দর, আর আমার কথাও বুঝিসনি।

বলিয়াই মহামায়া দেবী আহ্নিকে মনোনিবেশ করিলেন; তাঁহার গম্ভীর মুখ দিয়া আর এ সম্পর্কে কোন কথাই তখন বাহির হইল না। চন্দ্রনাথ ভাবিয়া পাইল না যে, মায়ের মুখখানি হঠাৎ এভাবে বদলাইয়া গেল কেন? একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় সে বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল।

* *
*

খানিকটা রাত হইয়াছে। বৈঠকখানায় বিস্তীর্ণ ফরাসে বসিয়া চন্দ্রনাথ পদাবলীর একখানি গান সাধিতেছিল:

কাঞ্চনবরণী কে বট সে ধনী—ধীরে ধীরে চলি যায়।
হাসির ঠমকে চপলা চমকে—নীল সাড়ী শোভে গায়॥

এই দুটি ছত্র বার বার গাহিতেছিল চন্দ্রনাথ। ছাদে দাঁড়াইয়া শ্যামলীও এই গানখানি শুনিতেছিল।

সহসা মনে কি ভাবিয়া শ্যামলী ঘরে ঢুকিল; তারপর তাড়াতাড়ি পরণের কাপড়খানি ছাড়িয়া নীলবর্ণের শাড়ী একখানি পরিপাটি করিয়া পরিল এবং একটি রেকাবীতে আদা ও মিছরির কুঁচি লইয়া বাহিরের ঘরে পুনরায় আসিয়া রেকাবীটি চন্দ্রনাথের সামনে রাখিয়া বলিল:

শ্যামলী: মিছরি আর আদাকুঁচি এনেছি চন্দ্রদা।

চন্দ্রনাথ: বা! আমার প্রয়োজন সম্বন্ধে তুমি যেন সর্বদাই সচেতন।

শ্যামলী : কিন্তু বরাতগুণে শ্যামলীর সম্বন্ধেই তুমি সর্বদা অচেতন।

চন্দ্রনাথ : কি বললে ?

শ্যামলী : তুমি যে সেদিন বলছিলে চন্দ্রদা, নিজের বাঁধা গানই বেশী গাও, আর তাই ভালবাস। আজকের এ গান খানিও কি তোমার বাঁধা চন্দ্রদা ?

চন্দ্রনাথ : এই ! আবার অনধিকার চর্চা আরম্ভ করলে ?

শ্যামলী : তা বলে কিছু জিজ্ঞাসা করা অনধিকার চর্চা নয়। জবাব দাও চন্দ্রদা—এ গান তোমার কি না ?

চন্দ্রনাথ : তুমি যাও এখান থেকে।

শ্যামলী : বেশ চললাম।

চন্দ্রনাথ পুনরায় গান ধরিল এবং ঐ দুইটি চরণই গাহিতে লাগিল। পরক্ষণে শ্যামলী পদাবলীর পরের দুটি পদ আবৃত্তি করিতে করিতে প্রবেশ করিল :

শ্যামলী : চণ্ডীদাস কহে, ভেবনা ভেবনা ওহে শ্যামগুণমণি।
তুমি যে তাহার সরবস্ব ধন, তোমারি আছে সে ধনি ॥

পরক্ষণে সারা মুখখানি হাসিতে ভরাইয়া বলিল :

শ্যামলী : গান ত গাইতে শেখাওনি, তাই ছড়াতেই বললাম। এই জন্যেই বুঝি পদ দুটি একশোবার গাইছিলে চন্দরদা, পরের পদ দুটি গাইলে চুরি ধরা পড়ে যাবে বলে ?

চন্দ্রনাথ : থাক, আর ডেপোমি করতে হবে না—খুব হয়েছে। এখন যাও।

শ্যামলী : ধমকে আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবে না। বিদ্যে তোমার ধরা পড়ে গেছে। জানো, তুমি আমাকে গান শেখাবে না বলে যেমন কোট ধরে বসেছো, আমারও তেমনি জিদ হয়েছে,

যেখানে যত গান আছে "সব গুলে খেয়ে ফেলব,—পেটের ভিতরে তারা সা, রে, গা, মা ভাঁজতে থাকবে—বাইরে তার আওয়াজ আসবে না।

চন্দ্রনাথ : আমি আবার তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি শ্যামল, গান নিয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করতে এস না। ভগবান তোমাকে সৃষ্টি করেছেন—কোমরে কাপড় জড়িয়ে গোবর চটকে ঘুঁটে দেবার জন্যে, মাটি খুঁড়ে ফসল ফলাতে, ফিরিওলাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে—এ সব আমাদের সহ্য হবে। কিন্তু তোমার মুখে সা রে গা মা-র কথা শুনলে আমার আর ধৈর্য থাকে না।

শ্যামলী : তাহলে তোমার সম্বন্ধে আমার কথাটাও শুনে রাখ। আমি যদি মার ছেলে হতাম, তাহলে কুড়ুল চালাতাম, কোদাল পাড়তাম, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পয়সা উপায় করতাম। মায়ের দুঃখ যে না বোঝে, তার মুখে ওসব কথা খাটে না।

মুখখানা বেশ শক্ত করিয়া কথাগুলি দৃঢ় স্বরে শুনাইয়া দিয়াই শ্যামলী চলিয়া গেল। চন্দ্রনাথ সক্রোধে রুখিয়া উঠিল বটে, কিন্তু শ্রোতার অভাবে আপন মনেই বলিল :

চন্দ্রনাথ : কি, এত বড় কথা! আচ্ছা—চাকরীই করব।

তৎক্ষণাৎ খবরের কাগজ খানা বাহির করিয়া চিহ্নিত একটা বিজ্ঞাপনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল চন্দ্রনাথ। লেখা আছে—

অভিজ্ঞ সঙ্গীত শিক্ষক চাই

কলিকাতার এক ধনীর কন্যাকে সঙ্গীত
শিক্ষা দিবার জন্য কৃতী সঙ্গীতজ্ঞ চাই।

মাসিক বেতন তিন শত টাকা।

বক্স নম্বর ৫০৩। C/o বসুমতী।

কাগজ কলম লইয়া চন্দ্রনাথ দরখাস্ত লিখিতে বসিল।

* *

*

বাড়ীর অভ্যন্তরে সিঁড়ির পাশে ঠাকুর ঘর। গৃহ দেবতা—নারায়ণ শিলা সিংহাসনে দেখা যায়। দেওয়ালে দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি ছবি—নিচে মঙ্গল ঘট। মহামায়া দেবী আসনে বসিয়া আছেন। চন্দ্রনাথ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া মায়ের কথা শুনিতেছে। মহামায়া দেবী বলিতেছেন :

মহামায়া : গান গেয়ে গেয়ে তুই নিজের মনকেও হারিয়ে ফেলিছিস্ চন্দর—তাই শ্যামল তোর মনে ধরল না।

উপর হইতে সিঁড়ি দিয়া শ্যামলী এই সময় নামিয়া আসিতেছিল। নিজের নাম শুনিয়া বাহিরে থমকিয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রনাথ : এই কথা বলবার জন্যেই কি আমাকে ঠাকুর ঘরে ডেকে এনেছ মা?

মহামায়া : তুই কি জানিস না—ও তোকে কি ভালোই বাসে! আর আমার মনেও কত আশা ভাসছে—

চন্দ্রনাথ : সে আমি জানি মা! তোমরা এতটুতেই গলে যাও, আর কত কি মনে মনে গড়তে থাকো; কিন্তু একবার ভাবো না যে, সে আশা কোনদিন সত্যি হতে পারে কি না!

মহামায়া : মানলুম, মেয়ে মানুষ আমি—আমার মন শক্ত নয়—খুব দুর্বল। কিন্তু কর্তাদের সম্বন্ধেও কি এই কথা বলবি? তাঁরা যে—

চন্দ্রনাথ : সে কথা ত হয়ে গেছে মা। অনেক তর্কও করিছি তোমার সঙ্গে। আবার কেন সেই সব পুরোনো কথা তুলে আমাকে আঘাত দাও।

মহামায়া : তবে কি শ্যামলকে আমি—

চন্দ্রনাথ : সে জন্যে তুমি ভেবনা মা, শ্যামল যাতে সুখী হয় সে চেষ্টা আমাদের করতেই হবে! আমার একটা অবিবাহিত বোন থাকলে আমার যে কর্তব্য হোত, শ্যামলের সম্বন্ধে তাই আমাকে ভাবতে হবে। এই জন্যেই আমার চাকরী নেওয়া।

শ্যামলী স্তব্ধ হইয়া কথাগুলি শুনিল। তাহার পর দ্রুত পদে উপরে তাহাদের ঘরে গিয়া—তোরঙ্গটি খুলিয়া ফেলিল ক্ষিপ্রহস্তে। বাহির করিল তিন বন্ধুর প্রতিকৃতি ও প্রতিজ্ঞাপত্র। মনে মনে শ্যামলী পাঠ করিতে লাগিল ছত্রগুলি। পাঠান্তে ছবি ও লেখা মস্তকে ঠেকাইয়া পুনরায় খামে ভরিয়া যথাস্থানে সে রাখিয়া দিল।

* *

*

ঠাকুর ঘর হইতে বাহির হইয়া চন্দ্রনাথ উঠানে নামিয়াছে—ওদিকে শ্যামলীও তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া আসিয়া দরজার মুখে তাহাকে পিছন হইতে ডাকিয়া দাঁড় করাইল।

শ্যামলী : চন্দর দা!

চন্দ্রনাথ : কি বল?

শ্যামলী : সত্যই কি চাকরী করতে কলকাতায় যাবে?

চন্দ্রনাথ : শুনেছ যখন, এ প্রশ্ন কেন? বেকার হয়েছি বলে কি মিথ্যা-বাদীও হতে হবে?

শ্যামলী: সেদিনের কথায় আমার ওপরে রাগ করেছ চন্দ্র দা?

চন্দ্রনাথ: না। বরং পথের সন্ধান দেওয়ায় কৃতজ্ঞ আছি।

শ্যামলী: কি চাকরী—জানতে পারি কি?

চন্দ্রনাথ: একটি মেয়েকে গান শেখাতে হবে।

শ্যামলী: মেয়েকে গান শেখাবে?

চন্দ্রনাথ: হাঁ। তারা পারিশ্রমিক দেবে ৩০০৲ টাকা।

শ্যামলী: কিন্তু টাকার জন্য তোমার যে এত শীঘ্র মতের পরিবর্তন হবে, এ আমি ভাবতেও পারিনি।

চন্দ্রনাথ: আমিও ভাবতে পারিনি যে, এত শীঘ্রইআমাকে এমন নিদারুণ অভাবের মধ্যে পড়তে হবে। পেটের ভাবনা তুচ্ছ নয় শ্যামলী, তাই ব্যক্তিগত মতকে পরিত্যাগ করে নতুন পথকে অবলম্বন করতে চলেছি।

শ্যামলী: ছাত্রীটি কে?

চন্দ্রনাথ: এক ধনীর তুলালী, কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়। তাই দেখে দরখাস্ত করি; মঞ্জুর হয়েছে। শুধু তাই নয়—তাড়াতাড়ি যাবার জন্য একশো টাকা আসাম পাঠাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন।

শ্যামলী: আমি খালি ভাবছি চন্দর দা, মেয়েটার এ অনধিকার চর্চা কি করে সমর্থন করবে? কাঞ্চনমূল্যে? বিকার আসবে না?

চন্দ্রনাথ: বেকারের আবার বিকার!

শ্যামলীর কথাটার অর্থ উপলব্ধি না করিয়াই আত্মভোলা চন্দ্রনাথ উদাসভাবে এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল এবং ইহার পরআর কথা না বাড়াইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

বাহিরের ঘরে আসিয়া ফরাসের উপর বসিয়াই চন্দ্রনাথ তানপুরায় আলাপ আরম্ভ করিল। মঙ্গল পাশে দাঁড়াইয়া পাখার বাতাস করিতে করিতে সময় বুঝিয়া বলিল :

মঙ্গল : শ্যামলী দিদির সঙ্গে বুঝি কথা কাটাকাটি করে এলে দাদাবাবু?

চন্দ্রনাথ : একথা জিজ্ঞাসা করলে কেন ?

মঙ্গল : এসেই তানপুরী নিয়ে মুখখানা ভার করে বসতে দেখেই ধরেছি। শ্যামলী দি তোমাকে কথার খোঁচা দিলেই তুমিও যে তখুনি তানপুরী নিয়ে সুরের খোঁচা দাও গো।

চন্দ্রনাথ : তুমি ধরেছ ঠিক মঙ্গলদা! এই তানপুরার তারে ঘা পড়লেই ওর দেহের শিরাগুলোতেও যেন টঙ্কার দিতে থাকে। আচ্ছা তুমিই বল মঙ্গলদা, এ ছেলেমানুষী ওর কেন ?

মঙ্গল সহসা বাহিরের বাগিচার দিকের জানালাগুলি খুলিয়া দিতেই জ্যোৎস্নার আলোর সঙ্গে ফুলের সুবাস বাতাসে মিশিয়া ঘরখানি ভরাইয়া দিল। বৈঠক ঘরের ওপারে বাহিরে মালঞ্চ দেখাইয়া মঙ্গল বলিতে লাগিল :

মঙ্গল : কিন্তু ছেলেমানুষের এ কি কাণ্ড বল ত দাদাবাবু? এই জানলা দিয়ে চেয়ে দেখ দেখি—কি রকম মালঞ্চ বানিয়েছেন শ্যামলদি! আর, কি খাটুনিই না খেটেছেন এর জন্যে। বলতেন—চন্দরদা ঘরে বসে গান গাইবে, আর বাগান থেকে আমার মালঞ্চ ফুলের গন্ধ ছড়াবে।

চন্দ্রনাথ : এবার কলকাতায় যাবার সময় শ্যামলকে এই ঘর খানা ছেড়ে দিয়ে যাব—এইখানে বসে বসেই ও মালঞ্চ দেখবে। তবে দুঃখ এই—ওর মনের তারে ঝঙ্কার দেবার মত না বাজবে কোন

যন্ত্র, না উঠবে কোন কণ্ঠের তান। তখন ত আর চন্দরদা থাকবেনা—নিজের মনের সঙ্গেই ও তখন তর্ক ঝগড়া করবে।

* *
*

পরদিন অপরাহ্নে ঈশ্বর বাকচির বাহিরের ঘরে বসিয়া শিবানী হারমনিয়ম বাজাইয়া চন্দ্রনাথেরই রচিত একটি আধুনিক গান গাহিতেছিল। চন্দ্রনাথ বাহিরের রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে গানখানি শুনিয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। একটু পরে কি ভাবিয়া আস্তে আস্তে বাইরের ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া শিবানী বিস্ময়ে আনন্দে চেয়ার ছাড়িয়া সবেগে উঠিয়া পড়িল এবং চন্দ্রনাথের কাছে আসিয়া বলিল:

শিবানী: চন্দর দা! কি ভাগ্যি!

চন্দ্রনাথ: আমি শিগগীর কলকাতায় যাচ্ছি শিবানী—তাই যাবার আগে দেখা করতে এসেছিলাম। তোমার বাবা, মা, কোথায়?

শিবানী: তাঁরা এই মাত্র বেরুলেন যে। কুচবিহারের কালীবাড়ীতে কথকতা শুনতে গেলেন। আমি কিন্তু ভাবতে পারিনি চন্দ্রদা, সেদিনের সেই কাণ্ডেরপরও তুমি নিজেই এমন করে আসবে!

চন্দ্রনাথ: সে সব কথা ছেড়ে দাও—আমি ভুলে গেছি। কিন্তু এইমাত্র তুমি যে গান খানা গাইছিলে, ভুল হয়েছে। ভুল জেনে চুপ করে থাকা অন্যায়—আমি দেখিয়ে দিতে চাই।

শিবানী: একি চন্দ্রদা! তুমি কি নতুন মানুষ হলে?

চন্দ্রনাথ: ভুল মানুষেই করে শিবানী, আমিও তোমাদের উপেক্ষা করে ভুল করেছিলাম। ইচ্ছা করলে সত্যিই আমি তোমাদের

অনেক কিছু শিখাতে পারতাম। এখন যে-কদিন আছি, তোমাদের দুজনকেই গান শেখাবার একটা মোটামুটি প্রণালী দেখিয়ে দেব। এসো, এই গানটা নিয়েই আরম্ভ করা যাক।

চন্দ্রনাথ চৌকিতে বসিয়া হারমনিয়মটি টানিয়া লইয়া সুর দিয়া প্রথমে গানটির স্বরগ্রাম সাধিল—প্রথম শিক্ষার্থীকে যেভাবে শিক্ষা দিতে হয়, তাহার পর একটি চরণ নিজে সুর দিয়া গাহিতেই শিবানীও তাহাকে অনুসরণ করিল।

* *

*

তখন রাত্রি হইয়াছে। বাহিরের ঘরে ফরাসে বসিয়া চন্দ্রনাথ সেই গান খানিই আবার গাহিতেছিল। খানিকপরে শ্যামলী দ্রুতপদে প্রবেশ করিল—তাহার ময়দা-মাখা হাত দুইখানি দেখিয়া বুঝা গেল যে, পুরির জন্য ময়দা মাখিতে ছিল—সেই অবস্থায় এখানে আসিয়াছে।

শ্যামলী: কি ব্যাপার চন্দরদা—তোমার গানের আসরে আমাকে এমন করে জরুরী তলপের হেতু? এযে একবারে অভাবনীয় ব্যাপার।

চন্দ্রনাথ: তাই বুঝি এই হালে আসতে হয়?

শ্যামলী: কি করি বল? তলব হলো—এখুনি আসতে বলো! সবেমাত্র ময়দায় জল দিয়ে মাখামাখি করেছি—ডাকের তাড়া দেখে সেই অবস্থাতেই ছুটে আসতে হলো। কি খবর শুনি?

চন্দ্রনাথ: আমারই একটা অন্যায় শোধরাবার জন্যে তোমাকে ডেকেছিলাম।

শ্যামলী: তোমার অন্যায়?

চন্দ্রনাথ: হ্যা। ভেবে দেখলাম, তোমার কথাই ঠিক।

শ্যামলী : আমার কথাই ঠিক? কোন্ কথাটা—তা খুলে না বললে ত বুঝতে পারছিনা।

চন্দ্রনাথ : এই যে, তোমরা অর্থাৎ মেয়েরা গান বাজনা শেখো—এটা আমি পছন্দ করিনে, এ কথা তোমাকে অনেকবার বলেছি; সেই জন্যেই তোমাদের গান শেখাতে সম্মত হইনি—অথচ বৃত্তির দিক দিয়ে যার শিক্ষাভার নিতে চলেছি, সেও একটি মেয়ে। কাজেই কলকাতায় যাবার আগে আমার এই অন্যায়টা কাটিয়ে যেতে চাই।

শ্যামলী : এ যে বৈরাগ্যের ব্যাপার দেখছি! আরো একটু খুলে বল চন্দ্রর দা!

চন্দ্রনাথ : শিবানীর কাছে গিয়েছিলাম। এই গানখানাই যাচ্ছেতাই করে গাইছিল সে; শিখিয়ে দিয়ে এলাম।

শ্যামলী : আক্কেল সেলামী দিয়ে এসেছ তাহলে?

চন্দ্রনাথ : এবার তোমার পালা। হাত ধুয়ে শিগগীর বসে যাও—

শ্যামলী : কিন্তু হাত ধুয়ে এখন গান শিখতে বসলে, ওদিকে যে ডান হাতের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে চন্দর দা!

চন্দ্রনাথ : আশ্চর্য! তোমার শিক্ষার সে আগ্রহ গেল কোথায়?

শ্যামলী : আগ্রহ এখন গলগ্রহ হয়েছে—নিগ্রহের চাপে।

চন্দ্রনাথ : কথাটা বুঝলাম না তো?

শ্যামলী : আমার কোন্ কথাই বা তুমি সহজে বোঝ! বলেছিলাম না, আমি যা ধরি, তাই করি। তুমি এখন দয়া করে, আর দায়ে পড়ে, গান শেখাবে শুনে, শিবানী বর্তে যেতে পারে, কিন্তু আমি তো ও ধাতের মেয়ে নই চন্দরদা! তোমার কাছে বসে শেখা আমার বরাতে নেই—আমার সেই এক কথা! বরং

এক কাজ করো তুমি—যে ক'দিন আছো, শিবানীকেই শেখাও, আর—আমাকে শুধু তোমার গান শুনিও; তাহলেই আমার শেখা হবে। আচ্ছা, এখন যাই চন্দর দা—উনুন ওদিকে জ্বলে গেল।

স্তব্ধভাবে চাহিয়া থাকিয়া শ্যামলীর মুখের এই তেজোদৃপ্ত কথাগুলি শুনিয়া গেল চন্দ্রনাথ। প্রতিবাদ করিবার মত কোন কথা তাহার মুখে যোগাইল না। শ্যামলী চলিয়া গেলে, তাহার মুখ দিয়া অস্ফুটস্বরে দুটি মাত্র কথা বাহির হইল: আশ্চর্য মেয়ে!

* *
*

ঈশ্বর বাকচির বাড়ীর বাহিরের ঘরে—সেদিন সকালে শিবানী চন্দ্রনাথের নির্দেশ মত স্বরগ্রাম সাধিতেছিল। এমন সময় চন্দ্রনাথ প্রবেশ করিয়া বলিল:

চন্দ্রনাথ: হ্যাঁ—ভোরে উঠে একটি ঘণ্টা ধরে এমনি করে গলা সাধবে। তারপর যেমন লিখে দিয়েছি—পড়ে পড়ে চেষ্টা করবে।

শিবানী: তুমি নাকি আজ কলকাতায় যাচ্ছ চন্দরদা? তোমার টাকা এসেছে শুনলাম।

চন্দ্রনাথ: হ্যাঁ—ওঁরা একশ টাকা আগাম পাঠিয়েছেন, তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে।

শিবানী: শ্যামলী আর গান শিখলে না চন্দর দা?

চন্দ্রনাথ: তার সে আগ্রহ আর নেই—কিছুতেই শিখতে চাইলে না। হাঁ, ভালকথা—তুমি এই দশটি টাকা রাখ শিবানী।

শিবানী: কেন চন্দ্রদা?

চন্দ্রনাথ : তুমি আমার প্রথম ছাত্রী ; তাই, আমার প্রথম উপার্জনের এই আশীর্বাদ !

শিবানী নোটখানি লইয়া হেঁট হইয়া চন্দ্রনাথকে গড় করিল।

* *

*

জামা কাপড় পরিয়া চন্দ্রনাথ বাহিরের ঘরে প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছে। তাহার ঘরের বাদ্য যন্ত্রগুলি প্যাক করা হইয়াছে। ঘরের একদিকে দুটি সুটকেশ ও বেডিং রহিয়াছে। মঙ্গল এই সময় ফরসা কাপড় ও হাতকাটা জামা পরিয়া একটা টিফিন কেরিয়ার লইয়া প্রবেশ করিল।

চন্দ্রনাথ : সব বুঝে সুঝে নিয়েছ ত ?

মঙ্গল : হ্যাঁ দাদাবাবু, শ্যামলদি—সব বুঝিয়ে দিয়েছে।

ফরাসের উপর রাখা ঘেরাটোপ দেওয়া তানপুরাটি দেখাইয়া মঙ্গল বলিল : ঐ তানপুরি ত বাঁধা হলো না ?

চন্দ্রনাথ : তানপুরীকে বাধা যায় না—হাতে করেই নিতে হয়।

এই সময় শ্যামলী প্রবেশ করিল। তাহার চক্ষু দুটি ছল ছল করিতেছে।

চন্দ্রনাথ : এস শ্যামল। আমার এই ঘরখানা তোমাকে ছেড়ে দিয়ে গেলাম।

শ্যামলী : এর শোভার সামগ্রীগুলি হরণ করে ?

চন্দ্রনাথ। রেখে গেলেই বা তোমার কি লাভ হোত বল—তুমি যখন গানের মোহ ত্যাগই করেছ। বরং এই ফরাসে বসে তোমার নিজের সৃষ্টি মালঞ্চের শোভা দেখে সন্তুষ্ট হয়ো।

শ্যামলী : এমনভাবে সব বেঁধে সেধে নিয়ে চলেছ চন্দ্রদা, যেন

কলকাতাতেই স্থায়ীভাবে বাস করবে। সে যাই হোক—
আমাকে কিছু দিয়ে যাবে না?

চন্দ্রনাথ: নিশ্চয়।—এই নাও। তোমার জন্তেই রেখেছিলাম।

বলিতে বলিতে চন্দ্রনাথ ব্যাগ বাহির করিয়া তাহার ভিতর হইতে দশ টাকার একখানি নোট লইয়া শ্যামলীর হাতে গুঁজিয়া দিল। শ্যামলী নোটখানা তৎক্ষণাৎ চন্দ্রনাথকে ফিরাইয়া দিয়া বলিল:

শ্যামলী: নতুন চাকরী পেয়ে বুদ্ধিশুদ্ধিও কি হারিয়ে ফেলছ চন্দরদা! এই তোমার দেওয়া?

চন্দ্রনাথ: জানো ত, একশো টাকা ওঁরা পাঠিয়েছিলেন; মাকে দিয়েছি ত্রিশ, শিবানীকে দিয়েছি দশ, তোমার দশ—বাকি পঞ্চাশ সম্বল করে চলেছি। মাইনে পেলেই তোমাকে—

শ্যামলী: থামো। টাকা ছাড়া দুনিয়ায় কি আর কিছু দেবার জিনিস নেই? আমি কি তোমার কাছে টাকাই চেয়েছিলাম চন্দরদা!

চন্দ্রনাথ স্তব্ধভাবে শ্যামলীর মুখের পানে চাহিয়া তাহার কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শ্যামলী তাহা উপলব্ধি করিয়া পুনরায় বলিল:

শ্যামলী: গানের জন্তে তোমার এত সব যন্ত্রপাতি—ও থেকেই একটা কিছু দিতে পারলে না?

চন্দ্রনাথ: যন্ত্রপাতি নিয়ে তুমি কি করবে বল—গানের যখন হাতেখড়িই তোমার হয়নি? আর—এখন শেখবারও ইচ্ছা নেই?

শ্যামলী: নাই বা আমার কাজে লাগল—একটা ভাল যন্ত্র কিছু বাড়ীতে না হয় রেখেই গেলে? সঙ্গীতবিদের বাড়ী বলে পরিচয়

দেবার মত সঙ্গীতের কোন জিনিসও একটা থাকতে নেই বাড়ীতে বলতে চাও?

চন্দ্রনাথ: শুধু রেখে নয়, তোমাকে দিয়েই যাচ্ছি শ্যামলী। আমার এই তানপুরাটি তুমি নাও। যদিও তুমি আমার ছাত্রী নও, কিছুই শেখনি, আমি তোমার গুরু নই, তবুও স্নেহের পাত্রী বলেই তোমাকে এটি উপহার দিলাম শ্যামলী।

ঘেরাটোপ সহ বৃহৎ তানপুরাটি চন্দ্রনাথ নিজেই সযত্নে তুলিয়া শ্যামলীর হাতে দিল। শ্যামলী শ্রদ্ধাসহকারে জানু পাতিয়া দুই হাত বাড়াইয়া সেটি লইয়া বলিল:

শ্যামলী: অন্তর্যামীর মতই তুমি আমার মনের প্রার্থনা বুঝে আসল জিনিসটিই দিয়েছ চন্দ্রদা! তোমার এই দান আমি মাথা পেতে নিচ্ছি।

চন্দ্রনাথ: আমিও কিন্তু তোমার কথাগুলি শুনে আশ্চর্য হচ্ছি!

শ্যামলী: কেন বল তো?

চন্দ্রনাথ: এর পিছনে যেন একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। মনের মধ্যে কি তাহলে সঙ্গীত সাধনার সঙ্কল্পটিকে আবার জাগ্রত করবার বাসনা আছে?

শ্যামলী: সঙ্গীত কি অমনি সাধলেই আসে চন্দ্রদা? তুমি ত সঙ্গীতের মস্ত সাধক ও শিক্ষক—বল না? এতদিন কাছে থেকে গানের বর্ণপরিচয়টাই বড় করিয়েছিলে—এখন বলছ এই কথা? লজ্জা করে না?

চন্দ্রনাথ: না, না, আমারই ভুল হয়েছে—আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, তুমি শিবানী নও। দুদিনের শিক্ষা পাবার লোভে আনন্দে মেতে ওঠা তার পক্ষেই সম্ভব; কিন্তু তোমার প্রকৃতি ত তা

নয়। যাই হোক, যদি সত্যিই দিন ফিরে আসে—এর প্রায়শ্চিত্ত আমি করবই।

শ্যামলী : না, না, তুমি ও কথা বোল না চন্দ্রদা—তোমার ওপরে আমার কোন নালিশই নেই।

চন্দ্রনাথ : কিন্তু মামলা না তুলেও তুমিই জিতে গেলে শ্যামলী! এখন তাহলে আমাকেই খেসারত দিতে হয়—যখন তোমার জিৎ হয়েছে।

শ্যামলী : তোমার যা দেবার সে ত আমি পেয়ে গেছি।

চন্দ্রনাথ : কিন্তু মনে হচ্ছে—আরো কিছু দেবার আছে। শোননি, দীক্ষার সঙ্গে মন্ত্র দিতে হয় কানে কানে। কিন্তু তুমি দীক্ষিত না হলেও সিদ্ধ যন্ত্রটি যখন দীক্ষার মতই পেয়েছ, তখন ওর উপযুক্ত কিছু মন্ত্রও তো চাই। তাও আছে আমার কাছে—তোমাকেই দিচ্ছি—এই নাও।

চন্দ্রনাথ ব্যাগ খুলিয়া একটি বদ্ধ লেফাফা বাহির করিয়া শ্যামলীকে দিল। শ্যামলী সেটি হাতে করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল দেখিল; পরক্ষণে সে দৃষ্টি চন্দ্রনাথের মুখে নিবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল :

শ্যামলী : এটি কি? এর মধ্যে কি আছে?

চন্দ্রনাথ : একটি গান। বিখ্যাত, অপূর্ব এবং ঐতিহাসিকও বটে।

শ্যামলী : তোমার বাঁধা?

চন্দ্রনাথ : না, না। কোন আধুনিক কবি বা গায়কের ক্ষমতাতীত এই গান বাঁধা। গানটি আমার গোয়ালিয়রের গুরুদেবের রচনা। তাঁর নাম হচ্ছে—রামময় ভট্টাচার্য।

চন্দ্রনাথের মুখে নামটি শুনিবামাত্র শ্যামলী পরম শ্রদ্ধায় তাঁহার

উদ্দেশে করজোড়ে প্রণাম জানাইল—তাহাতে আশ্চর্য হইয়াই যেন চন্দ্রনাথও মনে মনে প্রণাম করিল।

শ্যামলী : কিন্তু এই দুর্লভ এবং পবিত্র বস্তু আমাকে দিচ্ছ কেন?

চন্দ্রনাথ : এ গানের এক ইতিহাস আছে। দেবাদিষ্ট হয়ে গুরুদেব নাকি গান খানি বাঁধেন, আর স্বপ্নেই তার সুরও জানতে পারেন। কিন্তু গান রচনা করে সুর দিবার পর গাইতে গিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেলেন—স্বপ্নে শোনা কণ্ঠের সঙ্গে তাঁর সিদ্ধ কণ্ঠের স্বর মিলল না। এর পর তাঁর ছাত্র ছাত্রী বন্ধু প্রভৃতি প্রায় একশোর কাছাকাছি গায়ক গায়িকা তাঁদের নিজের নিজের গলায় এ গান গেয়েও গুরুদেবের মনোরঞ্জন করতে পারেননি—আমিও না। তাই আমাদের প্রতি গুরুর নিষেধ আছে—আমরা কেউই এ গান কোথাও গাইব না। কাজেই নিষিদ্ধ ফলের মতই গানটি আমার কাছে ছিল।

শ্যামলী : আর এখন আমার মত আনাড়ীকে ধোঁকা দেবার জন্যে 'উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ' করলে—এই ত?

চন্দ্রনাথ : গান ধরবার যন্ত্র যখন বাগিয়েছ—উড়ো খৈ গুলো ধরতেও ত পারো।

শ্যামলীর দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। গাঢ় স্বরে সে বলিল :

শ্যামলী : তোমার দেওয়া যন্ত্রের সঙ্গে এই মন্ত্রও তাহলে আমি নিলাম চন্দ্রদা!

বলিলাই সেই বদ্ধ লেফাফটি শ্যামলী নিজের ললাটে ঠেকাইয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিল।

দ্বিতীয় পর্ব্ব

কলিকাতা হিন্দু বোর্ডিংএর মধ্যে দ্বিতলে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ। চন্দ্রনাথ মঙ্গলকে লইয়া এখানে উঠিয়াছে। সঙ্গের লট বহর মঙ্গল গুছাইয়া রাখিতেছে। চন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই প্রসাধন সারিয়া বেশ পরিবর্তন করিয়া লইয়াছে বাহির হইবার উদ্দেশ্যে।

চন্দ্রনাথ : বাসা একটা না পাওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে মঙ্গল দা!

মঙ্গল : তুমি বাপু, বাড়ীতে আগে চিঠি লিখে দাও।

চন্দ্রনাথ : সে হ'চ্ছে। তুমি ততক্ষণ এগুলো সব গুছিয়ে গাছিয়ে ফেল— আমি একবার ওঁদের সঙ্গে দেখা করে আসি।

মঙ্গল : ও! যেনাদের বাড়ীতে তোমাকে ম্যাস্টরী করতে হবেক তো? তা—যাও, মোলাকাত করে জলদি জলদি ফিরে এসো। আর দেখ, ওনাদেরই কওনা কেন—মোকাম একটা বন্দোবস্ত করে দিক।

চন্দ্রনাথ : বা! এ যুক্তি ভালো—ওঁদেরই বলবো।

বলিয়াই চন্দ্রনাথ বাহির হইয়া গেল।

* *
*

ভাদুড়ী ভিলা। আধুনিক ফ্যাসানের বাহারী লনযুক্ত একখানা বাড়ী। ফটকে গুর্খা প্রহরী। ফটকের ভিতরে গাড়ী ঢুকিলে গাড়ী-বারাণ্ডার তলা দিয়া একটি কৃত্রিম পরিওয়ালা ফোয়ারার বেষ্টনী ঘুরিয়া

ফটকে ফিরিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। লাল কঙ্করময় পথ। পথের দুই পাশে বাহারী ক্রোটন গাছ ও মরশুমী ফুল গাছের সারি।

গাড়ী বারাণ্ডার পরেই ভিতরে যাইবার সোপানের মত দীর্ঘ চাতাল কার্পেটমণ্ডিত। সেটি পার হইয়া একটি অলিন্দের মত স্থান। তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি সুপ্রশস্ত ঘর। একটি পাঠাগার। অপরটির সাজ সজ্জা ও আসবাব পত্র দেখিলে মনে হয় এই ঘরখানি সঙ্গীতাগার না হইয়া পারে না। চারিদিকে দেশীয় ও বিদেশীয় ন্যনাপ্রকার দুর্লভ বাদ্যযন্ত্র। একদিকে অপরূপ ফরাস—মখমলের আস্তরণমণ্ডিত, কারুকার্যখচিত আস্তরণাবৃত কতকগুলি তাকিয়া, রূপার পিকদানী ;...একটু দূরে একটি সুদৃশ্য গোল টেবিল, তাহার দুই দিকে গদী আঁটা কেদারা।....অন্যদিকে নাচের ফরাস। সেখানে নৃত্যশীলা ললনাদের নানারূপ তৈলচিত্র বিসারিত।...একধারে পাশাপাশি দুইখানি আরাম কেদারা। এখানে বসিলেই একটি সুদৃশ্য সোপানশ্রেণীর অনেকখানি অংশ দেখা যায়। এই বৃহৎ বৈচিত্রময় কক্ষের একটি বিশিষ্ট অংশ দিয়া এই অবরোহিকা উপরতলায় গিয়াছে। ইহার দুই পার্শ্বে দুইটি মর্মরমূর্তি—প্রত্যেকটি নারীর নৃত্যভঙ্গির আদর্শে উৎকীর্ণ। পিতলের ভাসে সুরক্ষিত বিলাতী বাহারী গাছ।

এই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলেই অলিন্দের মত যে স্থানটি দেখা যায়, তাহাও কার্পেটমণ্ডিত এবং সুসজ্জিত। বাঘের মুখ, হরিণের শৃঙ্গ, সরিসৃপের চর্ম, ভাস, ধাতুমূর্তি প্রভৃতির সমন্বয়ে সাজানো। গৃহস্বামী ডাঃ ভাদুড়ী একখানি বিশেষ ধরণের আরাম কেদারা আশ্রয় করিয়া অধিকাংশ সময় এইখানেই থাকেন—মুখে পাইপ এবং হাতে দর্শনের বই। ইনি পঙ্গু, উত্থানশক্তিরহিত—বাম অঙ্গ একেবারে পড়িয়া গিয়াছে। নিজের উঠিবার সামর্থ নাই। এইখানে বসিয়াই কন্যা ইন্দ্রাণীর সঙ্গে আলাপ করেন—সে আলাপ যেন বন্ধুর মত। অভ্যাগতেরা আসিলেও

এখানে বসেন। তবে সপ্তাহে প্রতি শনিবার গানের জলসা—পার্শ্বের সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; ইনি পরদাটি তুলিয়া দিয়া তাহা উপভোগ করেন। নিচের ঘরের ড্রয়িং রুমটির মত উপরের ঘরের ড্রয়িংরুমটিও একইভাবে সুসজ্জিত।

সেদিন চন্দ্রনাথ যখন হিন্দু বোর্ডিং হইতে বাহির হয় এই বাড়ীতে আসিবার উদ্দেশ্যে—সেই সময় বাড়ীর এই বিশিষ্ট স্থানটিতে বিশেষ ধরণের আরাম কেদারায় শায়িত অবস্থায় ডাঃ ভাদুড়ী কন্যা ইন্দ্রাণীর সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন চন্দ্রনাথের সম্বন্ধেই। বিচিত্র রূপ এই মেয়েটির! কাঠিন্য ও পরিহাসপ্রিয়তা, দৃঢ়তা এবং সরসতার সমাবেশে তাহার দেহশ্রী ও অঙ্গ-ভঙ্গি অপরূপ শোভার সঞ্চার করিয়া থাকে। সর্বক্ষণই তাহাকে রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীদের মত সজ্জিত হইয়া থাকিতে দেখা যায়। মূল্যবান বসনভূষণ তাহার অঙ্গের অত্যুজ্জ্বল গৌর বর্ণের সঙ্গে মিশিয়া ঝলমল করিতে থাকে।

ডাঃ ভাদুড়ীর বয়ঃক্রম প্রায় ৭০ বৎসর। ইন্দ্রাণী তাঁহার এক মাত্র সন্তান। পরিণত বয়সে তিনি এই কন্যারত্ন লাভ করেন এবং ইন্দ্রাণীর বয়স যখন দশ বৎসর, সেই সময় বিপত্নীক হইয়া পিতা ও মাতার স্নেহে তাহাকে পালন করিয়া আসিতেছেন। বর্তমানে কন্যার বয়স বাইশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। উপরের ড্রয়িং রুমটির দুই পার্শ্বে দুই খানি ঘরে পিতা পুত্রী রাত্রিবাস করিয়া থাকেন। নিচের তলায় ভিতরের দিকে গৃহস্বামীর সেরেস্তা বা আফিস-ঘর ইঁহাদের প্রতিষ্ঠার পরিচয় দেয়। সেখানে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের অধীনে বাজার সরকার, মুহুরী প্রভৃতি চার পাঁচ জন কর্মচারী ডাঃ ভাদুড়ীর জমিদারী এবং কলিকাতার বাড়িগুলির সম্পর্কে কর্মনিযুক্ত। স্বতন্ত্র একটি অংশে

পাকশালা ; তাহার ভার বাবুর্চিদের হাতে ন্যস্ত। পুরাতন গৃহভৃত্য নীলু বিশ্বাস বাড়ীর প্রধান খানসামা।

সেদিন সঙ্গীত সাধনার পর ইন্দ্রাণী উপরে আসিয়া পিতার কাছে বসিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন :

ডাঃ ভাদুড়ী : তোমার মাস্টারের আজই আসবার কথা না বেবি ?

ইন্দ্রাণী : হ্যাঁ বাপি, চিঠিতে তাইত জানিয়েছিলেন !

ডাঃ ভাদুড়ী : অতগুলো দরখাস্তের ভিতর থেকে এই লোকটাকেই ফিটেস্ট মনে করা গেছে—

ইন্দ্রাণী : আসলে ওঁর লাহিড়ী পদবীটার জন্যেই উনি ফিটেস্ট হয়েছেন ! কিন্তু তুমি ত জানো বাপি, বিয়ে আমি কাউকেই করব না—তা সে রাঢ়ীই হোক, বারেন্দ্রই হোক, আর যত বড় ফিটেস্ট বলেই তোমার সার্টিফিকেট পাক। গানের সঙ্গে আমার বিয়ে আগেই হয়ে গেছে।

ডাঃ ভাদুড়ী : এ সব কথা ত হয়ে গেছে বেবী, আবার কেন তুলছ ! তবে কি জানো—নিজের শ্রেণীর দিকে মোহ বা আকর্ষণ স্বাভাবিক।

হঠাৎ গবাক্ষপথে বাহিরের দিকে তাকাইয়া ইন্দ্রাণী বলিল :

ইন্দ্রাণী : বোধ হয় তিনিই এলেন বাপী। এখন শ্রেণীবিচারটা বন্ধ রাখতে পার।

কথাটি বলিতে বলিতে ইন্দ্রাণী বাহির হইয়া গেল।

* *

*

একখানি রিক্সা ফটক দিয়া ঢুকিয়া গাড়ীবারান্দার নিচে আসিয়া

থামিল। চন্দ্রনাথ রিক্সা হইতে নামিতেই নীলু নামক প্রৌঢ় ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল:

নীলু: কাকে চান বাবু?

চন্দ্রনাথ: ভিতরে খবর দাও—কাশী থেকে চন্দ্রনাথ লাহিড়ী এসেছেন।

দেওয়ালের একধারে একগোছা স্লিপ ঝুলিতেছিল—তাহা হইতে একখানি স্লিপ লইয়া নীলু বলিল:

নীলু: তাহলে আপনার নাম লিখে দিন বাবু!

এই সময় ভিতর হইতে ইন্দ্রাণী আসিয়া বলিল:

ইন্দ্রাণী: আর নাম লিখতে হবে না—আসুন। বুঝতে পেরেছি। নীলু, ভাড়া দিয়ে রিক্সাওয়ালাকে বিদেয় করে দাও। বাড়ীর মোটরে ওঁকে পৌঁছে দেওয়া হবে।

ইন্দ্রাণী স্তব্ধ চন্দ্রনাথকে পথ দেখাইয়া ভিতরে লইয়া গেল।

* *

*

অলিন্দে সেই বিশেষ স্থানে বিশেষ ধরণের আরামকেদারায় ডাঃ ভাদুড়ী শায়িত অবস্থায় ছিলেন। ইন্দ্রাণী চন্দ্রনাথকে লইয়া প্রবেশ করিল।

ডাঃ ভাদুড়ী: এসো—এসো; তুমি শিবনাথ লাহিড়ীর ছেলে? আরে, তিনি ত ইউ. পি-র তানসেন ছিলেন। বেনারস স্টেটের মহারাজাও তাঁকে খাতির করতেন।

চন্দ্রনাথ: আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজার সভাতেও বাবা সঙ্গীতাচার্য ছিলেন।

ডাঃ ভাদুড়ী: হ্যাঁগো, তোমার বাবা ছিলেন গানের ডাক্তার, আর আমার ডাক্তারী দর্শনে।

ইন্দ্রাণী : তার ওপর তিনিও লাহিড়ী, তুমিও ভাদুড়ী—মিলের দিক দিয়ে সোনায় সোহাগা হয়েছিল! কিন্তু এসব কথা ত আমাকে কিছুই বলনি বাপি! ভাগ্যিস, মাস্টার মশাইকে পাওয়া গেল, তাই এমন একটা পুরাতত্ত্বের আবিষ্কার হলো।

ডাঃ ভাদুড়ী : বলবার ফুরসৎ হয়ত পাইনি—দেহের ওপর দিয়ে কত বড় ঝনঝাট গেছে জানো ত! দিবারাত্রি একই ভাবে এই চৌকির ওপর দেহটাকে রেখে পড়ে থাকি—একটা দিক একবারে অসাড়!

চন্দ্রনাথ : তাই নাকি—য়ঁ্যা!

ইন্দ্রাণী : বাপিকে দেখে কিছু বুঝতে পারবেন না—তিন বছর ধরে এইভাবে আছেন। বাম অঙ্গটা একেবারে পড়ে গেছে!

বলিয়াই ইন্দ্রাণী ম্লানমুখে জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিল।

ডাঃ ভাদুড়ী : ইন্দ্রাণীর সঙ্গীতই এখন আমাকে সান্ত্বনা দেয় মাস্টার! আর—ওরই সাধনার দিক দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা ও আদায় করে নিয়েছে আমার কাছ থেকে। রিয়েলী, সঙ্গীত ছাড়া ওরও আর কিছুই কামনা নেই। এই কলকাতা সহরে হেন ওস্তাদ কেউই নেই যিনি ইন্দ্রাণীকে জানেন না, এবং যার কাছে ও দুচার মাসও অন্তত শিক্ষা না নিয়েছে। কিন্তু তবুও মায়ের শিক্ষার সাধ মেটেনি, আরও শিক্ষা ও চায়। সেই জন্যেই তোমাকে আনা।

ইন্দ্রাণী : বাপি, মাস্টার মশাইকে তাহলে আমায় গানের ঘরে নিয়ে যাই?

ডাঃ ভাদুড়ী : ভালোই ত, আজ থেকেই শিক্ষা আরম্ভ হোক—শুভস্য শীঘ্রম্!

* *

*

নিচের তলার সেই সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমটিই ইন্দ্রাণীর সঙ্গীতাগার। সোফা ফরাস টেবিল ও নানারকম বাদ্যযন্ত্রাদির দ্বারা ঘরখানি সুসজ্জিত। একদিক দিয়া উপরে যাইবার কার্পেট মোড়া সিঁড়ি। ইন্দ্রাণী ও চন্দ্রনাথ মুখোমুখী উপবিষ্ট। চন্দ্রনাথকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ইন্দ্রাণী ইচ্ছা করিয়াই তানপুরা বেসুরা করিয়া বাঁধিয়া বাজাইতেই চন্দ্রনাথ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল :

চন্দ্রনাথ : সুর বাঁধা বোধ হয় ঠিক হয়নি—

ইন্দ্রাণী : কেন ?

চন্দ্রনাথ : সুর ঠিক মিলছে না!

ইন্দ্রাণী : তাই নাকি ? কিন্তু কি ভুল হলো বুঝলাম না তো ?

চন্দ্রনাথ : (মৃদু হাসিয়া) বুঝতে পারলে ভুলই বা করবে কেন ?—দাও।

ইন্দ্রাণীর হাত হইতে তানপুরা লইয়া চন্দ্রনাথ সুর বাঁধিয়া দিল—আড়চোখে ইন্দ্রাণী দেখিতে লাগিল। সুর বাঁধা হইলে তানপুরা পুনরায় ইন্দ্রাণীকে ফিরাইয়া দিল।

ইন্দ্রাণী : (চোখে মুখে দুষ্টামির হাসি ফুটাইয়া) কি হয়েছিল বলুন ত ?

ইন্দ্রাণীর দুষ্টামীভরা মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া সহসা গম্ভীর মুখে চন্দ্রনাথ বলিল :

চন্দ্রনাথ : খরজের সুর মিলছিল না। এখন দেখ দেখি—আওয়াজ ঠিক হলো কিনা!

ইন্দ্রাণী বাজাইয়া দেখিল—সুর ঠিক মিলিয়াছে। সে নীরবে চন্দ্রনাথের মুখের দিকে একটিবার তাকাইয়া দৃষ্টি নত করিল।

চন্দ্রনাথ: আচ্ছা, এবার নিজের জানা একখানা গান গাও ত।

ইন্দ্রাণী কি ভাবিয়া একটি বাঙলা ভজন ধরিল। কিন্তু দুই পদ গাহিতেই চন্দ্রনাথ গাহিবার ত্রুটি ধরিয়া দিয়া নিজেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে গানটির আলাপ করিল। ইন্দ্রাণী নীরবে শুনিল গানখানি। এই একটি আলাপেই বুঝিতে পারিল যে—উচ্চস্তরের এক সঙ্গীত সাধকের সংস্পর্শে সে সত্যই আসিয়াছে।

* *
*

হিন্দু বোর্ডিংএর সম্মুখ। ডাঃ ভাদুড়ীর মোটর আসিয়া থামিল। চন্দ্রনাথ মোটর হইতে নামিয়া দ্রুতপদে বোর্ডিংএ প্রবেশ করিল। মোটর চলিয়া গেল। বোর্ডিংএর দ্বিতলে সেই ঘর। মঙ্গল ঘরখানিকে সাজাইয়া ফেলিয়াছে। তক্তপোষের উপর চন্দ্রনাথের বিছানা পাতিয়া দিয়াছে। যে বাদ্যযন্ত্র লইয়া নিত্য তাহার সাধনা বা আলাপ চলে, সেগুলি বিছানার কাছেই রাখিয়া দিয়াছে। এস্রাজটি বিছানার উপরে এক পার্শ্বে রহিয়াছে। একটু তফাতে একখানি সতরঞ্চি বিছাইয়া নিজের বিশ্রামের স্থানটুকুও করিয়া লইয়াছে মঙ্গল। চন্দ্রনাথকে দেখিয়া সে বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল:

মঙ্গল: এত দেরীই যদি হবে জানতে—খেয়ে দেয়ে বেরুলেই ত পারতে!

চন্দ্রনাথ: আমি ওখান থেকে খেয়ে এসেছি মঙ্গলদা—কিছুতেই ওঁরা ছাড়লেন না।

মঙ্গল : এই ছাখো ! এখানে যে খাবার জন্যে কতবার ডাকতে এসেছিল—

চন্দ্রনাথ : আমি ম্যানেজারকে বলে এসেছি—তুমি খেয়ে নাও গে।

মঙ্গল : বাসার কিছু ঠিকানা হলো ?

চন্দ্রনাথ : হ্যাঁ—সে হয়ে গেছে। ওঁরা যে অনেক গুলো বাড়ীর মালিক, ওঁদেরই একখানা বাড়ী সম্প্রতি খালি হয়েছে। বাড়ীখানি নাকি খুব ভালো। রাতটা এখানে কাটিয়ে কালই আমরা ওবাড়ীতে যাব—ওঁরা আজই সব ঠিকঠাক করে রাখবেন।

* *
*

বাহিরের ঘরখানি শ্যামলীকে ব্যবহার করিবার অবাধ অধিকার দিয়া গিয়াছে চন্দ্রনাথ। এ দান শ্যামলী সানন্দে গ্রহণ করিয়াছে। তাই সেদিন সে বাহিরের ঘরে তানপুরা বাজাইয়া গানের কসরৎ করিতেছিল। বেলা তখন তিনটা—বাড়ীর সকলেই সুপ্তিমগ্ন। এমন সময় পিয়ন জঙ্গবাহাদুর বাহিরের দ্বারপ্রান্তে হাঁকিল :

পিওন : চিঠ্ঠি হ্যায় দিদিমণি !

শ্যামলী : যাচ্ছি।

তাড়াতাড়ি গিয়া ফটক খুলিয়া শ্যামলী পোষ্টকার্ডখানি লইল। তাহার পর দ্বার বন্ধ করিয়া ভিতরে চলিল।

* *
*

বাড়ীর ভিতরে উঠানের একাংশ। মহামায়া দেবী উঠানের উপরে

পাথরের রোয়াকে আসিয়া দাঁড়িয়াছেন। এদিকে শ্যামলীও দ্রুতপদে বাহির হইতে উঠানে আসিয়াছে—তাহার হাতে একখানা পোস্টকার্ড।

শ্যামলী : চন্দরদা'র চিঠি এসেছে মাসীমা।

মহামায়া : এসেছে ? বাঁচলুম। জয় বিশ্বনাথ! কি লিখেছে মা পড় ত—

ঠোঁটটি উল্‌টাইয়া শ্যামলী বলিল :

শ্যামলী : পড়ে শোনাবার মত ত চিঠি নয় মাসীমা—টেলিগ্রামের মত গোটাকতক কথা : নিরাপদে পঁহুছিয়াছি। বোর্ডিংএ উঠিয়াছি। বাসা পাইলে জানাইব। প্রণাম নিও।....আপনার ছেলের আক্কেল দেখুন দেখি—চিঠিতে না আছে তারিখ, আর না আছে ঠিকানা। বোর্ডিংএর নামটিও নেই....তারপর, আমাদের নাম তো···

মহামায়া : ভুলে গেছে মা—ওখানে পৌঁছেই তাড়াতাড়ি লিখেছে কিনা—

ঝি কামিনী কাজ করিতেছিল; সেই অবস্থায় নিকটে আসিয়া শুনিতেছিল। এই সময় বলিল :

কামিনী : তাও ত দিদিমণি ঐ পোষ্টকাটখানায় ঠিকানা লিখে দাদাবাবুর জামার পকেটে জোর করে দিয়েছিলেন গো! নৈলে এত শীগগির চিঠি পেতে হ'ত না—যা ভুলো মন দাদাবাবুর!

মহামায়া : ঐ ত লিখেছে বাছা—বাসা পেলেই জানাবে। তখন সকলের কথা লিখবে দেখিস্!

শ্যামলী : আচ্ছা—দেখবেন!

শ্যামলীর নাক দিয়া একটা নিশ্বাস পড়িল গভীরভাবে।

* *
*

মধ্য কলিকাতার পটলডাঙ্গা অঞ্চলে একটি জনবিরল রাস্তার গায়েই একখানি ছোট খাটো সম্পূর্ণ বাড়ীতে চন্দ্রনাথ তাহার বাসা পাতিয়াছে। বাড়ীর দরজার গায়ে পিতলের একটি নেমপ্লেট বসাইয়া দিয়াছে ইন্দ্রাণীর নির্দেশে তাহাদেরই অফিসের এক সরকার। দরজার পরেই এক ফালি বাঁধানো স্থান—সেখানে একখানি চওড়া বেঞ্চি সর্বক্ষণ রাখা আছে এবং এই পথে বায়ু চলাচল করে বলিয়া মঙ্গল অধিকাংশ সময় দরজাটি খুলিয়া সতর্ক প্রহরীর মত এই স্থানে বসিয়া থাকে—মধ্যাহ্নে নিদ্রাও দেয়। এই পথ দিয়া উঠানের কিয়দংশ—কলতলা, রান্নাঘর প্রভৃতি দেখা যায় এবং ভিতরে যাইবার ইহাই প্রধান প্রবেশ পথ। উঠানের পাশে দক্ষিণ দিকে রওয়াকের উপর দিয়া উপরে যাইবার সিঁড়ি। এই বেঞ্চে বসিলে তাহাও চোখে পড়ে। বেঞ্চি খানির পাশেই একটি দরজা—সেই দরজাটি নিচের বড় ঘরের। এই ঘুলঘুলির পাশেই সেই ঘর। ঘরের মধ্যে একখানা প্রকাণ্ড তক্তপোষ—তাহার উপর সতরঞ্চি বিছানো। একটা লম্বা বেঞ্চি এবং খান তিনেক লোহার চেয়ারও ঘরে আছে। বাহিরের লোক আসিলে এই ঘরে বসানো হয়। মঙ্গল এইঘরেই রাত্রিবাস করে। ইহার পিছনে আর একখানি ঘরও আছে। তাহার মধ্যে জিনিসপত্র রাখা হইয়াছে।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলেই একখানি বড় ঘর দেখা যায়। সেই ঘর খানি যে সঙ্গীতাচার্য চন্দ্রনাথের. আসবাবপত্র দেখিয়া তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। একদিকে শুভ্র চাদরে আবৃত একটি বিস্তীর্ণ ফরাস। পাশের আধারে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র। দেওয়ালে গাঁথা একটি আলমারির মধ্যে কতকগুলি বাঁধানো বই। একখানি আরাম কেদারা, একখানি সাধারণ কেদারা। একদিকে একখানি লোহার স্প্রীংয়ের খাটিয়া—চন্দ্রনাথের শয়নের সুবিধার জন্য ইহার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঘরে বড় বড় গায়কদের

ছবি। এগুলিও ইন্দ্রাণীর ব্যবস্থায় আসিয়াছে। আরাম কেদারার কাছে বনাত দিয়া মোড়া টেবিল। তাহার উপর লিখিবার সরঞ্জাম, সামনে একখানি কেদারা। পাশের ঘরখানির ভিতরে একটা বড়গোল টেবিল, কয়েকখানি চেয়ার। বাহারী খোলা র‍্যাকে চায়ের সাজ সরঞ্জাম। ঘরখানি দেখিলে মনে হয়—খাবার ব্যবস্থা এই ঘরে হইয়া থাকে।

অপরাহ্নকাল। মঙ্গল আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া উপরের ঘরে প্রবেশ করিল। চন্দ্রনাথ তখন সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। মঙ্গল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিল, তাহার পর ঈষৎ অনুযোগের স্বরে বলিতে লাগিল :

মঙ্গল : য়্যাঁ! এরই মধ্যে সেজেগুজে বেরুবার উদ্যুগ হোচ্ছে? আমি ভেবেছিনু বুঝি ঘুম দিচ্ছ!

চন্দ্রনাথ : আজ সন্ধ্যার পর ও বাড়ীতে গানের আসর আছে যে মঙ্গলদা! তাই তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে।

মঙ্গল : বলি, ম্যাষ্টরী কি আর কাউকে করতে দেখিনি বলতে চাও? ফিরবে যখন, পাড়া নিশুতি হয়েছে; অর্ধেক দিন ত খাবার পর্শও কর না—যেমন ঢাকা দেওয়া, তেমনি পড়ে থাকে।

চন্দ্রনাথ : কি করি—ওরা যে না খাইয়ে ছাড়ে না।

মঙ্গল : তাহলে মাইনে দিয়ে ঠাকুর রাখা কেন? তুমি যদি না খাও, আমার ত চার পয়সার মুড়িতেই রাত কেটে যায়। ভালো কথা—কলকাতায় আমরা এসেছি—কদ্দিন হলো বল ত?

সামনের দেয়ালে দোদুল্যমান ক্যালেণ্ডারটির তারিখ দেখিয়া চন্দ্রনাথ বলিল :

চন্দ্রনাথ : পরশু সোমবার হোলে ঠিক একমাস দশ দিন হবে।

মঙ্গল : ভালো! এখন জবাব দাও ত, এ নাগাৎ কাশীর খবর নিয়েছ?

বাড়ীর সুবাই কেমন আছে—কি করে ওঁদের চলছে, তার খবর পেয়েছ? নিজের খবর দিয়েছ?

চন্দ্রনাথ: কেন, এসেই ত পৌছানোর খবর দিয়েছি। আর কদ্দিনই বা হয়েছে? তার পরের খবর দেওয়া মানে—টাকা পাঠানো। মাইনের টাকাটা পেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মঙ্গল: একেই বলে—মা আর ছেলে। মায়ের প্রাণ পড়ে থাকে ছেলে কেমন আছে তারই খবর জানবার তরে, আর তুমি কিনা দাদাবাবু, বাসা করে ইস্তক মাকে একখানা চিঠি দেবারও ফুরসদ পাওনি, ঠিকানাটাও জানাও নি! কি করে তোমার গলা দিয়ে গান নামে বলতে পারো দাদাবাবু? ছি! ছি! ছি!

চন্দ্রনাথ: সত্যিই কাজটা ভালো হয় নি মঙ্গলদা—

মঙ্গল: ও সব ভালোমন্দ বুঝিনা বাপু, এখন বলি শোন—হয় সব কাজ কম্ম্য ফেলে এখুনি চিঠি নিকতে বোস, নয়ত বলো আমি পাড়ায় গিয়ে কাউকে দিয়ে চিঠি নিকিয়ে আনি।

চন্দ্রনাথ: তার আর দরকার হবে না মঙ্গলদা, আজই ওরা টাকা দেবে, কাল রবিবার আছে, চিঠি লিখে রাখব; সোমবার চিঠি আর টাকা এক সঙ্গেই পাঠাব। আর তোমার জবানীতে আমিই না হয় লিখে দেব।

মঙ্গল: আচ্ছা—দেখি! দুটো দিন বইত নয়!

চন্দ্রনাথ: আমিও হাড়ে হাড়ে দেখছি, কি রকম শক্ত অভিভাবকের পাল্লায় পড়েছি!

* *

*

কলিকাতায় ভাদুড়ী-ভিলার দ্বিতলের সেই বিশেষ অলিন্দটির বাহিরে খালি গাড়ীবারান্দায় নীলু চাকাওয়ালা কেদারাখানা ঠেলিয়া আনিতেছিল। এখানে চারিদিকেই ফুলের টব বসানো—লতানে ফুলগাছের কেয়ারীর জন্য স্থানটি বড় মনোজ্ঞ হইয়াছে। ফুল গাছের কেয়ারীর মধ্যে কায়দা করিয়া ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব বসানো—তাহার মধ্যেও বৈচিত্র আছে।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে! ইন্দ্রাণী আগে থেকেই ফুল তুলিতে তুলিতে নূতন শেখা একটা গানের কলি বারবার মনে মনে ভাঁজিতেছিল। ভিতর হইতে ডাঃ ভাদুড়ী তাহা শুনিয়াছেন—তাই তাঁহার তাগিদে চাকাওয়ালা চেয়ার খামি টানিয়া নীলুকে বারান্দায় আনিতে হইয়াছে।

ডাঃ ভাদুড়ী : মাষ্টারকে কি রকম মনে হচ্ছে বেবী—চলবে?

ইন্দ্রাণী ফুলগুলি বাছিয়া বাছিয়া তুলিতেছিল—ফুল পাতা দিয়া ছোট একটি তোড়া তৈয়ার করিবার অভিপ্রায়ে; সেই অবস্থায় বলিল :

ইন্দ্রাণী : চলবে—তবে তার জন্যে অনেক কসরৎ করতে হবে। এ যেন সেই ঢাকাপটির গুদোম-বাড়ি বাপি! সো-কেস নেই, সাজানো নেই, দর্শনদারি নেই, অথচ ঘরভর্তি বস্তাবন্দী মাল। মাস্টারের পেটেও তেমনি সব রকমের মাল গিস্‌গিস্ করছে—এখন ঘেঁটেঘুঁটে বার করা চাই!

ডাঃ ভাদুড়ী : তাহলে ওর মধ্যে সত্যিকারের এলেম আছে বল?

ইন্দ্রাণী : তা আছে বাপি! কিন্তু ঐ যে বললাম—encore দিয়ে দিয়ে আদায় করতে হবে। দেওয়ার ব্যাপারে লোকটা মহাকঞ্জুষ।

ডাঃ ভাদুড়ী : কিন্তু আমার ত লোকটাকে খুব দিলদরিয়া বলে মনে হয় বেবী।

ইন্দ্রাণী : সে হচ্ছে টাকা পয়সার ব্যাপারে—ওদিকে হুঁসই নেই। কিন্তু গানের বেলায়—ওরে বাবা! যেন যখের মত সব আগলে বসে আছে। আমারো ধনুর্ভঙ্গ পণ—ভাঁড়ার ওর খালি করে তবে ছাড়বো। এর জন্যে আদর যত্নের যদি বাড়াবাড়ি করি....

এই পর্যন্ত বলিয়াই এমন চটুল দৃষ্টিতে তাকাইল ডাঃ ভাদুড়ীর দিকে যে, তৎক্ষণাৎ তাহার অর্থ বুঝিয়া ভাদুড়ীই কথাটার উপসংহার করিলেন :

ডাঃ ভাদুড়ী : আমি যেন না বিরক্ত হই—এই ত? কিন্তু তুমি ত জান বেবী, তোমার প্রকৃতির হাড়হদ্দ সব বুঝেই শাসনের বল্‌গা যে আমি ছিঁড়ে ফেলেছি।

ইন্দ্রাণী : তাই. ত—আমার ঠোঁটদুটি নড়লেই তুমিও যে জানতে পারো বাপি, আমি কি বলবো!...ঐ যে, মাস্টার মশাইকে নিয়ে গাড়ী ফিরে এসেছে, আমি যাই বাপি!

* *

*

ভাদুড়ী-ভিলা। ইন্দ্রাণীর সুসজ্জিত-ঘর। রাত্রিকাল। ইন্দ্রাণীর নূতন সঙ্গীত শিক্ষকের সহিত পরিচিত হইবার উদ্দেশ্যে ইন্দ্রাণীর বন্ধু-বান্ধবীরা আসিয়াছে। চন্দ্রনাথ তখনও আসে নাই—তাহাকে আনিবার জন্য গাড়ী গিয়াছে। বন্ধু-বান্ধবীদের অনুরোধে ইন্দ্রাণী তাহার একখানি শ্রেষ্ঠ নৃত্যে রূপ দিতেছে। নৃত্যকালে সঙ্গীত-ঘরে আলোকপাতের ব্যবস্থা থাকায়—নৃত্যোপযোগী বসন-ভূষণে-সজ্জিতা ইন্দ্রাণীর নৃত্যশীলা রূপমাধুরী বিচিত্র আলোর আভায় সকলের চোখে যেন বিভ্রম সৃষ্টি করিয়াছে।.... নৃত্য আরম্ভ হইবার একটু পরেই ধীরে ধীরে চন্দ্রনাথ কক্ষে প্রবেশ করিল। কিন্তু কেহই তাহাকে লক্ষ্য করিল না। চন্দ্রনাথ একটু

দূরে—যে ক্ষুদ্র টেবিলটির উপর লিখিবার সাজ সরঞ্জাম থাকে, তাহার সামনের কোদারাখানির উপর চুপি চুপি বসিয়া পড়িল। তখন ইন্দ্রাণীর নৃত্য পূর্ণগতিতে চলিয়াছে। চন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ নৃত্য দেখিল নিবিষ্টমনে ; তাহার পর পকেট হইতে ঝর্ণা কলমটি বাহির করিয়া টেবিলে রাখা একখানি প্যাডে লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

নৃত্য শেষ হইলে বন্ধু-বান্ধবীরা—তিনটি মেয়ে ও তিনটি ছেলে : ইলা, নীলিমা, শোভা এবং কুঙ্কুম, প্রণব এবং নিখিল এক সঙ্গে করতালি দিল।

ইলা : ইন্দ্রার নাচ দেখলে সব ভুলে যেতে হয়।

কুঙ্কুম : Really—It is a magnificent.

প্রণব : She is an angel.

নিখিল : As to thee.

নীলিমা : কিন্তু এ নাচ ত এর আগে দেখিনি ভাই ইন্দ্রা ?

ইন্দ্রাণী : না—আমার নতুন মাষ্টারকে দেখাব বলে আজই এটি—

(এই সময় এক প্রান্তে লিখিবার টেবিলের সামনে চন্দ্রনাথকে উপবিষ্ট দেখিয়া)

একি! মাষ্টার মশাই! কখন এলেন ?

(বলিতে বলিতে ইন্দ্রাণী দ্রুতপদে আগাইয়া গেল। চন্দ্রনাথও চেয়ার হইতে উঠিয়া সহাস্যে বলিল :)

চন্দ্রনাথ : তোমার নাচের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসেছি, আর disturb না করেই দেখেছি।

কুঙ্কুম : How interesting—ইনিই তাহলে—

ইন্দ্রাণী : আমার সঙ্গীত শিক্ষক—এঁর কথাই বলছিলাম। আসুন introduce করে দিই—ইনিই মিস্টার চন্দ্রনাথ লাহিড়ী—বেনারসের বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্—এলাহাবাদ ইউনিভারসিটির

এম. এ.। আর মাস্টার মশাই, এঁরা আমার friends—সকলেই অল্পবিস্তর সঙ্গীত চর্চা করেন—প্রায়ই গানে এখানে আসেন। ইনি ব্যারিস্টার কুঙ্কুম সেন, ইনি প্রফেসর প্রণব চ্যাটার্জী, ইনি শোভাবাজারের কুমার নিখিলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, আর এঁরা তিনজনেই আমার বান্ধবী—ইলা বটব্যাল, নীলিমা গুপ্ত, আর শোভা বাগ।

চন্দ্রনাথ : আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধন্য হলাম।

বন্ধু বান্ধবীরা : আমরাও মিস্টার লাহিড়ী—আমরাও।

ইন্দ্রাণী : এখন বলুন ত—আমার নাচ আপনার কেমন লাগল ?

চন্দ্রনাথ : ঐ নাচ থেকে যখন একখানা গান বেরিয়ে এসেছে—তখন মানতেই হবে যে ভাল লেগেছে।

ইন্দ্রাণী : এ কথার মানে ?

চন্দ্রনাথ : (প্যাড খানি আগাইয়া দিয়া) মানে এতেই পাবে। পড়ে দেখলেই বুঝবে—তোমার নাচের ছন্দের সঙ্গে গানের শব্দগুলি ঠিক মিলে গেছে কিনা।

ইন্দ্রাণী : (প্যাডে লেখা গানটি পড়িয়া) হাউ য়্যামিউজিং ! আপনি অদ্ভুত ! আপনি সত্যিই জিনিয়াস্ মাস্টার মশাই ! নাচ দেখতে দেখতে এই গান খানা বেঁধে ফেলেছেন !

নিখিল : Is it possible ?

ইন্দ্রাণী : Not only possible—but he done, done—see you....পড়ে দেখুন—

ইন্দ্রাণীর হাতের প্যাডখানি দেখিতে বন্ধুবান্ধবীরা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া নানারূপ কলরব করিতে লাগিল।

* * *

উপরের ড্রয়িংরুমের সামনে দরদালানে সেই চাকাওয়ালা চেয়ারে অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় ডাঃ ভাদুড়ী গৃহভৃত্য নীলুকে জিজ্ঞাসা করিতে-ছিলেন :

ডাঃ ভাদুড়ী : এইজন্যে এত হৈ হুল্লোড় হচ্ছে—মাষ্টারের ঐ গান বাঁধা নিয়ে ?

নীলু : আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। নতুন মাষ্টার বাবুর এই এলেম দেখে দিদি-মণির মেয়ে আর পুরুষ বন্ধুরা একবারে তাজ্জব বনে গেছে।

ডাঃ ভাদুড়ী : তার পর ? কি ফয়সলা হয়েছে ?

নীলু : সবাই ম্যাষ্টারকে ধরেছে—তাঁর বাঁধা গান খানা তাঁকেই গাইতে হবে।

ডাঃ ভাদুড়ী : বটে ! এখন তুই এক কাজ কর—আমার নাম করে দিদিমণিকে বল্ যে, ওপরের হল ঘরে ঐ গানের মজলিস বসবে, আমিও শুনব গান খানা।

নীলু : যে আজ্ঞে।

ডাঃ ভাদুড়ী : আর—বীরেকে বলে যা, ঘর খানা খুলে দিক। তুই এসে আমাকে ও ঘরে নিয়ে যাবি।

* *
*

দোতালার সুসজ্জিত হলঘর। চারিদিকে সোফা। মাঝখানে কার্পেট পাতা। নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র। নিচের তালার ঘরখানির মত অবিকল সাজানো ; দেখিলেই মনে হইবে যেন একই ঘর—কেবল কার্পেট মোড়া সিঁড়ির দিকটা নাই। ডাঃ ভাদুড়ীকে চাকাওয়ালা চেয়ারে ঘরের একটি

বিশিষ্ট অংশে স্থাপিত করা হইয়াছে। নিচের বন্ধুবান্ধবীরা এবং ইন্দ্রাণী ও চন্দ্রনাথ উপবিষ্ট। যে গানখানি চন্দ্রনাথ ইন্দ্রাণীর নৃত্য দেখিয়া রচনা করিয়াছিল—তাহাই গাহিতেছে। গাহিতে গাহিতে গানখানি এমন জমিয়া উঠিল এবং গানের তালে নৃত্যের তালও সুস্পষ্ট হইল যে—ইন্দ্রাণীর পক্ষে আর বসিয়া থাক সম্ভব হইল না, তাহাকেও সহসা উঠিয়া নাচিতে দেখা গেল; এমন কি—বন্ধুবন্ধবীদের অনভ্যস্ত পদেও নৃত্যের দোলা লাগিল।

ডাঃ ভাদুড়ী: সাবাস! সাবাস! শেষ পর্যন্ত মাষ্টার ঘরশুদ্ধ সবাইকে নাচিয়ে ছাড়লে! আমার দেহ অসাড়, পা নাড়বার সাধ্য নেই—তাই রক্ষা! একেই বলে সত্যিকার সাধনা এবং প্রাণবন্ত সৃষ্টি! সত্যিই মাষ্টার আজ এক অদ্ভুত সৃষ্টি দেখালে!

* *

*

বারাণসীধাম। চন্দ্রনাথের বাড়ীর দোতালার ঘর। শ্যামলী বাদামে কাগজে তৈরী পুরাতন খাতায় লেখা গান ও স্বরলিপি পড়িতেছে মনে মনে। তাহার পর হঠাৎ কি মনে করিয়া খাতাগুলি লইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় পাশের ঘর হইতে মহামায়াদেবী আসিয়া বলিলেন:

মহামায়া: বিকেলের ডাক আসবার সময় হয়েছে না শ্যামল?

শ্যামলী: চিঠি এলে জঙ্গবাহাদুর এতক্ষণ বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করত মাসীমা!

মহামায়া: সে কথা মিছে নয়; ডাকঘরের পিয়ন—পরের ছেলে; আমাদের জন্যে সেও ভাবে। শুধু তাঁরই ভাবনা নেই—আমরা যাঁর জন্যে ভেবে মরছি।

শ্যামলী : তিনটে এখনো বাজেনি মা, ঘুমোন না একটু—

মহামায়া : ঘুম কি চোখে আসেরে! পৌঁছানোর খবর দিয়েই সে নিশ্চিন্তি হয়ে আছে! একটা মাস কবে পূরো হয়ে গেছে, তার টুঁ শব্দটি নেই।

শ্যামলী : ছেলেকে ত ভালো করে চেনেন মাসীমা, গান পেলে সব ভুলে যান—কোন দিকে হুঁস থাকে না। আর এমনি তাঁর কাণ্ড—এখানেও এমন কিছু রেখে যাননি যে, কোনো খান থেকে তাঁর পাত্তা পেয়ে চিঠি একখানা লিখি। দেখি বাইরের ঘরখানা আর একবার খুঁজে।

মহামায়া : বিশ্বনাথের মনে যা আছে—তাই হবে বাছা!

* *

*

বাহিরে গেট। সবুজ রঙের কাঠের দরজায় আস্তে আস্তে ঘা দিতেছিল ডাকঘরের পিওন জঙ্গবাহাদুর। শ্যামলীকে দেখা গেল। শব্দ শুনিয়া সে বাহিরের ঘরে না গিয়া—ফটকের দিকে আগাইয়া গেল। তাহার মুখ ও চক্ষু হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

শ্যামলী : চিঠি নাকি জঙ্গবাহাদুর?

জঙ্গবাহাদুর : চিঠি তো হ্যায় দিদিমণি! লেকেন বাবু নেহি ভেজে হুঁয়,—বাবুকা নামসে আয়া—লিজিয়ে।

শ্যামলী চিঠিখানি (পোষ্টকার্ড) লইয়া দেখিল এবং পড়িতে লাগিল :

শ্যামলী : তাইত!...কল্যাণীয় শ্রীমান চন্দ্রনাথ লাহিড়ী দীর্ঘজীবেষু। লিখছেন—আশীর্বাদক রামময় ভট্টাচার্য্য! ও! তাহলে... কিন্তু....লক্ষ্ণৌ থেকে কেন? তিনি ত গোয়ালিয়রে! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তুমি যাও জঙ্গবাহাদুর।

* *
*

বাহিরের ঘর। ফরাসের উপর বসিয়া শ্যামলী চিঠিখানি পড়িতেছে:

গোয়ালিয়র হইতে কাশী গিয়া কোনও সংবাদ দাও নাই।...আমার দুই চক্ষুতে ছানি পড়িয়াছিল দেখিয়া গিয়াছ। লক্ষ্ণৌ মেডিক্যাল কলেজে উহা কাটাইতে আসিয়া অন্ধ হইয়াছি। এখানে আমার এক শিষ্যার গৃহে বাস করিতেছি। তিন বন্ধুর তুমিই একমাত্র বংশধর। আমার সারা জীবনের সঞ্চিত সামান্য সম্পদ—তন্মধ্যে কতিপয় দুর্লভ গানও আছে, তোমাকে দান করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় লইতে চাই। উপরে ঠিকানা দিলাম। অবিলম্বে উপস্থিত হইবে; নতুবা সাক্ষাৎ হইবে না।

শ্যামলী চিঠিখানি লইয়া চিন্তামগ্ন হইল। দেওয়ালে তিনবন্ধুর ছবি রহিয়াছে—চিঠিখানি লইয়া ছবির দিকে চাহিয়া ভাবাদ্র কণ্ঠে বলিল:

শ্যামলী: আমাকে কর্তব্য বলে দিন—এ অবস্থায় কি করি? যাঁকে যাবার জন্যে ডেকেছেন, তিনি এখানে নেই—তাঁর ঠিকানা জানি না। আমি এখন কি করি!

* *
*

পটলডাঙ্গা—চন্দ্রনাথের বাসাবাড়ি। দ্বিতলের কক্ষে চন্দ্রনাথ ফরাসে বসিয়া একখানা গান লিখিতে লিখিতে মঙ্গলের সহিত কথা বলিতেছিল। মঙ্গলও ঘরের জিনিসপত্রগুলি ঝাড়িতে ঝাড়িতে কথার উত্তর দিতেছিল।

মঙ্গল : তুমি যাই বল দাদাবাবু, আমি ওনাদের চিনে নিয়েছি। তোমাকে এই বাসাবাড়ি দিয়ে, আর মধ্যে মধ্যে তোয়াজ করে খাইয়ে দাইয়েই এনারা কাজ আদায় করে নেবে তোমার কাছ থেকে। টাকা পয়সা আলাদা আর উপুড় হাত করবেকনি।

চন্দ্রনাথ : ভালো করে না জেনে শুনে কারুর সম্বন্ধেযা'তা ব'ল না মঙ্গল দা! এ ভারি অন্যায় কিন্তু।

মঙ্গল : আরে আমি যে হাড়হদ্দ সব জেনে নিয়েছি গো—এই হচ্ছে ওনাদের স্বভাব। লোক জনদের খাটিয়ে নিয়ে মাইনে দেবার বেলায় যত গড়িমিশি আর ভোগান্তি! এর বেলায় টাকা বার করতে ওনাদের গায়ে জ্বর আসে।

চন্দ্রনাথ : টাকাটাই দুনিয়ায় বড় কথা নয় মঙ্গলদা! আর আমার মা এমন কিছু নিস্বম্বল নন, বা আমি তাঁকে অথৈ জলে ফেলে আসিনি যে, আমার উপার্জনের টাকা না পাঠালে তাঁর দিন চলবে না। এঁরা টাকা দিন বা না দিন, আমি কখনো এঁদের কাছে ছোট হতে পারব না। আর, এসব কথা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না, আমি মাকে সব কথা খুলে লিখব'খন।

মঙ্গল : সেই ভালো। আমি হচ্ছি আদার ব্যাপারী—কি কাজ বাপু, তোমাদের জাহাজের খবরদারীতে!

* *

*

ঈশ্বর বাকচির বাড়ীর বাহিরের ঘর। একখানি ছোট তক্তপোষের

উপর সতরঞ্চি বিছানো—তাহাতে হারমোনিয়ম। শিবানী ও শ্যামলী কথোপকথন করিতেছিল :

শিবানী : ভারি আশ্চর্য কিন্তু! তুমি কোনদিন চন্দ্রদার কাছে বসে গানও শেখ নি, তারপর শেষে তিনি শিখাতে চাইলেও তুমি রাজি হওনি; অথচ, আমার গান শুনে বললে—সুরে গলদ আছে!

শ্যামলী : তুমি বুঝতে পারছ না ভাই, চন্দ্রদার কাছে বসে না শিখলেও কানেও ত আর হাত চাপা দিয়ে রাখিনি! হরদম শুনেছি ত! তাই দোষটা কানেই ধরা পড়েছে!

শিবানী : আমার কি জানো ভাই—মরবার সময় হরিনাম শেখা! য়্যাদ্দিন গা করলেন না, শেষকালে কলকাতায় যাবার দু'দিন আগে শেখাতে চাইলেন! তা দু'দিনে আর কত হবে বল?

শ্যামলী : না ভাই—এর জন্যে তুমি আফশোষ ক'র না; একটা মাসেই তোমার অনেক উন্নতি হয়েছে—আরো হবে।

শিবানী : তাহলে তোমার কানে যে ভুলটা ধরা পড়েছে, শুধরে দেবার কি হবে?

শ্যামলী : কিন্তু বললাম ত—আমার শুধু শোনা বিদ্যে! ঐ গানটি ওঁর গলায় যেমন শুনিছি—তেমনটি বললেই তুমি ভাই নিজের ভুলও বুঝতে পারবে। তাহলে গানের ঐ দুটো কলি তুমি আর একবার গাও দেখি?

শিবানী হারমোনিয়ম বাজাইয়া গানটির প্রথম দুইটি চরণ গাহিল। তাহার পর বলিল :

শিবানী : এবার তোমার পালা ভাই!....তাহলেই...

শ্যামলী ঐ চরণ দুইটির দোষ সংশোধন করিয়া গাহিল এবং তাহা শুনিয়া শিবানী চমৎকৃত হইয়া বলিল :

শিবানী : অ-মা! তুমি যে আমাকে একবারে অবাক করে দিলে! এই তোমার শুনে গাওয়া!

শ্যামলী : চন্দ্রদা যেমন গাইতেন, ঠিক তেমনি গেয়েছি। এতে নিজের কৃতিত্ব কিছুই নেই। তুমি যেখানটা চড়িয়েছ, উনি খাদে নামাতেন, তাতেই মিষ্টি লাগল।

শিবানী : তুমি ভাই আমার মস্ত ভুলটি ধরিয়ে দিলে।

শ্যামলী : এখন তোমাকে ভাই আমার একটি উপকার করতে হবে। আমি দিন কতকের জন্যে বাইরে যাবো, না ফেরা পর্যন্ত তোমার জেঠাইমাকে দেখাশোনা করতে হবে ভাই!

শিবানী : সে কি! বাইরে যাবে তুমি? আমি ভাবছিলুম, এর পর দুই বোনে বসে গান সাধবো ভালো করে—

শ্যামলী : সে ফিরে এসে হবে। এখন তোমাকে—ভাই, আমার এই কথাটি রাখতে হবে।

শিবানী : এ আর বেশী কথা কি ভাই! চন্দ্রদার মা কি আমার পর?

* *
*

চন্দ্রনাথের বাড়ীর ভিতরে উঠান। শ্যামলীর তোরঙ্গ ও বেডিং দেখা যাইতেছে। শ্যামলী, কামিনী ও মহামায়া দণ্ডায়মান।

মহামায়া : দিন বুঝে বাছা, ঠিক এই সময়েই তোমার মরণাপন্ন অন্ধ জেঠা খবর পাঠালেন!—আর তুমি আমাদের সবাইকে অকূল পাথারে ফেলে চলেছ তাঁর কন্না করতে। না-ও বলতে পারিনে, আবার তোমার মতন সোমত্ত মেয়েকে

একলা পাঠাতেও মন সরে না। আমার বুকের মধ্যে কি যে হচ্ছে—বিশ্বনাথই বুঝছেন।

শ্যামলী : আমিও কি বুঝছি না মা, কিন্তু কি করি বলুন? চন্দরদা আজ এখানে থাকলে, কিম্বা তাঁর কলকাতার ঠিকানাটাও জানতে পারলে, এ ভার তাঁকেই দিতাম। তাই না, আমাকেই যেতে হচ্ছে। না গেলে তিনিও কষ্ট পাবেন, আর যে সম্পদ দিয়ে যাবার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছেন, তা থেকেও বঞ্চিত হতে হবে।

মহামায়া : সেই বুঝেই ত, মুখ বুজিয়ে আছি বাছা! কিন্তু আমার বুকের ভিতরটা—

কামিনী : দিদিমণি তোমার ভাবনার কিছু রেখে যাচ্ছেন না—গিন্নী মা! যেখানে যা দেনাপত্তর, আমাদের মাইনে পাই-পয়সা সব চুকিয়ে দিয়েছেন—কিছুতেই শুনলেন না!

মহামায়া : সেও জানি। ওর বাপের দেওয়া যেখানে যা ছিল, সব নষ্ট করে এই কাণ্ড করলে! আমার আঁচলেও দুখানা নোট বেঁধে দিয়ে গেল—এর পর যাতে আতান্তরে না পড়তে হয়। আর জন্মে ও আমার পুত্তুর ছিল।

শিবানী ও মনোরমা প্রবেশ করিলেন।

শিবানী : আমরা এসেছি।

শ্যামলী : আমি আপনাদের কথাই ভাবছিলাম।

বলিতে বলিতে মনোরমাকে এবং তৎপরে মহামায়াকে হেঁট হইয়া গড় করিল।

মনোরমা : শিগগীর ফিরে এস মা।

মহামায়া : চন্দর যেদিন কলকাতায় যায়, তাকে বিদেয় দিতে বুঝি এত কষ্ট পাই নি! বিশ্বনাথ!

তৃতীয় পর্ব

লক্ষ্ণৌ সহরে আমিনাবাদ পার্কের পার্শ্বেই একখানি হাল-ফ্যাসানের দ্বিতল বাড়ী। বাড়ীর উপর তালায় একটি একানে ঘর। ঘরখানির একটু বিশেষত্ব আছে। লম্বা হলের মত। এক পার্শ্বে পরিচ্ছন্ন শয্যা। ঘরের মেঝেটি আগাগোড়া ম্যাটিন করা—উপরে লক্ষ্ণৌ ছিটের আস্তরণ দেওয়া পুরু ফরাস। উপরে কয়েকটি তাকিয়া। একটি জমকালো আমেদাবাদী গড়গড়া। উচ্চাঙ্গ—সঙ্গীতের উপযোগী নানাবিধ পুরাতন পদ্ধতির দুষ্প্রাপ্য বাদ্যযন্ত্র। চন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় যেমন তিন বন্ধুর একখানি ছবি আছে—এখানেও সেইরূপ ছবি। তাহা ছাড়া ঐতিহাসিক এবং এ যুগের সাধক-গায়কদের ছবিগুলি গৃহসজ্জার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতেছে। যেমন—মহাপ্রভু, জয়দেব, তানসেন, মীরাবাঈ, সুরদাস, কবীর, নরসী, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি।

শয্যার উপরে আস্তীর্ণ একখানি মৃগচর্মে বসিয়া অন্ধ গায়ক রামময় ভট্টাচার্য তানপুরা বাজাইয়া একখানি বিখ্যাত হিন্দী গজল গাহিতেছিলেন। রামময় এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। ঋষিতুল্য দিব্য গাম্ভীর্যময় চেহারা। বয়স ৫৫।৫৬ বৎসর। এই সময় ষোড়শী ও রূপসী অনূঢ়া তরুণী গীতা দ্রুতপদে আসিয়া বলিল:

গীতা: দাদু! সব গুলিয়ে গেছে।

রামময়: কি হয়েছে দিদি?

গীতা: কাশী থেকে চন্দ্রনাথ বাবু আসেন নি—এসেছেন একটি মেয়ে!

রামময়: মেয়ে?

গীতা: ভারি মিষ্টি মেয়ে দাদু! তার কথা এমনি মিষ্টি—

রামময়: তোমার চেয়েও মিষ্টি—বল কি? কিন্তু চন্দ্রনাথের বদলে—
এ মেয়েটি এলো কেন তা ত বুঝতে পারছি নে।

* *
*

বাড়ীর নীচের তলার দরদালানে শ্যামলী বাড়ীর কর্ত্রী চন্দ্রাবতীর সঙ্গে কথা বলিতেছিল। চন্দ্রাবতীর বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর। কিন্তু এই বয়সেও তাঁহার দেহসৌষ্ঠব, মুখের সৌন্দর্য ও রূপলাবণ্য দেখিয়া চক্ষু ফিরাইয়া লওয়া যায় না। এই নারী যখন সুসজ্জিতা হইয়া গায়িকারূপে সঙ্গীতের আসরে বিপুল মর্য্যাদার গৌরবে উপস্থিত থাকেন, তখন তাঁহার সঙ্গীতমুখর আকৃতি দেখিয়া দেবী সরস্বতীর কথা মনে পড়ে—শ্রদ্ধাবনত-শিরে আসরের সকলে এই মহীয়সী নারীকে সম্ভ্রম প্রদর্শন না করিয়া পারেন না—এমনই ইঁহার নারীত্বের প্রভাব। লক্ষ্ণৌ সহরে সেইজন্য ইনি "মাতাজী বাঈজী" নামে অভিহিতা। ইঁহারা কনোজিয়া ব্রাহ্মণ—হিন্দুস্থানী। চন্দ্রাবতী শৈশব হইতেই সঙ্গীতানুরাগিনী ছিলেন। সুকুমার গাঙ্গুলী নামে এক বাঙ্গালী গায়কের সঙ্গে ইঁহার বিবাহ হয়। স্বামীর অকালমৃত্যুর পর শ্বশুরবাড়ীতে বনিবনাও না হওয়ায় কন্যা গীতাকে লইয়া ইনি লক্ষ্ণৌএ আসেন এবং স্বাধীনভাবে গানের ব্যবসায়ে ব্রতী হন। স্বামীও সেইভাবে চন্দ্রাবতীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে বলিয়া যান যে, চন্দ্রাবতী যেন সঙ্গীতকে জীবিকার অবলম্বন করেন। স্বামীর সেই নির্দ্দেশই চন্দ্রাবতীকে প্রতিষ্ঠা দান করে। রামময় তাঁহার গুরু। নিজগৃহে অন্ধ গুরুকে তিনি শ্রদ্ধাসহকারে আনিয়া সকন্যা পরিচর্য্যা করিতেছেন। সঙ্গীত শিক্ষায় গীতাও রামময়ের ছাত্রী।

চন্দ্রাবতীর সঙ্গে শ্যামলী কথা বলিতেছিলেন :

শ্যামলী : এখন শুনলেন ত—চন্দ্রদার বদলে আমি কেন কাশী থেকে এসেছি ?

চন্দ্রাবতী : বুঝিছি। কিন্তু এদিকে বাবা ত চিঠি পাঠিয়ে অবধি চন্দ্রবাবুর পিত্যেশে (প্রত্যাশায়) পথের পানে চেয়ে আছেন। তাই ত গীতা ছুটে বলতে গেল—তার বদলে তুমি এসেছ।

শ্যামলী : উনি বুঝি—

চন্দ্রাবতী : আমার মেয়ে—ঐ আমার সব। ও ত বাবাকে খবর দিয়েছে, এখন তুমিও চল মা।

শ্যামলী : আচ্ছা, গুরুদেব আপনার—

চন্দ্রাবতী : আমারও গুরুদেব। আমি ওঁকে বাবা বলি, সে হিসেবে উনি আবার গীতার দাদু।

শ্যামলী : আমি আপনাকে কি বলে ডাকব ?

চন্দ্রাবতী : চন্দ্রবাবুর মাকে যা বলে ডাকতে—

শ্যামলী : তাঁকে মাসীমা বলতাম—আপনাকে মা বলে যদি ডাকি, রাগ করবেন ?

চন্দ্রাবতী : রাগ করব ? আমার কত বড় ভাগ্যি যে তুমি একথা বললে মা! সত্যি তুমি ভারি ভালো মেয়ে—আমি ভাবব, তুমি গীতার বড় বোন! চল মা—

* *

*

রামময়ের সেই কক্ষ। রামময়, গীতা, চন্দ্রাবতী ও শ্যামলী! শ্যামলী রামময়ের পদতলে বসিয়া দুই পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল।

শ্যামলী : আমার অন্তরের আগ্রহ জেনেই অন্তর্যামী হয়ত এই যোগাযোগ করে দিয়েছেন ! বাবার সঙ্গে যেমন আগ্রহে কাশীতে আসি—তেমনি আগ্রহ নিয়ে এখানেও এসেছিলাম। আজ আপনার পায়ে হাত পড়তেই আপনাদের তিন বন্ধুর মূর্তিই আমার চোখের সামনে যেন ফুটে উঠছে।

রামময় : আশ্চর্য ! কতক্ষণই বা তুমি এসেছ ! কিন্তু একটি বছরের বেশী কাছে থেকেও চন্দ্রনাথ ত এ সব কথা কিছুই বলেনি !

শ্যামলী : তিনি যে গান ছাড়া অন্য কথা বলতে ভালোবাসেন না জেঠাবাবু!

রামময় : কিন্তু জীবন ত শুধু গান নিয়ে নয় মা ! গলা দিয়ে যারা গান ধরে, মন দিয়ে ধ্যানও করে তারা ! মেয়েরা রাঁধে বলে কি চুল বাঁধে না ? শুনে তুমি আশ্চর্য হবে—তোমাদের কথাও সে আমাকে বলে নি।

শ্যামলী : আত্মভোলা মানুষ, হয়ত ভুলেই গিয়েছিলেন।

রামময় : আমার এখন মনে হচ্ছে মা—ইচ্ছা করেই বলে নি ; ভুল নয়। একটা কথার উত্তর চাই মা ! লজ্জা ক'র না— পিতৃবন্ধু জেনে যখন জেঠাবাবু ব'লেছ !

শ্যামলী : এই বয়সে আমাকে অনেক কিছুই সহ্য করতে হয়েছে জেঠাবাবু—তার জন্যে লজ্জা সংকোচ ভয় কিছুই গ্রাহ্য করিনি। আপনি আদেশ করুন—

রামময় : তোমার প্রতি চন্দ্রনাথের মায়ের স্নেহের কথা বলেছ, শুনে সন্তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু চন্দ্রনাথ ? তোমার সম্বন্ধে তার—

শ্যামলী : আগেই ত বলেছি জেঠাবাবু, তাঁর যা কিছু সম্বন্ধ গানের সঙ্গে।

রামময় : আর গান নিয়ে তুমি তার সম্বন্ধে যে রকম ওকালতী করছ তাতে মনে হচ্ছে চন্দ্রনাথের কাছ থেকে তুমিও ঐ জিনিসটি ভালো ভাবেই আদায় করছো!

শ্যামলী : না জেঠাবাবু! আমার অদৃষ্টে তিনি ছিলেন মহাভারতের দ্রোণাচার্যের মতই কঠিন—অনেক কাকুতি করেও তাঁর করুণা পাইনি।

রামময় : তবে কি বুঝব মা, প্রত্যাখ্যাতা হয়ে একলব্যের মত তুমি…

শ্যামলী : একথা….একথা আপনার মনে….

রামময় : কি করে এলো? তোমার কণ্ঠ থেকেই যে তার আভাস পেয়েছি মা! এই অনুপম স্বরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে—কঠোর সাধনাসিদ্ধ এক অপূর্ব সুর।

শ্যামলী : তাহলে আপনার কাছে লুকাব না জেঠাবাবু, একলব্যের মতই কঠোর এক প্রতিজ্ঞা নিয়ে—আমাকে সাধনা করতে হয়েছে। সব কথা আমি আপনাকে বলব।

রামময় : আমি শুনব মা! তার পর—আমিই করব আমার শিষ্যের সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত।

শ্যামলী গলায় কাপড় দিয়া হেঁট হইয়া রামময়কে প্রণাম করিল।

* *
*

কলিকাতা ভাদুড়ী-ভিলা। রাত্রিভোজন করিতে করিতে পিতা-পুত্রীর আলাপ চলিয়াছে :

ইন্দ্রাণী : জানো বাপি, মাষ্টার মশায়ের সেই 'মানসী' গানখানা কাল

মার্বেল প্যালেসের জলসায় গাইতেই সবাই একবারে স্পেল বাউণ্ড spell bound! তার পর—যেই শুনলে, গানের কথা গুলো পর্যন্ত আমার, তখন চারদিক থেকে কি বাহবার ঘটা!

ডাঃ ভাদুড়ী : কিন্তু মাষ্টার মশাই—

ইন্দ্রাণী : তাঁকে কি নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে করে যে জানবেন? আর—গানগুলো যখন আমাকে দিয়েছেনই, আমার নামে চালাতেই বা দোষ কি? শেষকালে গান পিছু কিছু ধরে দিলেই হবে।

ডাঃ ভাদুড়ী : তাহলেও মাষ্টারের সঙ্গে কথাটা—

ইন্দ্রাণী : তুমি তার জন্যে কিছু ভেব না বাপি! ও সব দিকে ওঁর নজরই নেই। আমাকে ত বলেছেন—ওঁর গানের ভাঁড়ার আমাকে উজড় করে দেবেন।

ডাঃ ভাদুড়ী : তাহলে ওঁর সম্বন্ধে তোমারও বিশেষভাবে বিবেচনা করা কর্তব্য।

ইন্দ্রাণী : সে সব ঠিক আছে বাপি! এই শোন না—ওঁর বাসা-বাড়ীতে থাকা, আসবাব-পত্র, খাইখরচ, চাকরের মাইনে, জামা কাপড় যা কিছু দরকার সরকার মশাইকে দিয়ে সে-সব এমনি ক্লেভারলি ম্যানেজ করছি যে, মাষ্টার মশাইকে ভাবতেই হয় না। আর বলেই রেখেছি—বাড়ী যাবার সময় একসঙ্গে টাকা-পয়সা সব হিসেব করে দেওয়া হবে।

ডাঃ ভাদুড়ী : ভালো কথা, ওঁর বাড়ীতে টাকা পাঠাচ্ছ ত?

ইন্দ্রাণী : এই ত সেদিন সরকার মশাইকে একশ টাকা দিয়েছি মনিঅর্ডার করবার জন্যে। তবে বলে দিয়েছি—একটু

কায়দা করে পাঠাতে—এখানকার ঠিকানা যাতে জানতে না পারে।

ডাঃ ভাদুড়ী। এমনি করেই কি মাষ্টারকে জালে ঘিরে এবচেটে করে রাখবে বেবি!

ইন্দ্রাণী: ওঁর ভাঁড়ার উজোড় করে না নেওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা করেছি বাপি!

* *
*

ইন্দ্রাণীর সেই গানের ঘর। চন্দ্রনাথ তার নিজের বাঁধা একখানি গান গাহিতেছিল। ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করিল:

ইন্দ্রাণী: আচ্ছা মাষ্টার মশাই, আপনার গানগুলি এত ভালো লাগে কেন বলবেন? গান বাঁধার গুণে, না মিষ্টি গলার জন্যে?

চন্দ্রনাথ: নূতনের মোহে।

ইন্দ্রাণী: তার মানে?

চন্দ্রনাথ: আমি যে ধরণের গান রচনা করে কথার সঙ্গে মিলিয়ে নূতন রকমের স্থর দিয়েছি—সেটা একবারে অভিনব, আর আমার নিজস্ব।

ইন্দ্রাণী: অর্থাৎ আপনিই ও গানের স্রষ্টা?

চন্দ্রনাথ: গর্ব করতে চাই না; তবে এটা ঠিক যে, বর্তমানের রুচি ও চাহিদার দিকে চেয়ে—আমিই এ ধরনের গান প্রথম আবিষ্কার করেছি।

ইন্দ্রাণী: এখন হয়েছে কি জানেন—কোন একটা পাবলিক হলে এই গানের একটা আসরের জন্যে আমার বন্ধুরা ধরেছেন। একজন

অর্গানাইজারও খাড়া হয়েছেন—তিনি হলের ব্যবস্থা আর পাবলিসিটি করবেন। আপনার দেওয়া গানগুলি আমি যদি ঐ আসরে গাই—আপনি কি আপত্তি করবেন?

চন্দ্রনাথ: আমার আপত্তি! ক্ষেপেছ? তুমি কি বুঝতে পারছ না—এতে আমারও কত আনন্দ!

ইন্দ্রাণী: আমিও তাই ভাবি। হ্যাঁ, মাষ্টার মশাই, আপনার বাড়ীতে মা'র নামে একশো টাকা মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দিতে বলেছি। দাঁড়ান, সরকার মশায়ের কাছ থেকে রসিদখানা আনাচ্ছি।

চন্দ্রনাথ: থাক্—রসিদ আনতে হবে না।

ইন্দ্রাণী: কুপনে কিন্তু লিখে দিয়েছি মাষ্টার মশাই, সব গান শিখিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আপনার বাড়ী যাওয়া বন্ধ!

চন্দ্রনাথ: ভালোই ত!

* *
*

চন্দ্রনাথের বাসা বাড়ী। চন্দ্রনাথের পিছনে পিছনে উপরের ঘরে মঙ্গল আসিল। চন্দ্রনাথ জামা খুলিতে খুলিতে জানাইল:

চন্দ্রনাথ: খেয়ে এসেছি মঙ্গলদা! ওঁরা কিছুতেই ছাড়লেন না।

মঙ্গল: এ মন্দ নয়—হপ্তার মধ্যে অর্দ্ধেক দিন ওখানে খেয়ে আসবে, আর এখানে রাঁধা খাবার নষ্ট হবে। বলে গেলেই ত হয়!

চন্দ্রনাথ: সব সময়ই ত দেখি বাড়ীর ভাবনায় গোমড়া মুখ করে বসে আছ—তাই আর বলা হয় না! এখন শোন—মার নামে ওঁরাই ওখান থেকে একশো টাকা মনিঅর্ডার করে পাঠিয়েছেন।

মঙ্গল : ট্যাকার জন্তে যেন আমার ঘুম হচ্ছিল না—শ্যামল দিদি থাকতে কিছু ভাবিনে। ভাবনা শুধু খবরের তরে। মায়ের খবর কিছু পেলে।

চন্দ্রনাথ : হ্যাঁ, হ্যাঁ, খবর সব ভালো—টাকার কুপন খানা এনে তোমাকে পড়ে শোনাব'খন। যত সব—

* *
*

কাশীতে চন্দ্রনাথের বাড়ীর সেই ভিতরের উঠান। চাতালে বসিয়া মহামায়া দেবী একখানা মনিঅর্ডার ফরম সহী করিতেছেন। পিওন জঙ্গ বাহাদুর উঠানে দাঁড়াইয়া হেঁট হইয়া দেখাইয়া দিতেছে :

পিওন : হিঁয়া আউর একঠো সহী লাগাইয়ে মাজী!

মহামায়া দেবী মনিঅর্ডার ফরমে নাম সহী করিতে লাগিলেন। শিবানী প্রবেশ করিয়া সুধাইল :

শিবানী : চন্দরদার টাকা এলো জেঠাইমা?

মহামায়া : আর কে পাঠাবে মা!

পিয়ন : উঁহু—রূপিয়া ত বাবুজী ভেজা নেহি মাজী—লক্ষ্ণৌসে শ্যামলী দেবী ভেজী হ্যায়।

মহামায়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

শিবানী : শ্যামলী টাকা পাঠিয়েছে!

পিয়ন কুপনটি ছিঁড়িয়া মহামায়াকে দিয়া বলিল :

পিওন : দেখিয়ে ত।

মহামায়া : (শ্যামলীকে দিয়া) পড়তো মা—

পিয়ন নোট গুণিতে থাকিল—শিবানী কুপন লইয়া পড়িতে লাগিল।

শিবানী : "মাসী মা। জেঠাবাবু একটু ভালো আছেন। আপনার খরচের জন্য এক শত টাকা পাঠাইতেছি। চন্দ্রদার খবর ও ঠিকানা দিবেন।"

পিওন নোটগুলি দিল।

মহামায়া : (নোট গুলি আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে) চন্দরদার খবর আর ঠিকানা চেয়েছে। নিজের ছেলে—দেড়মাস হতে চলল, চুপ করে আছে। আর পরের মেয়ে শ্যামলী পাতানো মাসীমার খরচের জন্যে টাকা পাঠালে!

* *
*

লক্ষ্ণৌ—চন্দ্রাবতীর বাড়ী। শ্যামলী রামময়ের সেই ঘরে বসিয়া রামময়, চন্দ্রাবতী ও গীতার সামনে এক খানি রাগপ্রধান উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত গাহিতেছিল। গানখানি শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ ও আশ্চর্য্য হইলেন।

চন্দ্রাবতী : বা!

গীতা : কি সুন্দর!

রামময় : আমার গান, আমার সুর, আমার শিক্ষা, কিন্তু তুমি আমাকেও হারিয়ে দিয়েছ শ্যামলী।

শ্যামলী তাড়াতাড়ি উঠিয়া নীরবে রামময়ের চরণস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল।

রামময় : এই দীর্ঘ জীবনে অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা দিয়েছি—কিন্তু সহজাত আশ্চর্য্য প্রতিভায় তুমি সকলকেই অতিক্রম করেছ মা! তাই দুঃখ হচ্ছে চন্দ্রনাথের জন্য!

গীতা : তাঁর জন্যে দুঃখ হচ্ছে কেন দাদু!

রামময় : গুরুর গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন চন্দ্রনাথ—শ্যামলীর আবেদনকে উপেক্ষা করে।

শ্যামলী : তাঁর সেই উপেক্ষা থেকেই আমি পেয়েছি শিক্ষার আগ্রহ, আর নিষ্ঠা। মনে মনে তাঁকেই গুরুর আসনে বসিয়ে আমি করেছি আত্মসাধনা জেঠাবাবু! তাই, তিনিই আমার প্রথম গুরু, আর আপনি হয়েছেন—পরমগুরু।

চন্দ্রনাথের নাম করিবার সময় 'তিনিই আমার প্রথম গুরু' বলিয়াই উদ্দেশে যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল শ্যামলী।

রামময় : তোমার কথা শুনে পুরাণের একলব্যের কথা সত্যই মনে পড়ছে। দ্রোণাচার্যের উপেক্ষা তাঁকেও এই পরম সিদ্ধি দিয়েছিল। চন্দ্রনাথের মুখে তারই সৃষ্টি নবযুগের গান আমি মুগ্ধ হয়ে শুনিছি। কিন্তু সেই গান তোমার মুখে আরও মিষ্টি লেগেছে। আমার অন্তর বলছে শ্যামলী—একলব্যের মত তুমিও আত্মসাধনার সিদ্ধি দ্বারা চন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে দেবে—সেদিন খুব দূরে নয়।

বাহির হইতে পরিচারিকা বলিল : শ্যামলীদি, পিয়ন তোমাকে খুঁজছে—চিঠি আছে; সই দিতে হবে। শ্যামলী চলিয়া গেল।

চন্দ্রাবতী : সত্যই আশ্চর্য ওর শক্তি। মা সরস্বতীর দয়া না থাকলে এমন হয় না। আপনি ত জানেন বাবা—আমাকে সবাই বলে কীর্তনের রাণী। কিন্তু মাধবজীর মন্দিরে আমার কাছেই শেখা কীর্তন গেয়ে শ্যামলী আমাকেই অবাক করে দেয়।

গীতা : গানের সময় শ্যামলীদি কত পেলা পায় জানো দাদু—একশো টাকার বেশী!

চন্দ্রাবতী: সে টাকা ও কিছুতেই নেবেনা। তাই জোর করে ওর আঁচলে বেঁধে দিতে হয়েছিল।

গীতা: কিন্তু সে টাকা শ্যামলীদি রাখেননি মা—কাশীতে মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রামময়: শ্যামলী আমাকে সব কথাই বলেছে মা! সেজন্যে আমি ওকে আশীর্বাদ করেছি।

চন্দ্রাবতী: কিন্তু, মন্দিরের ঐ গানে শ্যামলীর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমেটির রাজবাড়ী থেকে ওর ডাক পড়েছে। ওখানে রাধাশ্যামের ঝুলনে শ্যামলীকে নিয়ে যেতে চায়। আজই তারা কথা পাকা করতে আসবে।

রামময়: আমি শ্যামলীর সঙ্গে কথা বলে তোমাকে জানাব মা!

* *
*

বাড়ীর নিচে দরজার সামনে দরদালান। শ্যামলী সদ্যপ্রাপ্ত পত্রখানি পড়িতেছে। কাশী থেকে মহামায়া দেবী রেজিষ্টারী করিয়া চিঠি পাঠাইয়াছেন। চিঠি পড়িয়া শ্যামলী জানিয়াছে—কলিকাতায় গিয়া পৌছানোর পর সেই চিঠি ছাড়া আর কোন চিঠি বা টাকা পয়সা চন্দ্রনাথ পাঠায় নাই। মহামায়া দেবীই শ্যামলীকে দুঃখ করিয়া সে কথা লিখিয়াছেন। আর সব লেখা শ্যামলীর সম্পর্কে। খোলা চিঠিখানা হাতে করিয়া শ্যামলী রামময়ের ঘরে গিয়া দেখিল, তিনি নীরবে একা বসিয়া আছেন। শ্যামলী উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল:

শ্যামলী: কি অন্যায় বলুন ত জেঠাবাবু! কলকাতায় গিয়ে সেই যে পৌছবার খবর দিয়েছিলেন চন্দরদা, তার পর আর একখানা চিঠি পর্যন্ত দেননি! মা তাই দুঃখ করে লিখেছেন—

রামময় : একটা বছরেই আমি ওকে চিনেছিলাম মা—অন্তরের সমস্ত দরদ ও গানেই ঢেলে দিয়েছে। ওর মতন আত্মভোলা লোকের পিছনে খুব শক্ত অভিভাবক না থাকলে ওকে সংসারের কাজে লাগানো যাবেনা।....হ্যাঁ, ওর জন্যে তুমি ভেবনা, ও ঠিক হয়ে যাবে। এখন তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে শ্যামল—কাছে বস।

শ্যামলী রামময়ের তক্তপোষের কাছে গিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া বলিল :

শ্যামলী : বলুন জেঠাবাবু।

রামময় : চন্দ্রাবতীর কাহিনী ত তাঁর কাছেই তুমি শুনেছ মা ?

শ্যামলী : হ্যাঁ জেঠাবাবু—উনি এক আশ্চর্য আদর্শ। বিধবা অবস্থায় গীতার হাতধরে নিরাশ্রয় হয়েও ভেঙে পড়েন নি। স্বামীর কাছে শেখা সঙ্গীত বিদ্যাকে অবলম্বন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন ! এ কি কম গৌরবের কথা ?

রামময় : ঠিক বলেছ মা ! এই যে সম্পদ দেখছ—এর সব কিছু নিজের সঙ্গীত সাধনায় সঞ্চয় করেছেন। তার পর যেই দেখলেন আর প্রয়োজন নেই—ও বৃত্তি ত্যাগ করে শিক্ষাদানকেই ব্রত করেছেন।

শ্যামলী : তার সাক্ষী ত আমি—ওঁর কাছে কীর্তন শিখে—

রামময় : ওঁকেও হারিয়ে দিয়েছ। একথা চন্দ্রাবতীই আমাকে বলেছেন। এখন আমার এই প্রশ্ন—তোমার জীবনপথে যে প্রয়োজন রয়েছে, তার সিদ্ধির জন্য চন্দ্রাবতীর আদর্শকে গ্রহণ করে নিজের প্রতিষ্ঠা—

শ্যামলী : আপনার কথা আমি বুঝিছি জেঠাবাবু ! এর উত্তরে আমি

শুধু এই কথা বলবো—অভিভাবকের দৃষ্টিতে আমার ভবিষ্যৎ দেখে—আপনি যে আদেশ করবেন তাই আমার শিরোধার্য।

রামময়: বড় সন্তুষ্ট হলাম তোমার কথা শুনে। তাহলে শোনো মা—আমার ইচ্ছা, যে সুযোগ অপ্রত্যাশিত ভাবে তোমার জীবনে এসে গেছে, তাকে সার্থক করা। একটা নির্দিষ্ট কাল তোমার এই সিদ্ধিলব্ধ বিদ্যাকে অর্থকরী করে নিজে হও প্রতিষ্ঠিতা। মানস-গুরুর উপেক্ষার অন্তরাল থেকেই তোমার মহাসাধনার দুর্বার শক্তি গুরুকেও পরাস্ত করুক—সব দিক দিয়ে তুমি হও বিজয়িনী—এই তোমার পরম গুরুর আশীর্বাদ। হ্যাঁ—আর এক কথা; এর জন্যে আপাততঃ তোমাকে আভরণের মত ধারণ করতে হবে মা—আমারি দেওয়া এক নূতন নাম।

শ্যামলী: নূতন নাম!

রামময়: হ্যাঁ—দেশের লোক শ্যামলীকে জানবেনা, তারা পাগল হবে অপরূপ এক সঙ্গীতসাধিকার নামে। সে নাম—রাগিনী! আজ থেকে তুমি হলে—রাগিনী দেবী।

শ্যামলী অবাক হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল—তাহার পর নত হইয়া পরম গুরুকে প্রণাম করিল।

* *
*

লক্ষ্ণৌ নগরী। আমেটি রাজের দেবালয়। সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণের অপরূপ যুগলমূর্তি। ঝুলন উপলক্ষে সুসজ্জিত মণ্ডপে আসর। রাজা, রাজপরিজন এবং আমন্ত্রিত অভিজাতবর্গ জাতীয় পরিচ্ছদে আসীন। কতিপয় বিশিষ্ট বাঙালীও আছেন। আসরের প্রান্তভাগে স্বতন্ত্রভাবে সাধারণ নরনারীদের

স্থান—সেখানেও বিপুল জনতা। চন্দ্রাবতী নিজে কীর্তন আসরের উপযোগিনী করিয়া শ্যামলীকে সাজাইয়াছেন। এখন শ্যামলী 'রাগিনী দেবী' নামে পরিচিতা—চন্দ্রাবতীর নিপুণ সজ্জার গুণে মূর্তিমতী রাগিনীর মতই এই আসরে সে অবতীর্ণা। তাহার ভজন গানে সকলেই অভিভূত হইয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। গানের সময় চারিদিক দিয়া রুমালে বাঁধা টাকা নোট মোহর পড়িতে লাগিল। বহুকণ্ঠে প্রশংসাধ্বনি উঠিল : সাবাস! সাবাস! বাহোবা বাহোবা। জয় রাধা শ্যামজীকি জয়! জয় রাগিনী দেবীকী জয়!

* *

*

কলিকাতা ভাদুড়ী লজ। ইন্দ্রাণীর নূতন ধরণের স্বরচিত গান সহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। তাই সহরের অভিজাতবংশীয় অভিজ্ঞ অর্গানাইজার রত্নেশ্বর রায় কোন পাবলিক হলে ইন্দ্রাণীদেবীর গানের আসর বসাইবার জন্য আসিয়াছেন ডাঃ ভাদুড়ীর কাছে। তিনি বলিতেছিলেন :

রত্নেশ্বর : দেখুন ডক্তর ভাদুড়ী, নূতন কোন প্রতিভার সন্ধান পেলেই দেশের লোকের সামনে তাকে পরিচিত করে দিয়ে আমি ভারি আনন্দ পাই। এটাও একটা কর্তব্য। আর আমার প্রচারের ওপর দেশের লোকের আস্থাও যথেষ্ট।

ডাঃ ভাদুড়ী : আমি আপনার কথা স্বীকার করি রত্নেশ্বর বাবু! অর্গানাইজার হিসেবে আপনারও যথেষ্ট খ্যাতি আছে বৈকি। দেশের লোক বিজ্ঞাপনে আপনার নাম দেখলেই—ঠিক করে নেয় যে, ব্যাপারটি সত্যি। বাজে মাল চালাবার পাত্রই আপনি নন।

রত্নেশ্বর : আমার ওপর লোকের এই বিশ্বাস আছে বলেই আমি এই ভাবে আপনার কন্যা ইন্দ্রাণীদেবীকে পাবলিসিটি করতে চাইছি যে—এমন এক আশ্চর্য রকমের মিষ্টি গান তিনি উপহার দেবেন, যা একবারে নূতন। আরও আশ্চর্য যে, গানের কথার সঙ্গে নাচের ভঙ্গিরও অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ, এবং গানগুলির লেখিকাও গায়িকা স্বয়ং।

এই সময় ডাঃ ভাদুড়ী ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে চাহিলেন—উভয়ে চোখো-চোখী হইল। ইন্দ্রাণী এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিল। এই সময় বলিল :

ইন্দ্রাণী : তাহলে কি আজই কনট্রাক্ট করবেন রত্নেশ্বর বাবু?

রত্নেশ্বর : নিশ্চয়—এখনি। আমি ড্রাফ্‌ট করে এনেছি পড়ে দেখুন। আপনি হোল কলেকসনের ওপরে একটা পার্সেণ্টেজ পাবেন। পড়ে দেখুন—

রত্নেশ্বর রায় ড্রাফ্‌টখানি ইন্দ্রাণীকে দিলেন। ডাঃ ভাদুড়ীর শিক্ষিত মনটি যে সুপ্রসন্ন হইয়াছে, তাঁহার মুখের ভাবে তাহা বুঝা গেল না। তাঁহার কন্যা 'সুগায়িকা' ইহা তাঁহার পক্ষে আনন্দের কথা। কিন্তু গানগুলির 'লেখিকা' রূপে কন্যার মিথ্যা পরিচিতি তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারে নাই—অথচ, ব্যাপারটি এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আপত্তি তোলাও মুস্কিল এবং সে সাধ্যও তাঁহার নাই। অগত্যা তাঁহাকে নীরব থাকিতেই হইয়াছে।

* *

*

ইন্দ্রাণীর সেই সঙ্গীত শিক্ষাগার। গানের আসরে বিশেষ বিশেষ ধরণের পাঁচখানি গান ইন্দ্রাণী গাহিবে। তাহা ভিন্ন নৃত্যসংযোগে একখানি

গানও থাকিবে। ছয়খানি গানই চন্দ্রনাথের রচনা। চন্দ্রনাথ প্রত্যেক গান খানি গাহিয়া এবং ইন্দ্রাণীকে শিখায়াইয়া অভ্যস্ত করিয়া লইতেছেন। নূতন যে গান খানি রাত্রে বাধিয়াছেন—ইন্দ্রাণীর অনুরোধে সেখানিও চন্দ্রনাথ গাহিয়া দিলেন। গানের সময় ইন্দ্রাণী নাচিল। এক এক স্থানে নিজেও গাহিল—কোথাও বা গুরু শিষ্যের কণ্ঠ একসঙ্গে মিশিয়া গেল। চন্দ্রনাথকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দেখিয়া ইন্দ্রাণী মনে মনে হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিল :

ইন্দ্রাণী : আর আপনাকে গাইতে হবে না—আমি ঠিক করে নিয়েছি। যে ক' খানি গান দিলেন—আপনার শিক্ষার সব কিছুই আমি কণ্ঠস্থ করে নিয়েছি। সত্যিই ভাবছি, পাবলিক এক এক খানা গান শুনে—কি বাহোবাই দেবে! হ্যাঁ, ভাল কথা—আপনি যাচ্ছেন ত?

চন্দ্রনাথ : আমি? কৈ—তা ত—

ইন্দ্রাণী : বা রে! আপনার দেওয়া গান আমি গাইব—আর আপনি থাকবেন না সে আসরে—তাকি হয়? তবে ওরা টিকিটের দাম বড্ড বেশী করেছে। সে যাই হোক, আমি একখানা টিকিট যোগাড় করে দেব—আপনাকে কিন্তু যেতেই হবে মাস্টার মশাই!

চন্দ্রনাথ : বেশ।

* *

*

সহরের এক শ্রেষ্ঠ মিউজিক হলে আসর বসিয়াছে। মঞ্চে ইন্দ্রাণীর গান চলিয়াছে। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগারে হর্ষধ্বনি। শ্রোতাদের মধ্যে প্রথমের

দিকে চন্দ্রনাথকে দেখা যাইতেছে। দর্শকবৃন্দের উল্লাসে চন্দ্রনাথের মুখখানি আনন্দে উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে।

মিউজিক হলের মঞ্চ হইতে বাহিরে আসিবার দ্বারমুখে ইন্দ্রাণীদেবীক পরিবেষ্টন করিয়া রত্নেশ্বর ও ইন্দ্রাণীর গুণমুগ্ধ অভিজাতবংশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রশংসা করিতেছিলেন। একদল ধন্যবাদ সহকারে ফুল দিতেছেন; আর একদল আলাপ করিতে উন্মুখ হইয়া আছেন। এই অবস্থায় রত্নেশ্বর বলিলেন:

রত্নেশ্বর: আমার মুখ আপনি রেখেছেন ইন্দ্রাণী দেবী!

ইন্দ্রাণী: তাহলে ভালো হয়েছে বলুন?

রত্নেশ্বর: স্টেজ থেকে সে পরিচয় পাননি! এঁরা আপনাকে অভিনন্দন দিতে এসেছেন—

১ম: নমস্কার মিস্ ভাদুড়ী!

২য়: কি গানই শোনালেন!

৩য়: নিজের লেখা না হলে কি এমন করে গাওয়া যায়!

৪র্থ: হামিলোক তাজ্জব বনিয়ে গেছে। মেহেরবানীসে লিজিয়ে ত!

মাড়োয়ারী প্রৌঢ় ব্যক্তি একটি ফুলের তোড়া ইন্দ্রাণীদেবীর হাতে দিলেন। ইন্দ্রাণী তাহা লইয়া সহাস্যে বলিলেন: ধন্যবাদ!

খানিকটা দূরে অনেকগুলি দর্শকের সঙ্গে দাঁড়াইয়া চন্দ্রনাথও ইন্দ্রাণীর সম্বর্দ্ধনা দেখিতেছিল সে তাড়াতাড়ি ইন্দ্রাণী দেবীর দিকে আগাইয়া যাইতেই বাধা পাইল। এক ব্যক্তি জামা ধরিয়া টানিয়া বলিল:

১ম: ওকি, অমন করে ছুটছেন কোথায়?

চন্দ্রনাথ: আঃ! ছাড়ুন। দেখছেন না—ইন্দ্রাণী দেবীর কাছে যাচ্ছি।

১ম: আপনার দেখছি মাথা খারাপ হয়েছে; ইন্দ্রাণী দেবী আপনার সঙ্গে দেখা করবেন?

চন্দ্রনাথ: কি বললেন? আপনি কি ভেবেছেন আমাকে? জানেন—যে সব গান ওঁর মুখে শুনলেন, সে সব আমার বাঁধা? আমার ছাত্রী উনি!

কথাটা শুনিয়া পার্শ্বের লোকটি চমকাইয়া উঠিয়া বলিল: তাই নাকি! কিন্তু যে ব্যক্তি জামা ধরিয়া টানিয়া বাধা দিয়াছিল, সে মুখ বাঁকাইয়া বলিল: কাকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছেন শুনি? বুজরুকির জায়গাপাননি?

চন্দ্রনাথ: বুজরুকি! কি বললেন?

সেই ব্যক্তি আর্ট পেপারে ছাপা প্রোগ্রামখানা চন্দ্রনাথের সামনে ধরিয়া বলিল: এই যে দেখেন!

চন্দ্রনাথ পড়িল: রচনা—গায়িকা মিস্ ইন্দ্রাণী ভাদুড়ী। তাহার মনে হইল যে, পায়ের তলা হইতে রঙ্গভূমির কন্‌ক্রিটের মেঝেটি নামিয়া যাইতেছে! তাহার রচিত গানের পাশে রচয়িত্রীরূপে ইন্দ্রাণীর নাম ছাপা হইয়াছে!

১ম ব্যক্তি: কি মশাই! চোখ যে ছানাবড়া হয়ে গেল!

২য় ব্যক্তি: ধরে নিয়ে যাব ইন্দ্রাণী দেবীর কাছে?

৩য় ব্যক্তি: ডাকব পুলিস?

কি বলিবে চন্দ্রনাথ? মুখ তাহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি মুখখানা ফিরাইয়া সে দ্রুতপদে ফটকের দিকে ছুটিল।

১ম ব্যক্তি: কত রকমেরই পাগল আছে!

২য় ব্যক্তি: ইন্দ্রাণী দেবীকে দেখে ক্ষেপে গেছে বেচারী!

কথাগুলি চন্দ্রনাথের কানে ভাসিয়া আসিতেছিল; তাহার মনে হইতেছিল—আর্ত স্বরে সে বলিয়া উঠে: ধরিত্রী দ্বিধা হও, আমি তোমার উদরে প্রবেশ করি।

* * *

রাজপথ। ইন্দ্রাণী রায়ের অভিনব গানের খ্যাতি খবরের কাগজে ছাপিয়া বাহির হইয়াছে সকালে। লোকে কাগজ পড়িতেছে। বড় বড় হরফে হেডিং ছাপা হইয়াছে: সঙ্গীত জগতে যুগান্তর! সুরের যাদুকরী! ছন্দের ইন্দ্রজাল! স্বরচিত গানের অপরূপ রূপ দিয়া ইন্দ্রাণী ভাদুড়ী জাতির চিত্ত জয় করিয়াছেন!

পথচারী পাঠকদের মধ্যেও এ সম্পর্কে আলোচনা চলিয়াছে:

জনৈক পাঠক: (কাগজ দেখিয়া) কালকের গানের কথা বেরিয়েছে রে!

একজন পথচারী: কি লিখেছে মশাই?

পাঠক: (কাগজ পড়িতে থাকে) সঙ্গীত জগতে যুগান্তর! সুরের যাদুকরী! ছন্দের ইন্দ্রজাল! স্বরচিত গানের অপরূপ রূপ দিয়া ইন্দ্রাণী দেবী সঙ্গীতামোদীদের চিত্ত জয় করিয়াছেন।

* *
*

চন্দ্রনাথ তাহার বাসায় বিছানায় বসিয়া সংবাদপত্র খুলিতেই সংবাদটি প্রথমে চোখে পড়িল। সেই সঙ্গে নির্গত হইল পাঁজরভাঙ্গা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস। কাগজ রাখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া চন্দ্রনাথ জামা গায়ে দিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মঙ্গল আসিয়া বলিল:

মঙ্গল: জামা গায়ে দিচ্ছ যে! চানটান না করে এখুনি কোথায় যাওয়া হবে? এর পর কলের জল চলে যাবে যে!

চন্দ্রনাথ: এখুনি আসছি।

মঙ্গল: চানটা সেরে চা খেয়ে বেরুলে হোত না?

কোন জবাব না দিয়া হনহন করিয়া চন্দ্রনাথ নিচে নামিয়া গেল। আপন মনে মঙ্গল বলিতে থাকিল:

মঙ্গল: একটা কিছু হয়েছে! নৈলে এরকম মুখ ভার ত বড় একটা দেখি নে।

* *

*

সংবাদপত্রের মন্তব্য ইন্দ্রাণীও পড়িয়াছে। সঙ্গীতদর্পণ পত্রিকাখানি হাতে করিয়া সোল্লাসে সে ডাঃ ভাদুড়ীর কাছে গিয়া বলিল:

ইন্দ্রাণী: এই দেখ বাপি, সঙ্গীতদর্পণে আমার ছবি ছেপেছে—আর নাচের সেই গানখানা!

ডাঃ ভাদুড়ী: এক দিনেই তুমি বিখ্যাত হয়ে পড়েছ বেবি! কিন্তু আমি ভাবছি মাষ্টারের কথা—

ইন্দ্রাণী: ও বোকারামকে আমি এক চালে মাত করে দেব বাপি—ওর জন্যে তুমি কিছু ভেবো না।

এই সময় ভৃত্য নীলু আসিয়া খবর দিল:

নীলু: মাষ্টারবাবু নিচে বসে আছেন দিদিমণি—আপনাকে খুঁজছেন।

ডাঃ ভাদুড়ী কন্যার দিকে চাহিলেন।

ইন্দ্রাণী: রূপোর প্লেটে ও-ঘরে মাষ্টার মশায়ের জন্যে খাবার সাজিয়ে রেখেছি—শিগগীর নিয়ে যা! আমি কাপড়খানা পালটে যাচ্ছি।

* *

*

ইন্দ্রাণীর সঙ্গীত শিক্ষাগার। চন্দ্রনাথ অপ্রকৃতিস্থ ভাবে কক্ষমধ্যে

পদচারণা করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে কার্পেটমণ্ডিত সোপানশ্রেণীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। একটু পরেই একখানা আসনে বসিয়া পড়িল উদাসভাবে। তাহার মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলিতেছে। এমনি সময় নীলু রূপার রেকাবিতে বহুবিধ মূল্যবান খাবার—তাহার সামনে টিপয়ে রাখিল। চন্দ্রনাথের মনে হইল খাদ্যগুলি যেন অগ্নিপিণ্ড; সে উঠিয়া আর একখানা চেয়ারে গিয়া বসিল।

নীলু নীরবে বিস্ময়ে মাষ্টারের ভাবভঙ্গি দেখিতেছিল। বলিল:

নীলু: দিদিমণি যে আপনার জন্যেই পাঠিয়ে দিলেন মাস্টার মশাই! আপনি উঠে গেলেন কেনে? খান—দিদিমণি কাপড় ছেড়ে আসতিছেন।

চন্দ্রনাথ: তুমি যাও এখান থেকে।

নীলু বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া চলিয়া গেল।

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চাহিতেই চন্দ্রনাথ দেখিল—ইন্দ্রাণী কার্পেট মণ্ডিত সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে—তাহার বেশভূষা আজ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক) হইলেও শালীনতার পরিপন্থী। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে ঠিক সামনের দিকে চন্দ্রনাথকে দেখিয়া সোল্লাসে ইন্দ্রাণী বলিল:

ইন্দ্রাণী: জানতাম, আপনি সকালেই আসবেন—তাই খাবাব সাজিয়ে বসেছিলাম। চন্দ্রনাথ (মুখনানা আরও গম্ভীর করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল একই ভাবে)।

ইন্দ্রাণী: নিকটে আসিয়াই চন্দ্রনাথের গম্ভীর মুখ দেখিয়া সহসা স্থিরভাবে দাঁড়াইল এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অবস্থা বুঝিয়া চটুল ভঙ্গিতে বলিল:

ইন্দ্রাণী: আমার যে আজ কি আনন্দ তা কাকে বলি? নাম পেয়েছি

খ্যাতি পেয়েছি, হয়েছি গানের রাণী! কিন্তু কার জন্যে? সে তুমি—তুমি! মাস্টার মশাই—তুমি!...

শেষের কথাগুলি বলিতে বলিতে একেবারে চন্দ্রনাথের গায়ের উপরে আসিয়া পড়িল এবং মুখ দেখিয়া চমকিয়া উঠিবার কৃত্রিম ভঙ্গিতে চাহিয়া রহিল। চন্দ্রনাথও এই প্রথম ইন্দ্রাণীর মুখে তুমি শুনিয়া এবং আকস্মিকভাবে তাহার গাঢ় সংস্পর্শে চমকাইয়া সোজা হইয়া বসিল।

ইন্দ্রাণী: (কৃত্রিম বিস্ময়ে) ও-মা! একি? আমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে মনের কথা বলছি; আর তুমি মুখখানা ভার করে মুখের পানে চেয়ে আছ! কি হয়েছে মাস্টার মশাই?

চন্দ্রনাথ: আমার চেয়ে সে তুমি ভালো জানো! দুঃখে অপমানে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে—আর তুমি...

ইন্দ্রাণী: আমি! কি করিছি ...

চন্দ্রনাথ: জানোনা? কিন্তু জানো—তুমি আমাকে লুকালেও, আমি সত্য কথা বলতে গিয়ে...আমার গান তুমি গেয়েছ—একথা আমার মুখে শুনে....ওরা কিভাবে আমাকে লাঞ্ছিত করেছে? লজ্জায় অপমানে ঘৃণায় আমি...

ইন্দ্রাণী: (খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল)

চন্দ্রনাথ: কি! আমার কথা শুনে তুমি হাসছ? লজ্জা করছে না? আমার লেখা গান নিজের বলে প্রোগ্রামে ছাপানো—কোন্ দেশী ভদ্রতা আমাকে বলতে পারো?

ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বক্তব্যট। চন্দ্রনাথ বলিতে আরম্ভ করিতেই মুখখানা হাস্যে ও বিস্ময়ে অপূর্ব করিয়া ইন্দ্রণী বলিল:

ইন্দ্রাণী: এই কথা! এই জন্যেই মাথা গরম করে গোমড়া মুখে বসে আছ—তাকি আমি জানি!

পরক্ষণে দেরাজ হইতে গোলাপজলের বাহারী বোতল একটি বাহির করিয়া কোস কোস করিয়া গোলাপজল চন্দ্রনাথের মাথায় মুখে চাপড়াইয়া চোখে দিতে দিতে বলিতে লাগিল :

ইন্দ্রাণী : আচ্ছা—বলত, গানগুলো তুমি বেধেছ, সুর দিয়েছ, আমাকে শিখিয়েছ—এ সব কথা প্রোগ্রামে ছাপা হলে এত টিকিট বিক্রী হোত? আমি ছাড়া তোমাকে কলকাতায় নাম করবার মত কজন লোক চেনে বলত? আমার নামেই তোমার গান বর্তে গেছে তা জানো? নাম নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাবো? এখন দেখছি—গানগুলো মুখেই দিয়েছিলে—মন দিয়ে দাওনি! নামটাই শেষে এত বড় হলো! আর আমার এত দরদ, এত প্রীতি, মায়া মমতা ভালোবাসা—সব বাজে, তার কিছু দাম নেই....ও।

শেষের কথা বলিতে বলিতে ইন্দ্রাণীর গলা গাঢ় হইয়া আসিল। তাহার এই অভিনয় নারী-হৃদয়ের সত্যকার অভিব্যক্তি ভাবিয়া মূঢ় চন্দ্রনাথও অভিভূত হইয়া পড়িল এবং বদ্ধ দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল ইন্দ্রাণীর বেদনাহত মুখখানার দিকে।

সহসা ইন্দ্রাণী ছুটিয়া গিয়া দূরের টেবিল হইতে খাবারের ডিসটি লইয়া চন্দ্রনাথের সামনের টিপয়ের উপর রাখিয়া ভাবাদ্রস্বরে বলিতে লাগিল :

ইন্দ্রাণী : আসবে জেনে সহরের ভালো ভালো খাবার—যা যা তুমি ভালবাস, আনিয়ে ডিসে সাজিয়ে রেখেছিলাম—তুমি স্পর্শও কর নি! এতই কি আমি অপরাধ করেছি?

চন্দ্রনাথ : আমাকে মাপ কর ইন্দ্রাণী—আমি বুঝতে পারি নি।

ইন্দ্রাণী : তা আমি জানি। ঐ বখাটে হতচ্ছাড়াগুলো তোমার মাথা গুলিয়ে দিয়েছিল!

সহসা ডিস হইতে খাবার তুলিয়া লইয়া চন্দ্রনাথের মুখে গুঁজিয়া দিতে দিতে অত্যন্ত দরদভরা স্বরে ও ভঙ্গিতে ইন্দ্রাণী বলিল :

ইন্দ্রাণী : খাও নৈলে আমি নিজে খাইয়ে দেব…

চন্দ্রনাথ : (বিব্রতভাবে) আমি খাচ্ছি—খাচ্ছি।

চন্দ্রনাথ খাইতে লাগিল। ইন্দ্রাণী দেরাজ খুলিয়া সুদৃশ্য একটি ভেলভেটের বাক্সের ভিতর হইতে সোনার রিষ্ট ওয়াচ বাহির করিল। এবং সেটি তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল :

ইন্দ্রাণী : দেখছ ?

চন্দ্রনাথ : (ইন্দ্রাণীর দিকে চাহিয়া) কি ওটা ?

ইন্দ্রাণী : গুরু দক্ষিণা। না বলতে পারবে না কিন্তু। এসো—নিজের হাতে তোমার হাতে পরিয়ে দিই।

ইন্দ্রাণী চন্দ্রনাথের হাতে—নিজের সুকোমল দুটি হাতের চাপ ইচ্ছাপূর্বক নিবিড়ভাবে দিতে দিতে—রিস্টওয়াচটি পরাইয়া দিল। চন্দ্রনাথ চাহিয়া রহিল মুগ্ধ দৃষ্টিতে। ঘড়ি পরাইতে পরাইতে চটুল দৃষ্টিতে চাহিয়া আবদারের সুরে ইন্দ্রাণী বলিল :

ইন্দ্রাণী : আজ কিন্তু এখুনি ছাড়ছি না—এক সঙ্গে আমরা লাঞ্চ খাব !

* *

*

লক্ষ্ণৌএর বাড়ী। শ্যামলীর আশ্চর্য প্রতিষ্ঠা লইয়া চন্দ্রাবতী এবং রামময় আলোচনা করিতেছিলেন :

চন্দ্রাবতী : কি শুভক্ষণেই ওকে রাগিণী নাম দিয়েছিলেন আপনি ! এত শিগগীর লোকের মুখে মুখে এমন করে নাম রটতে

কখনো দেখিনি। আর—এক সঙ্গে লক্ষ্মী-সরস্বতীর এমন দয়াও কেউ পায়নি।

রামময়: কিন্তু ওকে যে পেতেই হবে—নিজের প্রতিষ্ঠা আর জীবন-সংগ্রামে জয়লাভের জন্যে। ওর যে প্রয়োজন হয়েছে মা—খ্যাতির সঙ্গে অর্থ। আমি ভেবেছি—এখন থেকে ওর দক্ষিণার হার পাঁচশো থেকে হাজারে তুলে দেব।

এই সময় সঙ্গীত-দর্পণ হস্তে গীতা প্রবেশ করিয়া বলিল:

গীতা: দাদু! ভারি আশ্চর্য কাণ্ড। এ মাসের সঙ্গীত-দর্পণে কলকাতার গায়িকা ইন্দ্রাণী ভাদুড়ীর একখানি ছবি আর গান ছেপেছে। গানখানি নাকি তাঁর নিজের বাঁধা; কিন্তু মজা এই—শ্যামলীদির মুখেও এই গান শুনেছি। তিনি বলেন, চন্দ্রনাথ বাবু এ গান বেধেছিলেন।

রামময়: গানখানা কি বলত দিদি—

গীতা চন্দ্রনাথের রচিত সেই মানসী গানখানির একটি পংক্তি বলিতেই রামময় বলিলেন:

রামময়: তাইত! এ যে চন্দ্রনাথের গান—তার মুখে আমিও শুনেছি।

এই সময় আর একখানি গানের কথা ও সুর কক্ষান্তর হইতে ভাসিয়া আসিল এই কক্ষে অস্পষ্টভাবে। কানে তাহা প্রবিষ্ট হইবামাত্র রামময় অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে চমকিত হইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: কে—কে—কে গাইছে এ গান? কে গাইছে?

পরক্ষণে শ্যামলীর কণ্ঠোচ্চারিত সুপরিচিত একখানি গানের প্রথম ছত্রটি পুনরায় সুস্পষ্টভাবে শোনা গেল; অতি বিস্ময়ে রামময় চমকিয়া উঠিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সকন্যা চন্দ্রাবতীও বিস্মিতা হইলেন।

চন্দ্রাবতী: শ্যামলী—

রামময় : শ্যামলী ! শ্যামলী গাইছে ? সে এ গান পেল কোথায় ? কোথায় পেল ? চলত, চলত,—

তিনি যে অন্ধ, সে কথা ভুলিয়া গিয়া উত্তেজিত ভাবে উঠিবার জন্য উদ্যত হইলেন। চন্দ্রাবতী তাড়াতাড়ি তাঁহাকে দুই হাতে ধরিয়া বলিলেন :

চন্দ্রাবতী : বেশত, গীতা গিয়ে শ্যামলীকে এখানে ডেকে আসুক না।

তেমনি উত্তেজিত ও ব্যগ্রকণ্ঠে রামময় বলিলেন :

রামময় : না-না-না- আমাকে নিয়ে চল, হাত ধরে নিয়ে চল দুজনে—আমিই তার কাছে গিয়ে শুনব।

চন্দ্রাবতী ও গীতা দুইপাশে থাকিয়া রামময়কে ধরিয়া লইয়া চলিলেন।

* *
*

শ্যামলী তখন তাহার ঘরে একখানি সতরঞ্চি মেঝে বিছাইয়া তাহার উপর বসিয়া তানপুরা বাজাইয়া সেই গানখানি গাহিতেছিল—চন্দ্রনাথ কলিকাতায় যাইবার সময় উপেক্ষাভরে যে গানখানি তাহাকে দিয়াছিল। চন্দ্রাবতী ও গীতা যে রামময়কে দুই দিক দিয়া ধরিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়াছেন এবং তন্ময় হইয়া তাহার সিদ্ধ ও মধুর কণ্ঠের গান পিছনে দাঁড়াইয়া শুনিতেছেন, শ্যামলী তাহা জানিতে পারে নাই। গান শেষ হইলে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে রামময় জিজ্ঞাসা করিলেন :

রামময় : এ গান তুমি কোথায় পেলে ? কি করে পেলে ? এ সুর কে দিলে ?

চমকিয়া ফিরিয়া ইঁহাদিগকে দেখিয়া শ্যামলী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল : জানতাম জেঠা বাবু, একদিন এর জবাবদিহি করতে হবে। কলকাতা যাবার সময় চন্দরদা আমাকে একটা তানপুরা আর এই

গানখানি দিয়ে বলেছিলেন—এই দিয়ে গলা সাধতে; ফিরে এসে তিনি আমাকে গান শেখাবেন। গানখানি যে আপনার বাঁধা, আর তাঁর পক্ষে গাওয়া নিষিদ্ধ—তাও বলেছিলেন তিনি।

রামময়: তাহলে বলেছিল? জানো মা, একশোর ওপর নামকরা গায়ক-গায়িকাদের সাধা গলায় আমার এই সেরা গানখানি শুনেছি—কিন্তু সবাই ফেল করেছে। কারুর গলার সঙ্গে গানের সুরের মিল হয়নি—আমারো নয়। তাই, এই গানকে বন্ধ করে রেখেছিলাম; আজ তুমিই তাকে অন্ধ কারা থেকে মুক্তি দিলে, আর আমাকে মুগ্ধ করলে আমার বাঞ্ছিত গানখানি তোমার সুধাকণ্ঠে শুনিয়ে। তোমার এই সিদ্ধির জন্যে আমি তোমাকে উপাধি দিলাম—সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী।

* *
*

ভাদুড়ী-ভিলা। ডাঃ ভাদুড়ীর কক্ষে লক্ষ্ণৌএর রাগিণী দেবীকে লইয়া আলোচনা চলিয়াছে। লক্ষ্ণৌসহরের এই নবাগতা গায়িকার সর্বদিক-প্রসারিণী প্রতিভার কথা সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের সঙ্গীতাচার্যগণ এই গায়িকাকে সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী আখ্যায় অভিহিত করায় ইন্দ্রাণী দেবীর গাত্র-দাহের কারণ হইয়াছে। তাহার খ্যাতিকে ম্লান করিবার জন্যই এই সব কাণ্ড করা হইতেছে, আসলে ঐ রাগিনদেবী ভুঁইফোঁড় ছাড়া কিছু নয়, ইহাই ইন্দ্রাণীর ধারণা।

রত্নেশ্বর: ভুইফোড়ই বা কি করে বলি! ইউ, পি'র লিডিং পেপার 'লীডারে' ত মস্ত কাহিনী বেরিয়েছে এই রাগিণী দেবীর। আগে ৫০০৲ প্রতি আসরে দক্ষিণা নিতেন, কিন্তু সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী হবার পরে সে রেট ডবল হয়েছে। তাতেও স্নানাহারের সময় পান না!

ইন্দ্রাণী : সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী হওয়া অমনি মুখের কথা কিনা! কি করে হলো ?

ডাঃ ভাদুড়ী : ওখানকার গানের আসরে আর সবাইকে হারিয়ে দিয়ে এই খেতাবটি পেয়েছেন, এই আর কি!

কুঙ্কুম : আপনিও তো ছাতুর দেশের মানুষ মিঃ লাহিড়ী, চেনেন এই রাগিণী দেবীকে ?

চন্দ্রনাথ : ও নাম ত কখনো শুনিনি—আর আমার জ্ঞাতসারে সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী ও-দেশে কেউ কোনদিন হননি।

ইন্দ্রাণী : শুনলেন ত! নিশ্চয়ই এ ভুঁইফোড় মিঃ রায়। ছাতুর দেশে সবই হয়।

নিখিল : আমরা তাহলে এখন থেকে ইন্দ্রাণী দেবীকে সঙ্গীত-অধিরাজ্ঞী বলে প্রচার করবো।

বন্ধু-বান্ধবীরা : হিয়ার, হিয়ার।

রত্নেশ্বর : তা করুন—এতে আমার পাবলিসিটির সুবিধাই হবে। সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী রাগিণী দেবীর সঙ্গে সঙ্গীত-অধিরাজ্ঞী ইন্দ্রাণী দেবীর সঙ্গীত-সংগ্রামের খবর বেরুলে যত বড় প্যাণ্ডেলই বাঁধিনা কেন—জায়গা দিতে পারব না। তাহলে, রাগিণীদেবী রাজী আছেন ত ?

নীলিমা : রাজী হবেন না মানে? এখানকার আসরে ঐ ভুঁই-ফোড়ের কাছ থেকে সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী খেতাবটি কেড়ে নিতে হবে না ?

বন্ধু ও বান্ধবীরা : হিয়ার, হিয়ার!

* *

*

রাগিনী দেবীর সম্বন্ধে সংবাদ পত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কিছুই অতিরঞ্জিত নয়। আমেটির রাজবাড়ীতে সেই ঝুলনের আসরে গানে যে অসামান্য খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা লাভ করে শ্যামলী—তাহা সমগ্র প্রদেশে বিদ্যুতগতিতে ছড়াইয়া পড়ে। অতুলনীয় কণ্ঠ-সম্পদ, তত্ত্বগত সাঙ্গীতিক প্রতিভা, রসরুচির অপূর্ব নৈপুণ্য, প্রত্যেক আসরে যেন সুরের শতদল বিকশিত করিয়া সকল শ্রেণীর শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তাহার সুপ্রাচীন মনীষামণ্ডিত বৈদগ্ধময় অবদান—ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, ভজন, টপ্পা প্রভৃতির আলাপে অদ্ভুত পারদর্শীতার জন্য এই প্রতিভাময়ী গায়িকা সর্ব্বভারতীয় গুণী কলাকারদের মধ্যে পরম সম্মানীয় আসন লাভ করিয়া মহিমময়ী হইয়া উঠে। তাহার গাম্ভীর্যময় অসীম সৌন্দর্য, রাজ্ঞীর মত মর্যাদা এবং প্রত্যেক আসরে দৃঢ় নিয়মানুবর্তিতা তাহাকে সর্বজনশ্রদ্ধেয়া করিয়া তুলে। সেই সঙ্গে অর্থাগমের অঙ্ক পূর্ববর্তী সর্বশ্রেষ্ঠা গায়িকার উপার্জনের মানকেও অতিক্রম করিয়া বহু উর্ধে উঠিতে থাকে।

রত্নেশ্বরের উক্ত প্রস্তাব রাগিনীদেবীর কাছেও আসিয়াছে। সেই সম্বন্ধেই.আলোচনা চলিয়াছে। রামময় বলিতেছিলেন :

রামময় : কল্পনা যে কত বাস্তব হতে পারে—কলকাতার মিউজিক অরগানাইজার রত্নেশ্বর রায়ের প্রস্তাবটি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। ইন্দ্রাণীদেবীর গানের খ্যাতির সঙ্গে চন্দ্রনাথের রচা গান তার নামে ছাপা হতেই—আমার মনে হয়েছিল, কলকাতার কোন গানের আসরে ইন্দ্রাণী ও রাগিণী দুজেনে যদি মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ায়—তাহলেই এ রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে। আমার সে কল্পনা বাস্তব হয়েছে।

চন্দ্রাবতী : আমার মনে হয়—চন্দ্রনাথ বাবুর আধুনিক গানগুলি কৌশলে

আদায় করে নিয়ে এই মেয়েটি এত শিগগীর এ রকম খ্যাতি পেয়েছে।

রামময়: এখন আমার কথা হচ্ছে মা, শ্যামলীকে এ-কদিনের মধ্যে নাচটাও শিখে নিতে হবে। গীতাকে ত তুমি বড় বড় নাচিয়ে এনে নাচ শিখিয়েছে, নাচে ও পাকা হয়েছে। শ্যামলী ওর কাছে নাচ শিখুক।

শ্যামলী: বেশ ত, আজ থেকেই তাহলে শিক্ষা সুরু হোক।

* *
*

কাশী গামী ট্রেণের এক খানি রিজার্ভ কামরা। রামময়, চন্দ্রাবতী, শ্যামলী ও গীতা। শ্যামলীর অনুরোধে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, কাশী হইয়া সকলে কলিকাতায় রওনা হইবেন। ট্রেণের রিজার্ভ কামরায় বসিয়া শ্যামলী বলিতেছিল:

শ্যামলী: এই লক্ষ্ণৌ এক্সপ্রেসে এক বছর আগে কত বড় দুশ্চিন্তা নিয়ে কাশী ছেড়ে আসি!

রামময়: ভাগ্যের এমনি খেলা—সেই তুমি আজ খ্যাতি সম্পদ আঁচলে বেঁধে কাশীতে ফিরে চলেছ নিজের পায়ে নিজে ভর দিয়ে—রাণীর মত গরবিনী হয়ে।

শ্যামলী: আমার ভাগ্যের পথ ত আপনারাই খুলে দিয়েছেন। তাই আপনাদের ছাড়তে পারিনি। আমার এই ভাগ্যোদয়ের কথা মাসীমাকে আমি কি বলতে পারি জেঠাবাবু!

রামময়: যা বলবার আমি বলব, তোমার সেজন্ত কোন চিন্তা নেই শ্যামলী।

* * *

লক্ষ্ণৌ হইতে কাশী যাইবার পূর্বেই শ্যামলী মহামায়া দেবীকে পত্রযোগে সবিশেষ জানাইয়াছিল। সে পত্র এইরূপ :

"মাসীমা। আমার জেঠা বাবু এখন সুস্থ হইয়াছেন। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে তাঁহাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে, আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবেন। কিন্তু আমার মন কাশীতে পড়িয়া আছে। আমি বলিয়াছি, যাইতেই যদি হয়, কাশী হইতে মাসীমাকেও সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় যাইব—চন্দরদার সহিত বোঝাপড়া করিবার জন্য। চন্দ্রদাকে আমার জেঠাবাবু খুব চিনেন। তিনি সম্মত হইয়াছেন। তাঁহারও একান্ত ইচ্ছা, আপনার সহিত দেখা করিয়া পরামর্শ করেন। আপনাকে অনেক কথা তিনি বলিবেন। আমার জেঠাবাবু চক্ষু হারাইয়াছেন। বাহিরের ঘরখানি তাঁহার জন্য ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া রাখিতে কামিনী দিদিকে বলিয়া দিবেন। জেঠাবাবুর কন্যা ও নাতনী সম্পর্কীয়া আর দুইজনও আমাদের সহিত যাইতেছেন। আপনি যেন তাঁহাদের জন্য ব্যস্ত হইবেন না; ভাবিবেন যে, আপনার এক বিধবা বোন ও বোনঝি আপনার কাছে যাইতেছেন।"

কাশী যাত্রার সময় চন্দ্রাবতী দেবী রামময়ের নির্দেশমত সঙ্গীত সম্পর্কে যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র এবং কলাশিল্পীদিগকে সরাসরি কলিকাতায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া যান। সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা রত্নেশ্বর রায় পূর্বেই জানাইয়াছিলেন যে, রাগিণী দেবী সদলবলে তাঁহার চৌরঙ্গীর বাড়ীতে উঠিবেন—তাঁহাদের জন্য বৃহৎ বাড়ীর একটি স্বতন্ত্র অংশ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট থাকিবে। তদনুসারে লোকজনদের পূর্বেই পাঠাইয়া রত্নেশ্বরবাবুকে জানানো হয় যে, রাগিণীদেবী তাঁহার কতিপয় বিশিষ্ট সম্মানীয় পরিজনদের সহিত কাশী হইয়া রওনা হইবেন।

সদলবলে কাশী যাইবার সময় পাচক, দাস, দাসী, চাপরাসী এবং

ন বর্কন্দাজ চন্দ্রাবতীর সহিত যাইতে আদিষ্ট হয়। লক্ষ্ণৌ সহরে বরাবরই তিনি রাজ্ঞীর মত খানদানী চালে চলিতে অভ্যস্ত থাকায়, এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। শ্যামলীকেও তিনি এ-সম্পর্কে উপদেশ দিয়াছেন—যতদিন কলালক্ষ্মীর পূজারিণী রূপে আসরে নামিবার কথা অদৃষ্টে লেখা আছে, রাজলক্ষ্মীর মত ঐশ্বর্যময়ী হয়ে লোকের চোখে সম্ভ্রম-বোধ জাগাতে হবে। লোক-চক্ষু পলক হারিয়ে তোমার পানে চেয়ে থাকবে, তুমি কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করবে না কাউকে—তা যত বড় মানী লোকই আসরে থাকুন না কেন। সর্বক্ষণ মনে রাখবে—মহিমময়ী কলা-দেবী জ্ঞানে সবাই করছে সর্বাগ্রে তোমাকে বন্দনা—তার উত্তরে প্রসন্ন হয়ে তুমি স্বধু সমবধানের দৃষ্টিতে তাকাবে। কলা-লক্ষ্মীর পূজা যতক্ষণ চলবে, গানের কথার সঙ্গে হাসি উল্লাস হর্ষ কান্না বিষাদ—প্রত্যেকটি ফুটিয়ে তুলবে মুখের ভঙ্গির সঙ্গে। কিন্তু তারপর—আলাপ করতে আসবে যখন মুগ্ধ ভক্তের দল, তখন হাসি হর্ষ উল্লাস সমস্ত চেপে রাখবে গাম্ভীর্যের আবরণে। লোকে স্বধুই শুনবে তোমার গান—গানের মধ্যেই তোমাকে চিনবে, জানবে, বুঝবে, ভাববে; কিন্তু গানের পরেই তোমাকে হতে হবে—মূক। তোমার কথা কেউ শুনতে পাবেনা। যে কেউ কিছু প্রশ্ন করবে, তার জবাব দেবে তোমার আয়া—তার কাজই হবে তোমাকে আগলে থাকা, লোকের প্রশ্নের আড়ালে রাখা।

চন্দ্রাবতীর প্রতিটি উপদেশ যেন কণ্ঠস্থ করিয়াই শ্যামলী কলা-লক্ষ্মীর সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছে—কোথাও কোনদিন ইহার ব্যতিক্রম বা ভুলচুক হয় নাই।

লক্ষ্ণৌ হইতে শ্যামলীর চিঠি পড়িয়া মহামায়া দেবী যেমন আনন্দিত হন, তেমনই চিন্তিতও ছিলেন—শ্যামলীর জেঠাবাবু তাঁহাকে কি সব কথা বলিবেন—কে জানে! কিন্তু তাঁহাদের আসিবার পর জেঠাবাবুর পরিচ

পাইয়া এবং তাঁহার মুখে সকল কথা শুনিয়া এখন তিনি আশ্বস্ত হইয়াছেন। মহামায়াকে রামময় শ্যামলীর প্রতিভা এবং সাঙ্গীতিক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও সব কথাই বলিয়াছেন এবং ব্যাপারটি গোপন রাখিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

বাহিরের ঘরে কথা-প্রসঙ্গে মহামায়া দেবী রামময়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন :

মহামায়া : তিন বন্ধুর ছবিই দেখিছি! ছবির মানুষ তিনটিকে এক সঙ্গে দেখবার কত ইচ্ছাই ছিল। শ্যামলীর বাবা এসেছিলেন, আপনিও এলেন; কিন্তু ইহলোকে তিনজনের আর মিলন হলো না!

রামময় : আমিও না থাকার মধ্যেই বৌঠান। চোখ নেই—কোন রকমে প্রাণটাকে ধরে রেখেছি। সুদিনের মহীয়সী শিষ্যা চন্দ্রাবতী—দুর্দিনের গুণবতী কন্যা হয়ে আমার ভার নিয়েছেন। তার পরেই এই যোগাযোগ। শ্যামলীর অদৃষ্টের কথা সব ত শুনলেন—আশ্চর্য আর অসম্ভব হলেও সত্য।

মহামায়া : আমি জানতুম ঠাকুরপো, দেবী অংশে শ্যামলীর জন্ম; ওর পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়। মা যে আমার শক্তিময়ী, তাই সর্বজয়ী; সব দিকেই ওঁর দৃষ্টি। নিজের ছেলের কথা সব ত বলেছি! কিন্তু শ্যামলীর গুণের কথা মনে হলে....

ভাবের আবেগে মহামায়া দেবীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল।

চন্দ্রাবতী : চোখের জল ফেলে ছেলের অকল্যাণ করবেন না দিদি! ছেলে আপনার পাকে চক্রেই যে এ রকম হয়েছেন তাতে ভুল নেই। অপরে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে কাজ বাগিয়ে নিচ্ছে বলেই এই কাণ্ড হয়েছে।

শ্যামময়: এখন চন্দ্রনাথকে উদ্ধার করতে হবে, আর শ্যামলীই তা পারবে। কিন্তু আপনাকেও প্রয়োজন হবে বৌঠান।

শ্যামলী: কলকাতায় গিয়ে কোন কষ্ট বা অসুবিধা আপনার হবে না।

মহামায়া: আমার কষ্ট, আমার অসুবিধা—তুমি থাকতে! কাছে না থেকেও আঁতের দরদ দিয়ে মায়ের কথা ভেবেছ—পেটের ছেলেও যা ভাবেনি। তাই ভাবি, আর জন্মে বুঝি তুমিই আমার মা ছিলে!

* *
*

মহামায়ার ঘর। শ্যামলী শিবানীর কথা জিজ্ঞাসা করায় মহামায়া বলেন—শিবানীর জন্যে একটি ভালো পাত্র পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু চার হাজার টাকা দিতে হবে। এই টাকার জন্যে বাড়ীখানা নষ্ট করা ছাড়া আর উপায় নেই শুনেছি। শ্যামলী বলে—মাসীমা, তা হবে না, মেয়েরা এত হেনস্তা নয় যে, বিয়ে দেবার জন্যে সর্বস্বান্ত হতে হবে। মাসীমার সঙ্গে এই সম্বন্ধেই কথা চলিয়াছে:

মহামায়া: শিবানীর বিয়ের সবই ত ঠিকঠাক হয়েছিল—ছেলেও পছন্দ-সই, দেখতে শুনতে দিব্যি, ব্যাঙ্কে চাকরী করে,—দেড়শো টাকা মাইনে; কিন্তু খাঁই বেজায়—চার হাজার চায়! অত টাকা ঠাকুরপো কোথায় পাবেন—এখন তাই টাকা টাকা করে হন্নে হয়ে বেড়াচ্ছেন!

শ্যামলী। মা!!

স্বরে আকৃষ্টা হইয়া মহামায়া চাহিয়া রহিলেন নীরবে।

শ্যামলী: মা! শিবানীর বিয়ে আপনিই দিয়ে দিন!

মহামায়া: আমি! এক একবার তাই মনে হয় রে—কিন্তু সেদিন কি আমার আছে—মা?

শ্যামলী : সব জেনে, সব শুনে, তবু যদি এ অভিমান করেন মা, তাহলে বুঝব, আমি যে টাকা উপার্জন করেছি—সে টাকা আপনি ছুঁতে চান না।

মহামায়া : বিশ্বনাথ জানেন, আমি তোমাকে মা, লক্ষ্মী-সরস্বতীর মতন শুদ্ধা বলে মানি—তুমি ওকথা বললে আমার বুক ফেটে যাবে!

ব্যাঙ্কের বহিখানি মহামায়ার পদতলে রাখিয়া শ্যামলী গাঢ় স্বরে বলিল :

শ্যামলী : তাহলে আমার ব্যাঙ্কের বই তোমার পায়ের কাছে রাখছি মা! ও টাকা তোমার—যা তোমার ইচ্ছে হয় চোখ বুজিয়ে খরচ করলেই আমার উপার্জন সার্থক হবে মা!

মহামায়া শ্যামলীকে বুকে টানিয়া লইলেন।

* *
*

ঈশ্বর বাকচীর বাড়ী। শঙ্কর, মনোরমা ও শিবানী ও-বাড়ীতে নবাগতাদের দেখিয়া কৌতূহলী হইয়াছিলেন। সেই সম্বন্ধে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে আলোচনা হইতেছিল। শিবানী একখানা বইএর পাতায় মুখটি গুঁজিয়া শুনতেছিল। ঈশ্বর বাকচী বলিলেন :

ঈশ্বর : যা শুনেছ মিছে নয়। ঐ অন্ধ বুড়োই ওর জেঠা—তার দেদার টাকা, ওয়ারিশান এখন শ্যামলী। বছরে নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়—

মনোরমা : শ্যামলীর চেহারা আর হালচাল দেখনি! ওকে এখন পাবার জন্যে মনেরকথাই সাধাসাধি করবে। তাই বলি, হাতের কাছে যে পাত্তর পেয়েছ, ছেড়ো না—যেমন করে হোক....

ঈশ্বর: তার মানে—সর্বস্ব বেচে টুকনি হাতে করে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ানো!

এই সময় মহামায়া এ-বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই ঈশ্বর বাকচীর শেষের কথাগুলি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া বলিলেন:

মহামায়া: বালাই, বালাই! ও কথা মুখে এনো না ঠাকুরপো, আমরা থাকতে শিবানীকে পার করবার জন্যে সর্বস্ব বেচে তোমায় রাস্তায় দাঁড়াতে হবে?

ঈশ্বর: তা ছাড়া ত আর উপায় দেখছি না বৌঠান। ওরা চায় চার হাজার! আর সব খরচ ধরে পাঁচ হাজারের কম পার পাব না—

মহামায়া: ভেব না ঠাকুরপো, বিশ্বনাথ তার উপায় করে দিয়েছেন। এই নাও ভাই—এতে পাঁচ হাজার টাকার নোট আছে। এ টাকা আমরা শিবানীর বিয়েতে যৌতুক দিলুম। তুমি ঐ পাত্রের সঙ্গেই ওর বিয়ে দাও।

একখানি রুমালে বাঁধা পুলিন্দাটি মহামায়া ঈশ্বর বাকচির হাতে দিলেন। কথাগুলি শুনিয়া এবং ব্যাপারটি উপলব্ধি করিয়া তিনজনেই চমৎকৃত, অভিভূত। ঈশ্বর বাকচি গাঢ় স্বরে বলিলেন:

ঈশ্বর: বৌঠান···

মনোরমা: মনের কথা! দিদি!

মহামায়া: বের আয়োজন করে চিঠি দিও। কলকাতায় গিয়ে ঠিকানা দেব—বিয়েতে আমরা আসবই।

* *

*

চতুর্থ পর্ব

কলিকাতার রাজপথ। শীতকাল—বড়দিনের মরশুম। সব রাস্তায় বড় বড় প্লাকার্ড পড়িয়াছে। এমনি একটি রাস্তায় একস্থানে ইন্দ্রাণী রায়ের ছবিযুক্ত প্লাকার্ড এবং রাগিনী দেবীর নামযুক্ত প্লাকার্ড ঘিরিয়া নাগরিকগণ একটি বিজ্ঞপ্তি পড়িতেছেন :

বড়দিনের অপূর্ব সঙ্গীত সম্মেলন !

নবভাবের গানের রাণী—সঙ্গীত-অধিরাজ্ঞী

ইন্দ্রাণী ভাদুড়ী

এবং

রাগপ্রধান গানের যাদুকরী—সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী

রাগিনী দেবী

দুই প্রতিভাময়ীর অনবদ্য সঙ্গীত-প্রতিভা

অসংখ্য সঙ্গীতানুরাগীর সমক্ষে প্রদর্শিত হইবে।

সঙ্গীত সম্পর্কে এরূপ বিচিত্র অনুষ্ঠান এই প্রথম !!

তিনকড়ি : আচ্ছা, ইন্দ্রাণী ভাদুড়ীর ছবি দিয়েছে; কিন্তু রাগিনী দেবীর বিজ্ঞাপন নেড়া কেন? এঁর কি ছবি নেই?

অবিনাশ : ছাতুর দেশের মেয়ে ত—ছবির মর্ম্মই হয়ত জানে না!

হরিদাস : না, না, তা কেন! কাগজে পড়ছিলুম—উনি নাকি কাগজে ছবি ছাপা পছন্দ করেন না; এত নাম ডাক ওঁর—কিন্তু নিজের ছবি কাউকে তুলতে দেন না!

* * *

ভাদুড়ী-ভিলা—ইন্দ্রাণীর সেই সুসজ্জিত কক্ষ। ইন্দ্রাণী তাহার কুসনে বসিয়া আঁচলখানি টেবিলের উপর মেলিয়া চন্দ্রনাথের খাতা হইতে একখানি গান নিজের খাতায় লিখিতেছিল। ঠিক এই সময় পদশব্দ শুনিয়া, পিছনে তাকাইতেই ইন্দ্রাণী দেখিল যে, দরজার পরদাটি সরাইয়া চন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া আছে।

ইন্দ্রাণী আঁচলটি চন্দ্রনাথের খাতার উপর চাপা দিবার উদ্দেশ্যে রাখিয়া বলিল :

ইন্দ্রাণী : আচ্ছা, তুমি ত বলেছিলে—তোমার জানা ভালো ভালো সব গানগুলিই আমাকে শিখিয়েছ ?

চন্দ্রনাথ : ঠিকই বলেছিলাম—শেখাবার মত গান আর আমার পুঁজিতে নেই।

ইন্দ্রাণী : (শ্লেষের সুরে) তাই নাকি ? (সহসা আঁচলখানা সরাইতেই চন্দ্রনাথের খাতা এবং নিজের খাতায় লেখা গানটি খোলা অবস্থায় দেখা গেল) তবে এখানা কি ? তোমার পুঁজি থেকেই পাওয়া গেছে কিন্তু! তাছাড়া, এখানি যে শেখাবার মত গান, তাতে ভুল নেই।

চন্দ্রনাথ : গানের খাতাখানা কাল ফেলে গিয়েছিলাম—তাই বুঝি ও গানখানা তোমার খাতায় লিখে নিয়েছ ? কিন্তু ভুল করেছ।

ইন্দ্রাণী : ও! খুব সাফাই ত দিলে! কিন্তু তুমি ত নিজের খাতায় এটি লিখে পুঁজি বাড়াতে ভুল করনি ?

চন্দ্রনাথ : ও গানখানি লিখে আমি হয়ত খাতার মর্যাদা বাড়িয়েছি; কিন্তু ওগান গাইবার অধিকার আমার নেই।

ইন্দ্রাণী : (সবিস্ময়ে) কেন ?

চন্দ্রনাথ : যাঁর গান, তাঁর বারণ আছে।

ইন্দ্রাণী : তাহলে তুমি ও গান লেখনি ?

চন্দ্রনাথ : না। গান আমার গুরুর।

ইন্দ্রাণী : বল কি ? তা তুমি নিজে না গাও, আমাকে শিখিয়ে দাও। লক্ষ্মীটি—

চন্দ্রনাথ : সে অধিকারও আমার নেই।

ইন্দ্রাণী : ও !

(জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মুখখানি ভার করিল)

চন্দ্রনাথ : রাগ হলো ?

ইন্দ্রাণী : গানখানি কিন্তু চমৎকার ! ভাবছিলাম, এই গানখানি যদি কমপিটিসনে গাইতে পারতাম !

চন্দ্রনাথ : সর্বনাশ ! ভুলেও ওকথা ভেব না—ও গান নিষিদ্ধ এবং অভিশপ্ত।

ইন্দ্রাণী : এমন ? যাক্—তাহলে ও নিয়ে আর মাথা ঘামাব না। (হঠাৎ চমকিতভাবে) ভালো কথা—কাল যাবার সময় নীলুর হাতে একখানা স্লিপ দিয়েছিলে ?

এই প্রশ্নে চন্দ্রনাথ সলজ্জভাবে ইন্দ্রাণীর দিকে একটিবার চাহিয়া মাথা নিচু করিল। ইন্দ্রাণীও আড়চোখে দেখিয়া বলিল :

ইন্দ্রাণী : মুখে বলতে বুঝি লজ্জা হয় ? তোমার টাকা ত জমাই রয়েছে। হাতখরচের জন্যই যদি দরকার—তা মুখ ফুটে একবার···· (টেবিলের ড্রয়ার হইতে কতকগুলি নোট বাহির করিয়া) এই নাও—একশো টাকা আছে।

নোটগুলি চন্দ্রনাথের হাতে দিয়া—পরক্ষণে মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল : হাতে ত অত টাকা পেলেন—না হয় হাতের সুখই একটু করলেন !

চন্দ্রনাথ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে দেখিয়া কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ

চটুল করিয়া কহিল: কি বোকা তুমি! বুঝলে না আমার কথা? বলছিলাম কি—একদিনও ত ভরসা করে নিজের বাসাতে নেমন্তন্ন করে নিয়ে যেতে পারলে না সেখানে বুঝি মনের মানুষ কেউ আছে, সেই ভয়ে—

চন্দ্রনাথ: কি যে বল! আর এ ঠাট্টাই বা কেন? গরীবের বাসায় যাবার জন্যে আমি কি তোমাকে—

ইন্দ্রাণী: বা-রে! বলেছ কোন দিন? বেশত, আজই ত হতে পারে। বলেই দেখনা—যাই কি না!

আনন্দের আতিশয্যে বিহ্বল হইয়া চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল:

চন্দ্রনাথ: সত্য বলছ—সত্য যাবে? তাহলে—

ইন্দ্রাণী: কি মুস্কিল! আমি কি ঠাট্টা করছি?

চন্দ্রনাথ: সত্যিই এত বড় সৌভাগ্য আমার....তবে আমি এখনি উঠলাম। ভাল কথা···কখন তাহলে·····

ইন্দ্রাণী: জানোই ত—রাতে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সাড়ে আটটায় আমি ডিনার করি! মিনিট কুড়ি আগেই না হয় যাব। তা'বলে তোমাকে আসতে হবে না—আমিই যাব, আর একলাই যাবো; তবে দুজনেই ডিনারে বসবো কিন্তু—!

কথাগুলি বলিয়াই কটাক্ষ করিয়া পুনরায় হাসিল।

চন্দ্রনাথ: আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে···আচ্ছা, আমি তবে চললাম।

এই অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনায় আনন্দের প্রাচুর্যে একরকম ছুটিবার মত ভঙ্গিতে চলিয়া গেল চন্দ্রনাথ। আর ইন্দ্রাণীও এই ব্যাপারটিকে কৌতুকাবহ অভিনয় ভাবিয়া আপনমনে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি যেন বলিতে চাহিতেছিল:

কথায় আছে না—বেনো জল সেঁধিয়ে ঘরের জলও টেনে আনে। ইন্দ্রাণী রায়ের এ টাকাও তাই—হিঃ হিঃ হিঃ!

*   *

*

কলিকাতা। রত্নেশ্বরের বাড়ির একটি কক্ষ। মহামায়া দেবী একখানি কার্পেটের আসনে আহ্নিক করিতে বসিয়াছেন। তাহার সামনে পঞ্চপাত্র—তামার ঘটির মত, তাহাতে ছোট হাতার আকারে কুশি। দেওয়ালে লক্ষ্মীর ছবি। ধুমুচি হইতে ধুনার ধোঁয়া উঠিতেছে। মহামায়া দেবী বলিতেছিলেন :

মহামায়া : বল কি ভাই—এ বাড়ী শ্যামলের মামার? বাড়ী দেখে ত খুব বড়লোক মনে হয়! কৈ, একথা ত আগে শুনিনি!

চন্দ্রাবতী : একথা কি আগে কেউ জেনেছিল? আমরা আসতেই রতন-বাবু বাবাকে চিনে ফেললেন; তার পর শ্যামলীর বাবার কথা উঠতেই ত সব জানাজানি হয়ে গেল। শ্যামলীর মায়ের উনি হলেন খুড়তুতো ভাই। গান গান করেই পাগল, অগাধ সম্পত্তি, অথচ বিয়ে থা করেননি—করবেনও না। শ্যামলীকে পেয়ে কি আহ্লাদ!

মহামায়া : তাহলে চন্দরের খবর উনি ত—

চন্দ্রাবতী : সেই কথাই ত বলবার জন্যে ছুটে এসেছি। চন্দ্রবাবুকে উনি কালও দেখেছেন, ভালো আছেন। ঐ গানের ব্যাপারটা চুকে গেলেই এখানে আনবেন। আপনাকে কিন্তু উতলা হতে মানা করেছেন।

মহামায়া: আমি!

মহামায়া দেবী মৃদু হাসিলেন। তাহার পর ডান হাতের তালুতে এক কুশি গঙ্গাজল ঢালিয়া আচমন করিলেন।

* *

*

এই বৃহৎ বাড়ির বিশিষ্ট একটি অংশে রত্নেশ্বরের বৈঠকখানা। রামময় পালঙ্কের উপর আস্তৃত শয্যায় বসিয়া আছেন। রত্নেশ্বর, চন্দ্রাবতী, শ্যামলী, গীতা—প্রত্যেকেই এক একখানি সোফায় উপবিষ্ট। রত্নেশ্বরের সঙ্গে অতীতের পরিচয় সম্পর্কে শ্যামলীর আলোচনা চলিয়াছে। শ্যামলী বলিতেছিল:

শ্যামলী: খুব ছেলেবেলায় আপনাকে দেখেছিলাম মনে হচ্ছে। বাবা আপনাকে রতনমণি বলে ডাকতেন—

রত্নেশ্বর: ঠিক মনে রেখেছ ত!

শ্যামলী: ভাইফোঁটার সময় মা যেন আপনাকে ফোঁটা দিয়েছিলেন—আমার একটু একটু মনে পড়ে। আমি তখন খুব ছোট, বয়স ছয় কি সাত—

রত্নেশ্বর: হ্যাঁ, যত দিন মুক্তাগাছায় ছিলাম, মলিনাদি আমাকে ফোঁটা দিয়েছেন প্রতি বছর। তুমি যখন তাঁর পেটে—সেই বছর কলকাতায় গানের কনফারেন্স হয়। আমি তখন কলেজে পড়ি—১৭।১৮ বছর বয়েস। হ্যাঁ গুরুদেব, বলতে ভুলে গেছি, আপনাদের তিন বন্ধুকেও সেই সময় এক সঙ্গে দেখেছিলাম।

রামময়: হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমারো মনে পড়ছে—দিব্যি সুন্দর ফুটফুটে নাদুস-নুদুস একটি ছেলে আমাদের বাসায় আসত বটে! হরিহর পরিচয় করে দিয়েছিলেন নিজের সম্বন্ধী বলে—তাই নিয়ে

আমরা ঠাট্টাঠুট্টিও করেছিলাম! হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে দেখ কি আশ্চর্য যোগাযোগ!

চন্দ্রাবতী: শ্যামল আমাদের ভাগ্যধরী মেয়ে—কলকাতায় এসেই এমন মামা পেয়ে গেল! এখন চন্দ্রনাথকে পেলেই—

রত্নেশ্বর: উনি যে এখানে বর্ণচোরা আম হয়েছিলেন—তাকি আমরা জানতুম! এখন সব শুনে অবাক হয়ে ভাবছি—ঐ সব বিখ্যাত গান তাহলে চন্দ্রনাথবাবুর সৃষ্টি—তার ওপর উনি নিজেও মস্ত সঙ্গীতবেত্তা; আর—ওঁকেই কিনা এক্স্‌প্লয়েড করে ঐ ডেঁপো মেয়েটা নিজেকে বিখ্যাত করে তুলেছে!

শ্যামলী: এখন আমার কথা শুনুন মামাবাবু! চন্দরদার বাসার ঠিকানাটি কিন্তু আমাকে এনে দিতেই হবে।

রত্নেশ্বর: এই কথা? বেশ, এক ঘণ্টার মধ্যেই তুমি ওঁর ঠিকানা পাবে। তবে একটা কথা—রাগিণীদেবীর আসল পরিচয় এখন চাপাই থাকবে, বাইরের কেউ এ সম্বন্ধে কিছুই জানবে না।

রামময়: সে দিক দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেক রত্নেশ্বর।

* *

*

চন্দ্রনাথের বাসা বাড়ির নিচের তলার বড় ঘর। একটা ঝুল-ঝাড়া লম্বা লগি লইয়া মঙ্গল গজ গজ করিতে করিতে ঘরের ঝুল ঝাড়িতেছিল।

বাড়ীর সামনে জনবিরল রাস্তা। টুং টুং শব্দ করিয়া এক রিক্সাওয়ালাকে আসিতে দেখা গেল—তাহার রিক্সায় বসিয়া আছে সাদাসিধা পরিচ্ছদে শ্যামলী। রিক্সা হইতে চাহিয়া চাহিয়া সে ফুটপাথের দিকে

ঝুঁকিয়া বাড়ীর নম্বরগুলি দেখিতেছিল। চন্দ্রনাথের বাসার কাছে আসিতেই সদর দরজার গায়ে নীলবর্ণের এনামেল প্লেটে বাংলা অক্ষরে ৪৮ লেখাটি দেখিয়াই চাপাগলায় বলিল :

শ্যামলী : রোখো—রোখো।

রিক্সাওয়ালা রিক্সা থামাইতেই শ্যামলী তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িয়া বলিল :

শ্যামলী : তুম্ থোড়া আগে বাড়কর মেরা ইন্তাজার কর।

রিক্সা লইয়া রিক্সাওয়ালা একটু তফাতে একটা গাছের ছায়া লক্ষ্য করিয়া চলিয়া গেল। শ্যামলী সামনে ফুটপাথের উপর উঠিল।

* *
*

মঙ্গলের ঝুল ঝাড়া শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন। রাস্তার দিকে ঘরের দরজাটি খোলাই ছিল। পা টিপিয়া টিপিয়া শ্যামলী ঘরে প্রবেশ করিয়া মঙ্গলের দিকে চাহিয়া রহিল। মঙ্গল তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া কাজ করিতে থাকায় শ্যামলীকে দেখিতে পাইল না। বাকি কাজটুকু শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গল আপন মনে গজ গজ করিয়া বকিতেছিল :

মঙ্গল : দাদাবাবুর যেমন কাণ্ড! এই কাজ—এর জন্যে যেন ঘুম হচ্ছিল না। আমার ত কাজ হয়ে গেল, তাঁর কিন্তু এখনো ফেরবার নামটি নেই! হুঃ!

হাতের ঝুল-ঝাড়া লগিটা ঘরের বাহিরে ঘুলঘুলির দিকে সিড়ির নিচে রাখিবার জন্য মঙ্গল ফিরিতেই শ্যামলীকে দরজার কাছে দেখিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

শ্যামলীর পরণে ছিল এক খানি হাল্কা রঙের ডুরে সাড়ী, মাথায় এলো খোঁপা, গায়ে একখানা চাদর জড়ানো, হাতে দুগাছি করিয়া চুড়ি, গলায় এক ছড়া হেলে হার, পায়ে স্যাণ্ডেল।

কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া—চিনি চিনি করিয়াও ঠিক চিনিতে না পারিয়া মঙ্গল শ্যামলীর দিকে নীরবে আগাইয়া গেল।

ফিক করিয়া হাসিয়া সকৌতুকে শ্যামলী বলিল :

শ্যামলী : চন্দরদার মতন মঙ্গলদাও বদলে গেলে নাকি? চিনতে পারছ না?

পরিচিত স্বর ও সুর শুনিয়া মঙ্গলের চোখে মুখে উল্লাস ফুটিয়া উঠিল; উচ্ছ্বসিত গলায় সে বলিল :

মঙ্গল : য়ঁ্যা—শ্যামলদি! আমাদের শ্যামলদি! সত্যিই এসেছ? কিন্তু এ যে স্বপ্নের মত....

শ্যামলী : তাহলে স্বপ্নই সত্যি হয়েছে মঙ্গলদা! এখন—হাতের ওটা রাখো ত; অনেক কথা আছে।

মঙ্গল : (ঘরের একটি কোনে ঝুল-ঝাড়াটি রাখিয়া) আগে বাড়ীর কথা বলো দিদি—ও দাদাবাবুর ওপরে আমার একটুও প্রেত্যয় নেই! গিন্নীমা কেমন আছেন বল? তার পর—ঘর গেরস্থালীর কথা—যা শোনবার তরে...

শ্যামলী : ওখানকার জন্যে ভাবনার কিছু নেই মঙ্গলদা—খবর সব ভালো। পরে শুনবে'খন। আগে চন্দরদা'র খবর বলত! এই যে একটা বছর এখানে এসে চুপ করে আছেন—পৌছানোর খবর ছাড়া একখানা চিঠি দিয়েও খোঁজ নেননি, একটি পয়সাও পাঠাননি—

মঙ্গল : সে কি গো শ্যামলদি? খরচ পাঠায় নি? ট্যাকা যায় নি

গিন্নীমার কাছে? তবে যে শুনি হামেসাই মুনিআটার 'Moneyoder' করে মোটা মোটা ট্যাকা পাঠিয়েছেন ওনার শিষ্যি! তবে কি সব মিছে?

শ্যামলী : সত্যি হলে আমি কি এসেই একথা তুলতে পারি মঙ্গলদা?

মঙ্গল : হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাইত! ঠিক কথাইত! তাইলে ও সব ভূয়ো—ফেরেব্বাজী। দাঁড়াও, দাদাবাবু বাড়ীতে ফিরুক ত! এই নিয়ে কুলুক্ষেত্তর করবনা···

শ্যামলী : থামো মঙ্গলদা—মাথা গরম কর না। এখন ভালোয় ভালোয় চন্দরদাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে—বুঝলে? রাগালে কিন্তু সব বিগড়ে যাবে।

মঙ্গল : হুঁ—ঠিক বলেছ শ্যামলদি! তাহলে বলি, ঐ শিষ্যি খাণ্ডাতনী তো ওনারে যাদু করে রেখেছে গো! এই—আজকের কাণ্ডই দেখনা—

শ্যামলী : কি হয়েছে আজ?

মঙ্গল : হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! সেই শিষ্যি আজ রেতের বেলায় গুরুর বাড়ীতে নেওতা খেতে আসবেন। এই পেরথম আসবে বলে খাওয়াবার, আর ওপরের ঘর দুখানা সাজাবার—কি ঘটা গো!

শ্যামলী : তাই নাকি?

মঙ্গল : তোমার দিব্যি গো শ্যামলদি! একটি মনিষ্যির পেছনে একশো টাকা গলে যাবে—জাঁক করে নিজেই কয়ে গেল দাদাবাবু! সায়েবদের হোটেল থেকে হরেক রকমের খানা আসবে গো!

শ্যামলী : বা! তাহলে ত খুব ভালো দিনেই এসে পড়েছি মঙ্গলদা!

মঙ্গল : হুঁ ! তবেই হয়েছে ! আমাদের দাদাবাবু কি আর সেই দাদাবাবুই আছে গো শ্যামলদি ! ভাবছি, তোমাকে দেখলে—

শ্যামলী : চন্দর দা তাড়িয়ে দেবে নাকি ?

মঙ্গল : তা সে গুণে ঘাট নেই গো !

শ্যামলী : বল কি ! ভালকথা, রাস্তার ধারের ঘর—দরজাও খোলা রয়েছে। আগে ওটা বন্ধ কর দেখি !

মঙ্গল তাড়াতাড়ি দরজাটি বন্ধ করিয়া খিল লাগাইল।

শ্যামলী : এ ঘরের পাশে ঐ ঘরখানাতে কি চন্দরদা থাকেন ?

মঙ্গল : না, না—দাদাবাবুর ঘর ওপরে। দুটো লোক এসে সে ঘর এখন সাজাচ্ছে ; এ ঘরে জিনিসপত্তর সব থাকে।

শ্যামলী : তাহলে বলি শোন, ঠিক সন্ধ্যের সময় এসে আমি ঐ ছোট ঘর খানিতে লুকিয়ে থাকব, বসবার মত একটু জায়গা করে রেখ মঙ্গলদা—ঐসময় তোমাকে সব কথা বলব। এখন যাই—চন্দরদা এসে পড়লেই মুস্কিল হবে।

মঙ্গল : এসেই চললে দিদি—একটু বসলেও না।

শ্যামলী : বসবার সময় ত পালাচ্ছেনা মঙ্গলদা, এখন যাই। ঠিক সন্ধ্যের মুখে আসব—তুমি এখানেই থেক কিন্তু।

মঙ্গল : রাস্তার পানে তাকিয়ে থাকব দিদি ! একটু দাঁড়াও, পেরনামটা সেরে নিই।

কোমর হইতে গামছাখানি খুলিয়া গলায় দিয়া মঙ্গল ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্যামলীকে প্রণাম করিল।

* *

*

রত্নেশ্বরের বাড়ীর কক্ষ। আয়নার সামনে বসিয়া শ্যামলী নিজের হাতেই নিজের রূপসজ্জা করিতেছে। কাছে দাঁড়াইয়া গীতা তাহা দেখিতেছে। শ্যামলীর আজিকার সজ্জাও একেবারে অভিনব। যথা:

পাছা পাড় দেওয়া একখানা সাড়ী এমন করিয়া পরিয়াছে যে, আঁচলটি পাকের পর পাক খাইয়া কোমরে জড় হইয়াছে—কিন্তু পায়ের দিকে খাঁটো দেখাইতেছে। গায়ে—গাঢ় লাল রংয়ের একটা ব্লাউজ হাতাওয়ালা। কপালে সিন্দুরের টিপের স্থলে একটা কৃত্রিম উল্কী আঁকিয়াছে—সেটি আসলের মতই মনে হইতেছে। প্রত্যেক কানে তিনটি কি চারিটি করিয়া মাকড়ি। নাকে সোনা বা রূপার বেসর (চ্যাপ্টা নোলক)। হাতে রূপার বালা, উপর হাতে তাবিজ—কালো রেশমী ঝুমকো দুটি মুখ বাঁধা অবস্থায় ঝুলিতেছে। মাথার দীর্ঘ চুলগুলি জরি দিয়া পাকাইয়া বেণীর আকারে পিঠে ঝুলাইয়াছে—তার প্রান্তভাগে একটা রেশমী বড় ঝুমকো। দুই পায়ে রূপার মল।

গীতা: একি সাজলে শ্যামলী দি, চেনাই যায় না যে?

শ্যামলী: ওদেশের দেহাদী গাঁইয়া মেয়েদের মতন দেখাচ্ছে ত?

গীতা: তা হয়ত দেখাচ্ছে। কিন্তু য্যাদ্দিন পরে এই বেশে গুরুদর্শনে যাবে শ্যামলীদি?

শ্যামলী: তাহলেও গুরু চিনবে। তবে গুরুর শিষ্যটি যাতে গানের আসরে রাগিনীদেবীকে গাঁইয়া শ্যামলী বলে সন্দেহ করতে না পারে, সেইজন্যেইত সাজের এত ছিরি!

গীতা: তা বলে আমরা কিন্তু তোমাকে একলা ছেড়ে দেব না শ্যামলীদি! নিদেন বাঁদী সেজেও তোমার সঙ্গেই যাব।

শ্যামলী: বাঁদীত নিজেই সেজেছি! সঙ্গে আবার বাঁদী গেলে সব যে ফাঁস হয়ে যাবে!...ভয়কি, তোরা ত গাড়ীতে থাকবি। কিন্তু,

খবরদার—মামা আর তুই ছাড়া আর কেউ একথা জানবে না!

গীতা : তা জানি!

* *
*

চন্দ্রনাথের বাসা। উপরতলার বসিবার ঘর। আজ ঘরের শ্রী বদলাইয়া গিয়াছে। দরজা ও জানালায় সাদা নেটের ঝালরদার পরদা ঝুলিতেছে। দেওয়ালের গায়ে—বিশেষ বিশেষ ছবিগুলিতে ফুলপাতা দিয়া তৈরী চক্রাকৃতি বড় বড় মালা দেখা যাইতেছে। পাশের ঘরখানির দরজার উপর হাল্কা রঙের একখানি বাহারি পরদা ঝুলিতেছে। চন্দ্রনাথ ঘরের মধ্যে বেড়াইতেছিল। হাতঘড়ি দেখিয়া দরজার কাছে আসিয়া নিচের সিঁড়ির দিকে চাহিয়া বলিল:

চন্দ্রনাথ : মঙ্গলদা—নিচে থেকো। ওঁর গাড়ী এলেই খবর দেবে—বুঝলে?

মঙ্গল : বুঝেছি গো! কতবার বলবে? শিগ্যি এলেই ছুটে গিয়ে জানাবো!

* *
*

নীচের সেই বড় ঘরটির পাশে ছোট ঘরখানি আজ বেশ ছিমছাম দেখাইতেছে। তক্তপোষের উপর সতরঞ্চি বিছানো—উপরের দিকে মঙ্গলের বিছানাটি গুটানো। ঘরের দেওয়ালে শিব-অন্নপূর্ণার ছবি। কোণে জলের সোরাই। তক্তপোষের কাছে একখানি বেতের মোড়ার উপরে বসিয়া আছে মঙ্গল, এবং দেহাদী বালিকার সজ্জায় সজ্জিতা শ্যামলী তক্তপোষে বসিয়া মঙ্গলের দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। মঙ্গল বলিতেছিল:

মঙ্গল : শুনলে ত শ্যামলদি! ঘণ্টা ভোর এসেছ—শিপ্রির কথা এরই মধ্যে কতবার বললে বল ত? এতে কি মনে হয়?

শ্যামলী : পাছে তুমি ভুলে যাও এই আর কি? এখন—ওঘরে চলো, শিপ্রি আগে এসে পড়লেই মুস্কিল হবে।

উভয়ে পাশের বড় ঘরখানির ভিতরে আসিল। রাস্তার দিকে বাহিরের দরজা বন্ধ ছিল।

মঙ্গল : তুমি তাহলে—

শ্যামলী : চন্দরদার সঙ্গে একদান লুকোচুরি খেলব। কিন্তু আমার কথাগুলো মনে থাকে যেন।

মঙ্গল : হ্যাঁগো হ্যাঁ—আমি কাঁচা ছেলে নই।

উপর হইতে এই সময় চন্দ্রনাথের কণ্ঠের গান শোনা গেল :

চির চন্দন উরে হার না দেলা!

শ্যামলী : বা-বা-বা! আমি ঠিক এইটিই ভাবছিলাম! আমার জানা গান—মার দিয়া কেল্লা! ভালকথা, মল দুগাছা এখন ভালো করে এঁটে যেতে হবে, যাতে শব্দ না হয়। চললাম মঙ্গলদা।

যাইতে যাইতে চাপা গলায় শ্যামলী ঐ গানের পরের পংক্তিটি ধরিল :

সে অব নদি গিরি আঁতর ভেলা....

* *

*

উপরের ঘরে তক্তপোষে আস্তৃত ফরাসে বসিয়া হারমোনিয়ম বাজাইয়া চন্দ্রনাথ পদাবলীর গান গাহিতেছিল :

চির চন্দন উরে হার না দেলা,
সে অব নদী গিরি আঁতর ভেলা।

পিয়াক গরবে হাম কাহুক ন গণনা,
সে পিয়া বিনা মোহে কে কি না কহলা ॥

শ্যামলী ইতিমধ্যে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াছে। ঘরের কোলে ছাদে উঠিবার ও নিচে নামিবার দুই দিকের সিঁড়ির ব্যবধানে ক্ষুদ্র চাতলাটির উপর দাঁড়াইয়া এই গানের বাকি অংশটি গাহিতে লাগিল :

বড় দুঃখ রহল মরমে—
পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে।
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে,
পিয়াক দোখ নাহি যে ছিল করমে ;
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা—
পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা ॥

চন্দ্রনাথ প্রথমে এমন বিস্মিত, তারপর মুগ্ধ ও শেষে অভিভূত হইয়া গেল যে, গানটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত উঠিতে পারিলই না, উপরন্তু মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহার হাতখানি বাজনা বাজাইয়া চলিল গানের তালে তালে।

গানটি শেষ করিয়াই শ্যামলী তাড়াতাড়ি তেতালার সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেল এবং উপরের বাঁকের কাছে বসিয়া সিঁড়ির লোহার রেলিংয়ের গরাদের গায়ে মুখখানা রাখিয়া চন্দ্রনাথের গতিবিধি দেখিতে লাগিল।

বাহিরের গান শেষ হইতে চন্দ্রনাথের হুঁস হইল। সে কি তাহা হইলে এতক্ষণ স্বপ্নাবিষ্টের মত গানের সঙ্গে সঙ্গত করিল ? একি তাহার অবচেতন মনের লীলা—কিম্বা ইন্দ্রাণী চুপি চুপি আসিয়া আড়ালে থাকিয়া গাহিল ? কিন্তু এ ত তাহার কণ্ঠ নহে ! তবে ? কে গাহিল ?

এতক্ষণে চন্দ্রনাথ উঠিল—চৌকির নিচে রাখা চটি জোড়াটি পায়ে দিয়া সন্দিগ্ধভাবে বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। দরজার সামনে প্রশস্ত

চাতালটি চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার পর নিচে নামিয়া সিঁড়ির বাঁকের কাছে দাঁড়াইয়া মঙ্গলকে ডাকিয়া বলিল :

চন্দ্রনাথ : হ্যাঁ মঙ্গলদা, ওপরে কেউ কি এসেছিল ?

মঙ্গল বাহিরের ঘরে একটা টুলের উপর বসিয়াছিল। বলিল :

মঙ্গল : কে আবার আসবে ? আমি তো এখানে ঠায় বসে আছি।

চন্দ্রনাথ : কেউ এসে ওপরে উঠে গান গায়নি ?

মঙ্গল : কি মুস্কিল—স্বপ্ন দেখলে নাকি ?

ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চন্দ্রনাথ পুনরায় ঘরে ফিরিয়া গেল। মন তখন উদ্বিগ্ন—কেমন একটা সংশয়ভাব। চিন্তান্বিতভাবে জানালার কাছে গিয়া তাহার উপরে ঝোলানো নেটের পরদাখানিতে হাত দিয়াছে—এমন সময় শ্যামলী পা টিপিয়া টিপিয়া চোখে মুখে কৌতুকের আভা ফুটাইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। একটু স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার পর বলিল :

শ্যামলী : এই যে চন্দরদা—কেমন আছ ?

অতি বিস্ময়ে সামনের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া চন্দ্রনাথ সন্দিগ্ধ ভাবে চাহিয়া রহিল। চন্দ্রনাথকে নীরব দেখিয়া শ্যামলী সহাস্যে তাহার কাছে গিয়া পদতলে বসিয়া পড়িয়া বলিল :

শ্যামলী : সত্যিই কি চিনতে পারছ না ? আগে পায়ের ধুলো একটু দাও ত—

বলিতে বলিতেই সে হেঁট হইয়া মাথাটি নত করিল—চটির তলায় হাত দিয়া হাতখানি মাথায় ঠেকাইল। এই সময় দরজার সম্মুখে আসিয়া মঙ্গল বলিল :

মঙ্গল : আমাদের শ্যামলদি গো দাদাবাবু! আমিও গোড়ায় চিনতে

পারিনি। কথা কও তোমরা—আমি নিচে যাই বাপু, দরজা খোলা রয়েছে।

কথাগুলি বলিতে বলিতেই মঙ্গল চলিয়া গেল। চন্দ্রনাথ অবাক হইয়া শ্যামলীর বিচিত্র রূপসজ্জা দেখিতেছিল এতক্ষণ। বিস্ময়ের সুরে ধীরে ধীরে কহিল :

চন্দ্রনাথ : শ্যা—মল্ নাকি ?

শ্যামলী : তবু ভালো—চিনেছ।

চন্দ্রনাথ : চিনিছি গলার স্বর শুনে! ছোটলোকের মেয়েদের মত সাজগোছ করে চেহারাটাকে পর্যন্ত যে রকম....তা এখন আসা হচ্ছে কোথা থেকে ?

শ্যামলী : কেন, বাড়ী থেকে। বা—ব্বা! তোমার বাসা কি খুঁজে পাই ? ভাগ্যিস্ গান গাইছিলে—তাই না সুর ধরে এলাম।

চন্দ্রনাথ : ও! তাহলে তোমার কাজ! আমাকে ভেংচে আড়াল থেকে গান গাওয়া হয়েছে ?

শ্যামলী : আমি! বলতে লজ্জা করছেনা ? গান কি শিখিয়েছিলে কোন দিন যে গাইব ? তাহলে কি এই হাল আমার হয়! দাসী-বাঁদীর মত গতর খাটিয়ে—

চন্দ্রনাথ : কি! কি ?

শ্যামলী : চমকে উঠলে যে কথাটা শুনে ?

চন্দ্রনাথ : যে হালে এসেছ, দেখলে ঘেন্না করে—চিনতেই পারিনি প্রথমে! তার পর যে কথা বললে—

শ্যামলী : লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে—এইত বলতে চাইছিলে ? কিন্তু এর জন্যে দায়ী কে বলত শুনি ? নিজে রোজগার করে মায়ের

দুঃখ যখন ঘোচাতে পারলে না, তখন আমাকেই উপায়ের আশায় বেরুতে হয়েছে তা জানো?

চন্দ্রনাথ: কি বললে—তোমার রোজগারের টাকায় মা—আমার মা—উ! আমার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি এ কথা—তাহলে বল… বল…কত টাকা মাকে দিয়েছ—শিগগীর বল—আমিএখনি…

শ্যামলী: ও! 'দিন গেলো আলে ডালে....রাত হোলে চেরাগ জ্বালে!' ....তোমারো হয়েছে তাই! সম্বৎসর ধরে বড় কন্নাই মার করেছ—এখন আর দরদ দেখে বাঁচিনে! বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, রোজগার করছি—শুনেই রেগে টং! যেন ও দুটো কাজ পুরুষদেবই এক চেটে! আরে—আমার পুরুষ!

চন্দ্রনাথ: (হাত ঘড়ির দিকে চাহিয়া—বিপন্নভাবে) আমি জোড় হাত করছি শ্যামল—আমায় মাপ কর। আমার সাধ্য নেই যে তোমার সঙ্গে বসে বসে ঝগড়া করি! জানো ত—উঁচু কথাটিও আমি সইতে পারি না! দোহাই তোমার শ্যামল, এখন আমাকে রেহাই দাও। আজ আমি বড় ক্লান্ত; কাল বরং দিনের বেলায় এক সময় এসো, তখন সব কথা শুনব।

শ্যামলী: শোন কথা! কাল আসবো মানে? তোমার বাসাতেই ত থাকব বলে এসেছি আমি! আর, আমি যেন আসব বলেই বাসাটি তুমি সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছ দেখছি। এ ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে? বাড়তি ঘরও ত একখানা ওপাশে রয়েছে না—দেখি?

দুষ্টুমীর ভঙ্গিতে কথাগুলি তাড়াতাড়ি এক নিশ্বাসে বলিয়াই শ্যামলী পাশের ঘরখানির দিকে ছুটিল। চন্দ্রনাথও তৎক্ষণাৎ বাধাদানের ভঙ্গিতে বলিল:

চন্দ্রনাথ : না, না, না,—ও ঘরে না—যেওনা ওদিকে, যেওনা—

শ্যামলী সে কথায় কান না দিয়াই হন হন করিয়া পাশের ঘরের দরজার সামনে পরদার কাছে গিয়া সহসা মুখ ফিরাইয়া বলিল :

শ্যামলী : কি? বাবা! না না না বলে যে রকম করে চেঁচিয়ে উঠলে—তাতে মনে হলো বুঝি মানুষ খুন করে ঘরের মাঝে লুকিয়ে রেখেছ!

চন্দ্রনাথ : আমি বারণ করছি শ্যামল—

শ্যামলী : বা-রে! দেখতেও দোষ! তাহলে নিশ্চয়ই কিছু—

কথার সঙ্গে দরজার পরদাখানি সরাইয়া ঘরের ভিতর উঁকি দিয়াই শ্যামলী শিহরিয়া চেঁচাইয়া উঠিল :

শ্যামলী : ওরে বাবা! বলি, ও কি কাণ্ড করে রেখেছ চন্দরদা! আমি আজ আসবো—সে কি হাত গণে জেনেছিলে? তাই এমন করে দুজনের জন্যে রাজভোগ সাজিয়ে রেখেছ আগে থেকেই? করেছ কি কিন্তু—দুটো পেটে অত জিনিস সেঁধুবে কি করে?

চন্দ্রনাথ : আমাকে তো বলবার ফুরসদ দিলে না—নিজেই এক নাগাড়ে বলে চলেছ! আমার এক বিশেষ বন্ধুকে আজ নিমন্ত্রণ করেছি, সেইজন্যেই আমি আজ ভারি ব্যস্ত; তাই তোমাকে....

শ্যামলী : তাই বলো! আমার এমন কি ভাগ্যি যে....তা বেশ ত, তাতে কি হয়েছে! আমি না হয় এখানে থেকে খাবার সময় তোমার বন্ধুর পরিচর্য্যাই করলাম!

চন্দ্রনাথ : না, না, সে হবে না—বাইরের কারুর সামনে সে হয়ত খেতেই চাইবে না। তাই বলছি শ্যামল—আজকের মত আমার মুখ রক্ষা কর—তুমি এখন যাও; আর না হয়—রাত ঠিক দশটা হোলে ফের এসো এখানে; আমি তখন এই হোটেল

থেকেই খাবার আনিয়ে তোমাকে খাওয়াব। আমার কথা রাখ—লক্ষ্মীটি!

গভীর দৃষ্টিতে চন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া শ্যামলী জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল:

শ্যামলী: বেশ! তাহলে চল্লাম।

শ্যামলী চলিয়া যাইবার পর বিভিন্নমুখী চিন্তার পাথারে তলাইয়া যাইবার মত চন্দ্রনাথের অবস্থা হইল। শ্যামলী কি আসিবার আর দিন পাইল না? এমন এক সঙ্গীন সময়ে সে আসিয়াছে যে, বসাইয়া কথা বলাও মুস্কিল! এদিকে ঘড়িতে আটটা বাজিয়া গিয়াছে—এখনি ইন্দ্রাণী আসিয়া পড়িবে। তাহার আসিবার সময় হইয়াছে বলিয়াই পদাবলীর বিখ্যাত গানখানি সে গাহিতে বসিয়াছিল। কিন্তু গানের মধ্যেও যে কাণ্ড ঘটিয়া গেল—তাহা ভৌতিক ব্যাপারের মত! এক শ্যামলীর উপরেই সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু সে ত কোন দিন গান গাহে নাই। তবে কি সে·······

আর ভাবিবার সময় পাইল না চন্দ্রনাথ, বাড়ির সামনে মোটর থামিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার হর্ণ বাজিয়া উঠিল। পরক্ষণে মঙ্গলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—দাদাবাবু!

চন্দ্রনাথ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

* *

*

চন্দ্রনাথের বাসার সামনে রাস্তায় একখানি মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার জানালা দিয়া ইন্দ্রাণী মুখ বাড়াইল।

সঙ্গে সঙ্গে নীচের তালায়—দরজার কাছে মঙ্গলকে দেখা গেল।

তাহার পিছনে চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথ গাড়ীর কাছে গিয়া হাত ধরিয়া ইন্দ্রাণীকে নামাইতে বলিল।

চন্দ্রনাথ: দেরী দেখে আমিই খোঁজ নিতে যাব ভাবছিলাম।

ইন্দ্রাণী: আমার কথার কি দাম নেই—চলো!

উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া তালে তালে পা ফেলিয়া উপরে চলিল। পাশের ঘরের জানালার গরাদের উপর উৎক্ষিপরা একখানা মুখ দেখা গেল—সে মুখ শ্যামলীর। এই ঘরের জানালার গরাদের উপর মুখ রাখিয়া সে ইন্দ্রাণীকে দেখিতেছিল।

মঙ্গল এই সময় বাহিরের দরজা বন্ধ করিতেছে দেখিয়া শ্যামলী ছুটিয়া আসিয়া বলিল:

শ্যামলী: তোমার ডাক পড়বে না মঙ্গল দা?

মঙ্গল: দাদাবাবু বলে রেখেছেন যে—দরজা বন্ধ করে ঠায় বসে থাকতে; তারপর ঘণ্টা বাজলেই ওপরে যেতে হবে।

*

*

চন্দ্রনাথের বাসার উপরের ঘরের পার্শ্ববর্তী ভোজন-ঘর। অতি শুভ্র ও সৌখীন আচ্ছাদনে আবৃত টেবিলের উপর নানাবিধ খাদ্য ডিসে ডিসে পরিপাটিরূপে সাজানো। টেবিলের দুই দিকে—চন্দ্রনাথ ও ইন্দ্রাণী দুইখানি চেয়ারে মুখোমুখি বসিয়া—প্রসন্নমনে ভোজন করিতে করিতে কথা বলিতেছিল:

ইন্দ্রাণী: করেছ কি! আমার বাড়ীতে ডিনারের প্লেট ত দেখেছ? তার তুলনায় এ-সব কী? আমি কি এত খাই?

চন্দ্রনাথ: কি জান ইন্দ্রা—আনাড়ীর ব্যবস্থা; তাই হয়ত হিসেব ঠিক মত করতে পারিনি।

ইন্দ্রাণী : আমাকে জিজ্ঞেস করতেও পারতে! যাকৃগে—আয়োজন যখন করেছ দমকা খরচ করে—সদ্ব্যবহার করা চাই, অবিশ্যি যতটা পারা যায়।

চন্দ্রনাথ : তুমি যা যা ভালোবাস, সেইগুলিই আমি মেনুতে রাখতে অর্ডার দিয়েছিলাম।

ইন্দ্রাণী : সেত দেখতেই পাচ্ছি! এখন তবে তোমাকে বলি, খাওয়াটাই কিন্তু আমার আসল উদ্দেশ্য নয়, এর পিছনে একটা সার্চিংমটিভও (searching motive) ছিল!

চন্দ্রনাথ : তাই নাকি?

ইন্দ্রাণী : সেই গানখানি তোমার খাতা থেকে বেরিয়ে পড়তে মনে আমার সন্দেহ হয়েছিল—এমনি আরো অনেক নতুন গান হয়ত তোমার বাগাতেও আছে।

চন্দ্রনাথ : ও! তাই বুঝি এসেই আমার ষ্টাডিটা সব ওলট পালট করে দেখছিলে? কিন্তু পেলে কিছু?

ইন্দ্রাণী : (মুখের হাসি চাপিয়া) কাগজে কলমে পাইনি—তবে তোমার পেটের মধ্যে যদি চেপে রেখে থাক, কি করে পাব বল? যাই হোক, আমি খুসি হয়েছি।

চন্দ্রনাথ : আ—বাঁচলাম!

ইন্দ্রাণী : আরও জানলাম—তোমার মেজাজ আছে। এদিক দিয়ে তুমি আরেবিয়ান নাইটসের আবুহোসেন। সত্যি, খরচ করতে জানো বটে! এখন আমি কি ঠিক করেছি জান?

চন্দ্রনাথ : বল!

ইন্দ্রাণী : মানে মানে এই মেড়ো মেয়েটাকে মাত করতে পারলে—এর পরে রতন বাবুকে ধরে এম্পায়ারে একটা আলাদা আসর

বসাবো।···(চটুল চোখে চাহিয়া) তার য়্যাজেণ্ডা কি হবে বল ত ?

চন্দ্রনাথ : (বিহ্বলভাবে চাহিয়া) কি···· ?

ইন্দ্রাণী : সে-সভায় ঋণ-স্বীকার করে আমার প্রিয়তম মাষ্টারের গলায় নবরত্নের এক ছড়া মালা পরিয়ে দেব।

চন্দ্রনাথ : তাই নাকি ?

ইন্দ্রাণী : আর—তার ওপরে একটা নতুন ধরণের জমকালো উপাধি! আবার—আমিই সেটি ঠিক করেছি। উপাধির নামটি শুনবে ?

চন্দ্রনাথ : (নীরবে—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল)

ইন্দ্রাণী : সঙ্গীত-কল্পতরু। কেমন—পছন্দ হয় ?

চন্দ্রনাথ : পছন্দ তোমার—আমার কিন্তু উপাধির ওপরে কোন লোভ নেই।

ইন্দ্রাণী : তা জানি—তুমি সুধু দিতেই জানো, নিতে নারাজ। কিন্তু আমার সেই আর্জিটি তোমাকে রাখতেই হবে।

চন্দ্রনাথ : আর্জি ?

ইন্দ্রাণী : বা-রে, ভুলে গেছ! সেই যে গো—তোমার গুরুঠাকুরের তৈরী রাগপ্রধান গানখানি—খাতা দেখে যা টুকে নিয়েছি! কে জানে বাপু কেন—কমপিটিসনে ঐ গানখানা গাইবার জন্যেই মনটা খালি খালি উসখুস করছে। তুমি ওর সুর আর স্বরগ্রামটা যদি—

চন্দ্রনাথ : আমি তো ও গানের সম্বন্ধে সব কথাই তোমাকে বলেছি ইন্দ্রা! আমার পক্ষে ও গান নিষিদ্ধ।

ইন্দ্রাণী : আহা! তুমি নাই বা গাইলে, সুধু শিখিয়ে দেবে গো!

চন্দ্রনাথ : কাউকে শেখাতে হলেও গুরুর অনুমতি চাই।

ইন্দ্রাণী : বেশ—তাহলে গুরুর কাছ থেকে অনুমতি আনাও।

চন্দ্রনাথ : কি আশ্চর্য ! গুরু কি এখানে থাকেন যে ছুটে গিয়ে অনুমতি আনব ? তাঁর আশ্রম হচ্ছে গোয়ালিয়রে।

ইন্দ্রাণী : তাতে কি হয়েছে—বুদ্ধি আর পয়সা থাকলে সবই হয়। (কাঁধে ঝোলানো ভেলভেটের ব্যাগ হইতে টেলিগ্রাম ফরম বাহির করিয়া) এই নাও—যা যা লেখবার আমি লিখে এনেছি, তুমি এই খালি জায়গায় তোমার গুরুঠাকুরের নাম ঠিকানাটা বসিয়ে দাও—এখনি প্রিপেড Express টেলিগ্রাম করলে কালই অনুমতি এসে পড়বে।

চন্দ্রনাথ : য়্যাঁ ! সব তৈরী করে এনেছ ? তা বেশত—কাল সকালেই না হয় ···

ইন্দ্রাণী : কাল সকালেই গুরুঠাকুর যাতে পান, আর বেলা দশটার মধ্যেই তাঁর মঞ্জরী আসে, সেই জন্যেই এখনি পাঠানো চাই। লেখ—

স্বর্ণশৃংখলে বাঁধা ভেলভেটের বাহারী ব্যাগটি ইন্দ্রাণীর অঙ্গে আভরণের মতই শোভা পাইয়া থাকে। ইহার মধ্যেই ঝর্ণা কলম ছিল ; ফরম ও কলম চন্দ্রনাথের হাতে দিল ইন্দ্রাণী লিখিবার নিমিত্ত।

চন্দ্রনাথ : (টেলিগ্রাম ফরমে ঠিকানা লিখিয়া ফরম ও কলম ইন্দ্রাণীকে দিল) এই নাও।

ইন্দ্রাণী : এখন চাকরকে ডাক দেখি।

চন্দ্রনাথ ঘণ্টা টিপিয়া দিল—ক্রীং ক্রীং ক্রীং শব্দ করিয়া ঘণ্টা বাজিতে লাগিল।

* * *

ঘরের দ্বারে টাঙানো পরদার বাহিরে অপর ঘরের একাংশ। শ্যামলী এইখানে দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া ইহাদের সংলাপ শুনিতেছিল। ঘণ্টা বাজিতেই তাড়াতাড়ি অথচ পা টিপিয়া টিপিয়া নিচের দিকে ছুটিল !

নিচের ঘরের দরজার নিকটে মঙ্গল ও শ্যামলীকে দেখা গেল। ঘণ্টা শুনিয়া মঙ্গলও উৎকর্ণ হইয়াছে; শ্যামলীও ব্যস্ত ভাবে নিচে আসিয়াছে।

মঙ্গল : হলো কি দিদি—ঘণ্টা শুনেই ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এলে যে ? ফরমাস খাটবার জন্যে তুমিই ত আমার হয়ে ও-ঘরে যাবে বলেছিলে ?

শ্যামলী : (চাপা গলায়) চাকা ঘুরে গেছে মঙ্গলদা! কফি নিয়ে যাবার জন্যে ডাক পড়েনি—ডাক-ঘরে যাবার জন্যে ডাকছে।

মঙ্গল : এই রেতের বেলায় ? কেন বলত ?

শ্যামলী : জরুরী তার করতে হবে। তুমি শীগগীর যাও—পরে সব শুনো। ঐ শোনো—জোর ঘণ্টা বাজছে।

উপরের ঘরে তখন অবিশ্রান্ত ভাবে ঘণ্টা বাজিতেছিল।

* *
*

খাইবার টেবিলে খাওয়া প্রায় শেষ করিয়া চন্দ্রনাথ ও ইন্দ্রাণী গল্প করিতেছিল।

ইন্দ্রাণী : সব দিকে চীলের মত নজর না থাকলে বাবার এত বড় একটা ষ্টেট্ এই নখদর্পণে চোখ দুটো রেখে চালাতে পারি ? হঁ্যা—ভালো কথা, তার করবার জন্যে দশটা টাকা যা দিলে—কাল সকালেই চেয়ে নিও কিন্তু। এই টাকা পয়সা দেওয়ার ব্যাপারে আমি বড্‌ডো ভুলে যাই কিনা, তাই মনে করে চেয়ে নিতে হয়… বুঝলে ?

চন্দ্রনাথ : সোডা আর একটা ভেঙ্গে দেব ?

ইন্দ্রাণী : না। সোডার বদলে বরং একটু কফি পেলে—

চন্দ্রনাথ : সে ঠিক আছে। খাওয়ার পরে তুমি কফি খাও জানি।—আচ্ছা ? এখনি আনাচ্ছি। (কথার সঙ্গেই ঘণ্টা ঘুরাইতে লাগিল)

ইন্দ্রাণী : বেশ লোক ত তুমি ! তোমার চাকরকে এই মাত্র ডাকঘরে পাঠালে মনে নেই ? আবার বেল বাজিয়ে কাকে ডাকা হচ্ছে ? দোসরা চাকর কেউ আছে নাকি ?

ইন্দ্রাণীর কথার পরেই মলের ঝম ঝম শব্দে উভয়কে স্তব্ধ করিয়া দিয়া একখানি ট্রের উপর দুই পাত্র কফি বসাইয়া শ্যামলী দিব্য সপ্রতিভ ভাবে প্রবেশ করিল এবং বক্রদৃষ্টি দ্বারা উভয়ের মুখভঙ্গি এক নজরে দেখিয়া লইয়া চন্দ্রনাথ ও ইন্দ্রাণীর সামনে যথাক্রমে পাত্র দুইটি রাখিয়া দিল। ইন্দ্রাণীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি চন্দ্রনাথের দিকে। চন্দ্রনাথের ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ দৃষ্টি শ্যামলীর মুখে। শ্যামলী মুচকিয়া হাসিয়া চন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া কহিল :

শ্যামলী : ফিরে এসে মঙ্গলদা'র ঘরে বসেই গল্প করছিলাম চন্দরদা ! তারপর ডাকঘরে যাবার সময় আমার ওপরেই এই ভার দিয়ে গেল যে !

ইন্দ্রাণী : (চন্দ্রনাথকে) এ—কে ?

শ্যামলী : আমার কথা জিজ্ঞেস করছেন ? ওনাদের বাড়ীর ঝি। চন্দরদা ত কলকাতায় এসে ঘর-সংসারের কথা ভুলে গেছেন ; আর—ওনার মা তো ছেলের জন্যে ভেবে ভেবে হেদিয়ে পাগল হবার জো ! খোঁজ নিতে তাই আমাকেই আসতে হয়েছে।

ইন্দ্রাণী : এর কথা ত আমাকে বলনি ?

শ্যামলী : বলবেন কি করে ? আজই সাঁঝের বেলায় ত সবে এসেছি। তা চন্দর দা কি আমারে আমল দিতে চায় ? বলে কিনা, নিচের ঘরে লুকিয়ে থাকবি। কিন্তু ধম্মোর কল বাতাসে নড়ে গেল, ডাকঘরে যাবার বেলায় মঙ্গল দা যে বলে গেল, ঘন্টি বাজালেই যেন এগুলি নিয়ে ছুটে আসি। রাগ করনি ত চন্দর দা ?

ইন্দ্রাণী : ঝিয়ের সঙ্গে খুব মাখামাখি আছে দেখছি তো! আর, ওর কথাগুলিও ত ভাসাভাসি নয়। তাই ভাবি, আঁতের টান না থাকলে কাশী থেকে কলকাতায় ছুটে আসে!

শ্যামলী : তাহলে খাঁটি কথাই কইগো দিদিমণি, আসতে হয়েছে পেটের টানে। পয়সা উপায় করতে চন্দরদা কলকাতায় এলেন—বছর ঘুরতে চললো—টাকা পয়সা পাঠানো ত চুলোয় গেছে, নিজের খবরটি পর্যন্ত পাঠাননি গা!

চন্দ্রনাথ : তোর সেই বক বক করে বকা অভ্যেস ঠিক আছে দেখছি।

শ্যামলী : তা মিছে নয়—তোমার মতন নিশ্চুপ হয়ে থাকতে এখনো শিখিনি।

চন্দ্রনাথ : কে তোকে বলেছে—আমি চুপ করে বসে আছি ? খবর আমি দিইনি ? টাকা পাঠাইনি ? থাম্ বলছি।

শ্যামলী : দাবড়ি দিয়েই থামাবে নাকি ? তুমি মিথ্যে বলবে চোখ রাঙিয়ে—আর আমি মেনে নেব মুখ বুজিয়ে ? সে মেয়ে আমি নই।

ইন্দ্রাণী : ও—বাবা! বলে কি ?

চন্দ্রনাথ : কি বললি ?

শ্যামলী : বলছি—বছর আগে সেই যে কলকাতায় এসে ইষ্টিসান থেকে পৌঁছনোর খবরটি খালি দিয়েছিলে, তার পরে এ পর্যন্ত পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাসেই আছো !

চন্দ্রনাথ : (ইন্দ্রাণীর দিকে চাহিয়া) শুনছ এর কথা ? কি বলছে ? অথচ, আমি জানি—তুমি আমার মায়ের নামে নিজে টাকা পাঠিয়েছ, এখানকার খবর দিয়েছ !

ইন্দ্রাণী : স্থধু তুমি কেন—আমাদের সেরেস্তাস্থদ্ধু সবাই জানে। তবে তোমার ঝি না মানলেও, গবরমেণ্টের পোষ্টআফিস ত আর না বলবে না।

শ্যামলী : তাহলে মায়ের কপালে সেগুলো পথেই মারা গেছে। বরাত ভাঙলে পোড়া শোল মাছও জলে পালায় শুনিছি।

ইন্দ্রাণী : ভারি মুখের দৌড় ত তোমার দেখছি !

শ্যামলী : 'পড়লো কথা সভার মাঝে—যার কথা তার গায়ে বাজে !' কাজেই আমার কথা ত আপনার গায়ে ফুটবেই।

চন্দ্রনাথ : শ্যামল—চুপ করবি তুই ?

ইন্দ্রাণী : গলা চড়িয়ে আর চোখ রাঙিয়ে এ জাতের মেয়েকে ঢিট্ করা যায় না—এখানে দরকার চাবুক।

শ্যামলী : ও ! চাবুক নিয়েই বুঝি ঝি চাকরদের সঙ্গে আপনার ব্যাভার করা অভ্যেস ?

ইন্দ্রাণী : হ্যাঁ—তোমার মতন দজ্জাল ঝিয়েরা যদি মুখের ওপর তকরার করে, চাবুক দিয়েই তাদের সায়েস্তা করি।

শ্যামলী : আর চন্দরদার মতন সহজ মানুষরা—যারা মুখ না খুলে বুজিয়ে থাকে ? তাদের চাল-পড়া খাইয়ে বুঝি ভেড়া বানিয়ে রাখেন ?

ইন্দ্রাণী : এ কথার মানে?

শ্যামলী : চোখের সামনেই ত মানের বইটি হাজির রয়েছেন! এই বোকা পণ্ডিত মানুষটির আসা ইস্তক যে ব্যাভার করেছেন এনার সনে—ভালো মানুষটিকে কামিক্ষের ভেড়া বানিয়ে আপনার গোলকধাঁধায় কেমন করে ভুলিয়ে রেখেছেন—আগাগোড়া মনে মনে ভাবলেই মানে খোলসা হয়ে যাবে।

হঠাৎ আঘাত পাইলে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠার অভ্যাস এক সময় ইন্দ্রাণীর ছিল। সেই পুরাতন অভ্যাসটি শ্যামলীর মুখের রূঢ় আঘাতে বহুদিন পরে আবার আজ প্রকাশ পাইল। রোদনোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলিল :

ইন্দ্রাণী : মাষ্টার মশাই! আপনার ঝিকে দিয়ে অপমান করবার জন্যেই কি আমাকে—(অশ্রুর আবেগে স্বর রুদ্ধ হইল)।

চন্দ্রনাথ : শ্যামল—তুই কি···

শ্যামলী : (চন্দ্রনাথের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া) আমার কথাগুলি সত্যি বলেই আপনার পিত্তি বিষিয়ে উঠেছে—চোখেও জল এসেছে; আর আমার কিছু বলবার নেই। তোমারও যদি চোখ থাকে চন্দরদা, এ থেকেই সাধের শিষ্যিকে চিনতে পারবে।

ইন্দ্রাণী : (সরোদনে) আর নয়—আমি চললাম। (সবেগে উঠিয়া পড়িল)।

চন্দ্রনাথ : (সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রাণীর হাত ধরিয়া বসাইয়া) কোথায় যাবে, ব'স! আমি এখনি ওকে ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি।···· (শ্যামলীর দিকে চোখ পাকাইয়া জলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া) আর কোন কথা নয়; যে পথে এসেছ—সেই পথ দিয়ে এখনি বেরিয়ে যাও।

শ্যামলী : তোমার শিষ্যি চাবুক ফেলে চোখের জল ঢেলে আমার যাবার

পথ খুলে দিয়েছেন; কাজেই আমাকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে তোমাকে আর কোমর বেঁধে দাঁড়াতে হবে না। দুঃখ হচ্ছে, তবুও তোমার চোখ খুলল না দেখে; কিন্তু খুলবে শিগগীর—সেদিন বেশী দূরেও নেই। তখন আবার দেখা হবে—হয়ত, (ইন্দ্রাণীকে লক্ষ্য করিয়া) আপনার সঙ্গেও। নমস্কার!

রাজহংসীর মত গ্রীবটি উন্নত করিয়া ধীরপদে শ্যামলী চলিয়া গেল—দুইটি প্রাণী স্তব্ধভাবে বদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

*   *

*

চন্দ্রনাথের বাসার কাছেই মোটর লইয়া রত্নেশ্বরের বিশ্বস্ত সোফার শ্যামলীর প্রতীক্ষা করিতেছিল। চন্দরদার হুকুমে নিচে আসিয়াই শ্যামলী দেখিল, বাহির হইতে বাহিরের দরজায় ধীরে ধীরে কে যেন আঘাত করিতেছে। শ্যামলীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, মঙ্গলদা ফিরিয়া আসিয়াছে। দ্বার খুলিয়া দিতেই মঙ্গলদাকে দেখিতে পাইল; তাহার হাতে ডাকঘরের পরিচিত রসিদ।

ঘরের ভিতরে আসিয়া মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল: খবর কি শ্যামলদি—ডাক পড়েছিল নাকি?

সহাস্যে শ্যামলী উত্তর দিল: নিশ্চয়ই—তুমিও গেলে, তার খানিক পরেই আবার ঘণ্টি বাজলো। তোমার কথা মত তাড়াতাড়ি কাফির পিয়ালা নিয়ে উপরে হাজির হলাম। এসে অবধি যে ক্ষণটির প্রতীক্ষা করছিলাম, ঠিক সেটি এসে গেলো।

রুদ্ধ নিশ্বাসে মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল: তারপর?

তেমনই হাসিয়া শ্যামলী বলিল: বুঝতেই পারছ—তারপর কি

হওয়া সম্ভব। চন্দ্রদা ত আকাশ থেকে পড়লেন ; আর তাঁর ছাত্রী আমার আপাদমস্তক দেখে চোখ দুটো পাকিয়ে চন্দ্রদা'কেই জিজ্ঞাসা করলেন—এ কে ?

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল : দাদা বাবু কি কইলেন ?

শ্যামলী বলিল : মুখখানা বুজিয়ে গুম হয়ে বসে রইলেন ; মনে হলো চন্দরদা যেন পাথর হয় গেছেন। তাই আমাকে বলতে হলো—ওনাদের বাড়ীর ঝি আমি। চন্দরদা কলকাতায় এসে ইস্তক কোন খবর দেননি—তাই আসতে হয়েছে আমাকে।

ইহার পর শ্যামলী উপরের ঘরের অপ্রীতিকর বৃত্তান্ত সংক্ষেপে সমস্তই মঙ্গলদা'কে আস্তে আস্তে শুনাইয়া দিল। মঙ্গল কতকগুলি কথা—শ্যামলী যে কথাগুলি ইন্দ্রাণীর সমক্ষে চন্দ্রনাথকে সাহস করিয়া বলিয়াছিল—শুনিয়া যেমন খুশি হইল ; পক্ষান্তরে, চন্দ্রনাথ তাহাতে রুষ্ট হইয়া শ্যামলীকে তাড়াইয়া দিয়াছে শুনিয়া, তেমনই উগ্র হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল : তোমার এ অপমান আমি সইতে পারব না দিদি, এখুনি ওখানে গিয়ে ওনার শিষ্যির সামনেই যাচ্ছেতাই করব। তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোন দিদি—কি আমি বলি ?

এই স্পষ্টবক্তা তেজী মানুষটিকে ভালো করিয়াই শ্যামলী চেনে ; জানে যে, মুখে যাহা বলিয়াছে মঙ্গলদা, এখনই তাহা না করিয়া ছাড়িবে না—হয়ত এই রাত্রেই একটা বিশ্রী কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে। তাই তাড়াতাড়ি তাহাকে বাধা দিয়া এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিল : অমন কাজ কোরনা মঙ্গলদা, তাহলে আমার সব চেষ্টা পণ্ড হোয়ে যাবে। তুমিত্ত আমাকে চেন, অপমান সহ্য করে থাকবার পাত্রীই আমি নই। কিন্তু দেখছ ত, আমি ওঁর কোন কথা গায়ে না মেখে

হাসিমুখেই চলেছি। ঐ মেয়েটি ওঁকে যাদু করেছে মঙ্গলদা, আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, ঐ বোকা মানুষটির মাথায় হাত বুলিয়ে কাজ বাগিয়ে নিচ্ছে ও চালাকী ক'রে। কিন্তু অন্যায়ের শাস্তি আছেই। তুমি এখন কিছু ব'ল না মঙ্গলদা, শুধু সহ্য করে যাও, আর চন্দরদার ওপর নজর রাখ। তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে, যা কিছু দোষ সব আমার ওপরেই চাপিয়ে দিও তুমি—কোন তকরার কর'না ; বরং আমার এভাবে ছুট বলতে কাশী থেকে কলকাতায় আসার জন্যে ওঁর কাছে নিন্দেই ক'রবে। আখেরে তার ফল ভালো হবে। এখন আমাদের কর্তব্য হোচ্ছে, চন্দরদাকে ঐ যাদুকরীর কবল থেকে উদ্ধার করা—বুঝলে ?

এমন ভঙ্গি ও মর্মস্পর্শী সুরে শ্যামলী কথাগুলি বলিল যে, তাহার উদ্দেশ্য মঙ্গল ভালো করিয়াই বুঝিল এবং সেই নির্দেশ মত চন্দ্রনাথের মন যুগাইয়া চলিতেও সম্মত হইল।

*   *

*

রত্নেশ্বরের বাড়ীর সেই সুসজ্জিত কক্ষ মধ্যে রীতিমত বৈঠক বসিয়াছে। শ্যামলী যে একাকিনী চন্দ্রনাথের সহিত বোঝাপড়া করিতে গিয়াছে, এ কথা মহামায়া দেবী ভিন্ন বাড়ীর আর সকলেই জানিতেন। শ্যামলীর সাহস, সংযম, উপস্থিত-বুদ্ধি ও দৃঢ়তার উপর প্রত্যেকের প্রচুর আস্থা থাকিলেও, এই সাক্ষাৎকারে নূতন কি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সে সম্পর্কে সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রত্নেশ্বর রায় শুধু নিজের গাড়ীতে শ্যামলীকে চন্দ্রনাথের বাসায় পাঠাইয়াই কর্তব্য শেষ করেন নাই—তাহার রক্ষণা-বেক্ষণের ব্যবস্থাও প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। নিরাপদে শ্যামলীকে ফিরিতে

দেখিয়া প্রতীক্ষারত হিতার্থীরা যেমন আশ্বস্ত হইলেন, তাহার মুখে আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া তেমনই ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

শ্যামলী তাহার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে চন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎকার, কথোপকথন, পরে ইন্দ্রাণীদেবীর সহিত কথা-কাটা-কাটি এবং উপসংহারে চন্দ্রনাথ কর্তৃক বহিষ্কারের আখ্যানগুলি কৌতুকাবহ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে পরিবেষণ করিলেও শ্রোতাদের অন্তরে কিন্তু কিছুমাত্র কৌতুকের উদ্রেক হইল না।

রত্নেশ্বর বলিলেন: ইন্দ্রাণী ভাদুড়ীর গান আমরা পূর্বেও শুনেছিলাম, তখন তাতে বিশেষ প্রতিভার তেমন কোন পরিচয় পাইনি। কিন্তু চন্দ্রনাথবাবুর আসবার পরই তাঁর শিক্ষায় ও সংস্পর্শে যে ওঁর এতটা উন্নতি হয়েছে, সে কথা উনি আমাদের কাউকে জানতে দেননি। কয়েকটা আসরে ওঁর গান শুনে, আর গানগুলি উনিই লিখেছেন জেনে আমরা খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। এমন কি, ওঁকে নিয়ে যেদিন আমরা গানের আসর বসাই—সেদিনও চন্দ্রনাথবাবু অন্ধকারে ছিলেন। ঐ ঘটনার পর ডাঃ ভাদুড়ীই চন্দ্রনাথবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেন, তখন জানতে পারি যে, উনি বেনারসের এক জিনিয়াস, আর ওঁর সংস্পর্শেই ইন্দ্রাণী ভাদুড়ীর এত উন্নতি। তখনও কি বুঝতে পেরেছিলাম যে, উনি একবারে পুকুরচুরি করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন!

চন্দ্রাবতী বলিলেন: কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবুই বা কি ধাতের মানুষ? আমরা ত জানি, শিল্পীরা আর সব ছাড়লেও নিজের সৃষ্টির দাবী কখনো অপরকে ছেড়ে দিতে পারে না। আমি আসরে গান গেয়ে আসর বাজিয়ে এলাম, তার খ্যাতি যদি চন্দ্রাবতীর বদলে লীলাবতীর নাম রটে যায়, সে কিন্তু ভারি লাগে—সহ্য করতে পারি না। কোনো কবির লেখা যদি আর কেউ নিজের বলে চালায়, কবির কি তা বরদাস্ত হয়?

চন্দ্রনাথবাবু কি করে যে ইন্দ্রাণীকে এতখানি প্রশ্রয় দিলেন, সেইটিই মস্ত সমস্যা।

শ্যামলী নীরবেই এই সব শুনিতেছিল। গীতা তাহার ঠিক পাশেই বসিয়া ছিল, আর মাঝে মাঝে আঙ্গুলের খোঁচা দিতেছিল শ্যামলীর গায়ে। এই সময় কানের কাছে মুখখানা বাড়াইয়া দিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া গীতা বলিল: এখন তুমিই চন্দ্রবাবুর হয়ে কৈফিয়ৎ দাও—অতটা প্রশ্রয় তাঁর ছাত্রীকে দিলেন কেন?

গীতার কথাতে নয়, শ্যামলীও বুঝিয়াছিল যে, এখন তাহার কিছু বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে। এখনও চুপ করিয়া থাকা উচিত নয়। সুতরাং সে বেশ শক্ত হইয়াই স্পষ্ট করিয়া বলিল: চন্দরদা যে কি ধাতের মানুষ, আমার চেয়ে বেশী কেউ জানেন বলে আমার মনে হয় না। সেই যে একটা কথা আছে—ডিগ্রী হলেও উল্লাস নেই, আবার ডিস-মিসেও দুঃখ নেই—এই ধাতের মানুষ উনি। তার পর, পশ্চিমেই মানুষ, শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতা সব কিছুই ওদিককার, কলকাতার সংস্রবে এই প্রথম এসেই ইন্দ্রাণী ভাদুড়ীর মত এমন এক মেয়ের পাল্লায় পড়েছেন, যাদুকরীর মত যে অকাট্য ইন্দ্রজাল রচনা করতে জানে। নৈলে, ভেবে দেখুন দেখি, —লেখা পড়া জানা কৃতবিদ্য এ-যুগের কোন ছেলে কি এমন বেহুঁস হয়ে থাকতে পারে? ইন্দ্রাণী ওঁকে বলেছেন—কাশীতে খবর দেওয়া হয়েছে, টাকা মণি অর্ডার করেছে....বাস্—এর ওপর আর কথা কি? কিন্তু আমি এই সার বুঝিছি—বালির ওপর ভিত গড়লে যেমন তা ভেঙে পড়ে, তেমনি মিথ্যার ওপরে কোন যুক্তি বেশী দিন টিকতে পারে না। অন্ততঃ আমি—ওঁর মার দিকে চেয়ে—এত বড় অন্যায় কখনো সহ্য করব না; ইন্দ্রাণীর মুখোস খুলে দিয়ে ওঁর মায়ের কাছে আমি ওঁকে যেমন করে পারি

এনে হাজির করবই। ওখান থেকে আসবার সময় মনে মনে আমি এই পণ করে এসেছি জেঠাবাবু,—আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।

শেষের কথাগুলি বলিতে বলিতেই শ্যামলীর স্বর গাঢ় হইয়া আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া রামময়ের দুই পায়ের তলায় মুখখানি গুঁজিয়া দিল। রামময়ও তৎক্ষণাৎ সস্নেহে দুই হাতে তাহার মাথাটি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন: স্বধু আমার আশীর্বাদ নয় মা, ওপর থেকে তাঁদের দুজনের আশীর্বাদও তোমার ওপরে পড়ছে। তোমার পণ রক্ষা হবেই।

* *
*

সন্ধ্যায় ড্রয়িং রুমে ইন্দ্রাণীর বন্ধু বান্ধবীরা উপস্থিত। ইন্দ্রাণী ভনিতা করিয়া বলিতেছিল—মাস্টার মশয়ের বাসায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া তাহাকে কিরূপ বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয়। কাহিনীটি সকলেই দিব্য উপভোগ করিল; তবে পুরুষ বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ মাস্টারের সৌভাগ্যে ঈষৎ ঈর্ষাবোধও করিল।

বন্ধু কুঙ্কুম বিদ্রূপের সুরে বলিল: ভোজাটা আপনি একলা একলাই খেলেন—আমরাও যদি যেতাম, চন্দ্রনাথবাবুর সেই মুখরা তরুণী ঝিটিকে দেখে তার সম্বন্ধে কিছু য়্যানালাইজ করতেও পারতাম।

কক্ষের আর সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল: হিয়ার, হিয়ার।

ইন্দ্রাণী সঙ্গে সঙ্গে বলিল: বাপির মুখে ওদেশের দেহাদী মেয়েদের গল্প শুনেছিলাম আগেই। মাস্টার মশায়ের দাসীকে দেখে যা বুঝলাম, বাপির কথার সঙ্গে মিলে গেছে। তবে কুঙ্কুম বাবু যা ভাবছেন, তা নয়; মাস্টার মশাই বেচারীর…

ঠিক এই সময় চন্দ্রনাথকে ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ইন্দ্রাণী

তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল: আসুন মাস্টার মশাই, আপনার কথাই হচ্ছিল।

ইলা সহাস্যে বলিল: হ্যাঁ মাস্টার মশাই, আমাদের সবাইকে লুকিয়ে আপনার ছাত্রীকেই শুধু নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন?

শোভা বলিল: শুনলাম, এত আয়োজন নাকি করেছিলেন— আমরা সবাই মিলে খেলেও কুলিয়ে যেত?

নীলিমা বলিল: এখন আপনার ঝিয়ের খবর বলুন? ইন্দ্রার সামনে ত তাড়ালেন—তার পর ডেকে এনে মান ভাঙিয়েছিলেন ত?

স্বাভাবিক গম্ভীর মুখখানা আরও গম্ভীর করিয়া চন্দ্রনাথ এক খানা সোফার উপর বসিয়া পড়িল। সে বুঝিয়াছিল যে, রাত্রির ব্যাপারটি ইন্দ্রাণী রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছে। তবে তাহার উপর যে ইন্দ্রাণীর সন্দেহ হয় নাই শ্যামলী সম্পর্কে—এ কক্ষে প্রবেশ করিবার প্রাক্কালেই ইন্দ্রাণীর মুখের কথা হইতেও তাহার আভাস পাইয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছে।

চন্দ্রনাথের সমক্ষে এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটি লইয়া আলোচনা বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি বলিল: এখন ওসব কথা থাক, আসল কথায় আসুন মাস্টার মশাই! শুনলাম যে, রাগিণী দেবী এসেছেন, আর রত্নেশ্বর বাবুর চৌরঙ্গীর বাড়ীতেই উঠেছেন। আপনি কিছু শুনেছেন তাঁর সম্বন্ধে?

চন্দ্রনাথ: তাঁর আসবার কথা খবরের কাগজেও বেরিয়েছে— আজকের কাগজেই দেখিছি।

নিখিল: কিন্তু মজা এই, বিশেষ কিছু ছাপেনি ওঁর সম্বন্ধে। অন্ততঃ ফটোটাও দেওয়া উচিত ছিল। হোল ইউ, পি গানের প্লাবনে ভাসিয়ে দিয়ে কলকাতায় এসেছেন উনি—এইটেই কেবলমাত্র পাবলিসিটি করেছে।

এ ছাড়া আর কিছু নেই। কত বয়স, চেহারা কেমন, কোন্ জাত—এ সবের—নো নিউজ।

প্রণব : হ্যাঁ, সকলেই এক্সপেক্ট করেছিল যে, রাগিণী দেবীর ফটো নিশ্চয়ই কাগজে বেরুবে। পাবলিসিটির দিক দিয়েও ত এটা উচিত ছিল?

কুন্থুম : তাহলে বোঝা যাচ্ছে—চেহারার দিক দিয়ে হোপলেস্! তাই অরগানাইজারের তরফ থেকেও এপর্যন্ত ফটো প্রিণ্ট করলে না মোটেই।

ইলা : নামটি কিন্তু খুব মিষ্টি—রা-গি-ণী!

নীলিমা : অন্ততঃ ওঁর প্রতিদ্বন্দ্বিনীর নামের সঙ্গে পদ্যের ছন্দের মতন বেশ মিল হয়েছে—ইন্দ্রাণী ভার্সেস রাগিণী।

ইন্দ্রাণী : নামটাও হয়ত ক্রিয়েট করা—পাবলিসিটির সুবিধা হবে বলে লাগিয়েছে।

চন্দ্রনাথ : এখন পর চর্চা রেখে নিজের চর্কার দিকেই নজর দিলে ভাল হয়। কোন্ কোন্ গান গাইবে—সেগুলো ঠিক করে ফেল; তার পর যে দুটো দিন মাঝে রয়েছে, ভালো করে বিহার্সেলের ব্যবস্থা কর—এঁরাও শুমুন।

ইন্দ্রাণী : আমি নিজে থেকেই তার একটা লিষ্ট্ করে রেখেছি; এই দেখুন—

কাছের টিপয়টির উপর ক্লিপে আঁটা গানগুলির পাণ্ডুলিপি লইয়া ইন্দ্রাণী চন্দ্রনাথের হাতে দিল। আটখানি শ্লিপে আটটি গান পর পর গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। ইতিমধ্যেই সঙ্গীত সম্মেলনের পক্ষ হইতে নির্দেশ আসিয়াছে যে, প্রথম দুই দিন উভয় গায়িকা প্রত্যেকে তাঁহাদের ঈপ্সিত আটখানি করিয়া গানের আলাপ করিবেন। প্রত্যেক গানের পর ইন্‌টারভ্যাল অর্থাৎ বিরতি অবশ্য থাকিবে।

চন্দ্রনাথ পড়িয়া দেখিল, আটখানি গানের মধ্যে সাতখানি তাহারই রচিত—একখানি মাত্র অন্যের, কিন্তু তাহাও চন্দ্রনাথের অজ্ঞাতে তাহার খাতা হইতে লিখিয়া লওয়া—গুরুর সেই নিষিদ্ধ গানটি। ইন্দ্রাণী আড় চোখে চন্দ্রনাথের ভাবভঙ্গি দেখিতেছিল। গানগুলি দেখিয়া চন্দ্রনাথ বলিল: এ কি করেছ—সাতখানাই যে এক ক্লাসের গান হয়ে গেল।

ইন্দ্রাণী: একখানি ত অন্য ক্লাসের আছে।

চন্দ্রনাথ: কিন্তু ওখানিত গাওয়া চলবে না।

ইন্দ্রাণী: কেন—প্রিপেড্ টেলিগ্রামে পারমিশান চাওয়া হয়েছে ত?

পকেট হইতে লেফাফাবদ্ধ টেলিগ্রাম খানি বাহির করিয়া চন্দ্রনাথ ইন্দ্রাণীর হাতে দিয়া বলিল: টেলিগ্রাম ফিরে এসেছে—গুরুদেব গোয়ালিয়রে নেই।

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া তারের খবরটির উপর চোখের দৃষ্টি বুলাইয়া পরক্ষণে সেই দৃষ্টি চন্দ্রনাথের মুখে ফেলিয়া ইন্দ্রাণী বলিল:

ইন্দ্রাণী: তাহ'লে তার করা, আর ধ্রুপদ গানখানা সাধাই বাজে হলো?

গম্ভীর মুখে চন্দ্রনাথ বলিল: গানখানা যে দিন পাও, তখনি বলে ছিলাম ত—এ নিষিদ্ধ গান!

চন্দ্রনাথের অজ্ঞাতেই ইন্দ্রাণী বন্ধু-বান্ধবীদের লইয়া সম্মেলনের জন্য এই কয়খানি গান নির্বাচিত করিয়াছিল। নিষিদ্ধ গানখানির ইতিহাসও ইন্দ্রাণী ইহাদিগকে বলিয়াছে। বন্ধু-বান্ধবীরা মত প্রকাশ করিয়াছে যে, ও সব প্রেজুডিসের কোন অর্থ হয় না—ক্লাসিকের দিক দিয়ে এই একখানি গানই আসর মাত করবে। এগান গাওয়া চাইই?

এখন চন্দ্রনাথের মুখে কথাটা শুনিয়া কুঙ্কুম বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলিল: বাইবেলে নিষিদ্ধ ফলের খবর আছে শুনিছি। কিন্তু গানও যে নিষিদ্ধ হতে পারে, এই নতুন শোনা গেল। দিস ইজ এ ষ্ট্রেঞ্জ!

গম্ভীর মুখে চন্দ্রনাথ কহিল: এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। পৃথিবীতে অনেক কিছুই নিষিদ্ধ আছে। সোজা কথাই ভেবে দেখুন না, ইচ্ছা করলেই কি পাবলিক আসরে কোন কবির অজ্ঞাতে তাঁর লেখা কোন গান গাইতে পারি? আইনের দিক দিয়ে এটা নিষিদ্ধ ব্যাপার! এই গানখানি সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে।

মুখখানা ভার করিয়া ইন্দ্রাণী বলিল: গানখানা পাওয়া ইস্তক ত আপনি ঐ সুর ধরেছেন! আপনার ইচ্ছাই নয় যে, আমি এই গান খানা গেয়ে নাম করি—সেইজন্যে এর সুরটা পর্যন্ত দেন নি।

চন্দ্রনাথ: কেন দিইনি সে কথাত সেই দিনই তোমাকে বলেছিলাম—এ গানের সুর দেবার সাধ্য বা অধিকার আমার নেই।

নিখিল: এ কিন্তু ভারি আশ্চর্য কথা চন্দ্রনাথবাবু! গানখানি দিলেন, অথচ তার সুরটি চেপে রাখলেন?

চন্দ্রনাথ: ও গান ত আমি ওঁকে দিই নি—বৃথাই আমাকে খোঁটা দিচ্ছেন।

শোভা: বা-রে! আপনার ছাত্রী ইন্দ্রা—আপনি ওকে দিলেন না ত পেলে কোথা থেকে ও?

চন্দ্রনাথ: আমার অপরাধ—গানের খাতা খানা ফেলে গিয়েছিলাম এই ঘরে—সেই সুযোগে ...

প্রণব: ইন্দ্রাণীদেবী আপনার খাতা থেকে গান খানি চুরি করেছিলেন—এই ত?

কুঙ্কুম: থানায় তাহলে ডাইরীও করে রেখেছেন বলুন?

বান্ধবীরা এক সঙ্গে কলরব করিয়া উঠিল:

—অ মা, গান চুরি!

—হ্যাঁ ইন্দ্রা, এ তাহলে চুরির ধন?

চন্দ্রনাথ: ছি, ছি, আপনারা এ সব কি বলছেন?

নীলিমা: বেশ ত, তাহলে এই গানখানায় সুর দিয়ে আমাদের সবাইকে শুনিয়ে দিন আপনি—ইন্দ্রারও আফশোষ মিটে যাক্।

চন্দ্রনাথ: তাহলে আমার কথা শুনুন—ও গানে সুর দেবার সাধ্য যেমন আমার নেই, ওর জন্যে আপনাদের অনুরোধ করাও তেমনি অন্যায় এবং অনধিকার প্রয়াস।

বন্ধুগণ একসঙ্গে মুখ ও চক্ষুর ভঙ্গি করিয়া নীরবে তাকাইল এবং বান্ধবীরা অনুরূপ ভঙ্গিতে বলিল: তাহলে আমাদের মুখবন্ধ করাই উচিত।

ক্রোধে ক্ষোভে ও অভিমানে ইন্দ্রাণী গানের ফাইলটি চন্দ্রনাথের হাত হইতে ক্ষিপ্রহস্তে টানিয়া লইল এবং শেষের দিকের সেই নিষিদ্ধ গানের শ্লিপটি বাহির করিয়া টুকরা টুকরা করিতে করিতে বলিল: গানটি তাহলে নিকেশ করে দিলাম, আপনি নিশ্চিন্ত হোন!

* *

*

দুই প্রদেশের দুইটি প্রতিভাময়ী সঙ্গীত-সাধিকার প্রতিযোগিতামূলক বিরাট সঙ্গীত সম্মেলনের নির্দিষ্ট দিন ও সময় অবশেষে আসিয়া গেল। দেশের কলাবিদ্ এবং সঙ্গীতানুরাগী-সমাজ সাগ্রহে এই দিনটির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বর্দ্ধিতহারে আসন মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও কয়েকদিন পূর্বেই প্রেক্ষাগারের সকল শ্রেণীর আসন গুলির টিকিট বিক্রীত হইয়া গেল। সারা সহর এবং সহরতলীসমূহে উৎসাহ ও কৌতূহলের অন্ত রহিল না।

সম্মেলনের কয়েকদিন পূর্বেই প্রচারিত হইল যে, টসের পরীক্ষা অনুসারে ইন্দ্রাণীদেবীই প্রথমদিনে সঙ্গীত-প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ

পাইয়াছেন। সঙ্গীত-সম্পর্কে তাঁহার যত কিছু নৈপুণ্য এই দিনই একে একে প্রকাশ করিতে হইবে। দ্বিতীয় দিনের আসরে অবতীর্ণা হইবেন রাগিণী দেবী। বহুদর্শী বিচক্ষণ অভিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ সঙ্গীত-বিদ্‌গণ উভয় গায়িকার যোগ্যতার মান নির্ণয় করিবেন এবং তৃতীয় দিনের আসরে তাহা ঘোষণার পর তাঁহাদিগকে মানপত্রাদির দ্বারা সম্মানিত ও অভিনন্দিত করা হইবে। এই আসরেও তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে সম্প্রীতির সঙ্গে সঙ্গীতের আলাপ করিয়া শ্রোতাদিগকে আনন্দ দিবেন।

আসরে এক একটি গানের পর গায়িকাকে বিশ্রাম দান এবং অভ্যাগতদের আনন্দবর্ধন কল্পে নৃত্যশীলা তরুণীদের নৃত্যের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমদিনের নৃত্যের ব্যবস্থা সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষগণকেই গ্রহণ করিতে হয়। তাঁহারা ইন্দ্রাণী ভাদুড়ীর এক একটি গানের পর বিরতি স্বরূপ বিভিন্ন নর্তকীর নৃত্যের পরিকল্পনায় অবহিত হন। কিন্তু রাগিণী দেবীর পক্ষ হইতে কর্তৃপক্ষকে জানান হয় যে, তাঁহার প্রতিটি গানের পর তাঁহারই ভগিনী কুমারী গীতাদেবী সেই গানের নৃত্য-রূপ দিবেন। তাঁহার এই প্রস্তাব কর্তৃপক্ষ সানন্দে অনুমোদন করেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষেও ইহা নূতনতম আকর্ষণ স্বরূপ হইয়াছে।

ইন্দ্রাণীর কানে কথাটা উঠিতেই সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাগিণী দেবীর ব্যবস্থাটি যে অভিনব এবং স্বদলভুক্তা নর্তকী কর্তৃক বিরাম কালে এরূপ নৃত্য তাহার গানের পরিপোষক হইবে, ইন্দ্রাণীর মজলিসে শুভানুধ্যায়ী বন্ধু-বান্ধবীরা এরূপ মন্তব্য করিলে ইন্দ্রাণীর মাথা গরম হইয়া গেল। কিন্তু তখন আর পরিচিতা কোন নৃত্যপটিয়সীকে দিয়া তাহার গানগুলির নৃত্য রূপায়নের সময় ছিল না। শেষে ক্ষোভটা চন্দ্রনাথের উপরে গিয়া পড়ায়; রুক্ষস্বরে জানাইল:

ইন্দ্রাণী: মেড়োর দেশের মেয়ে মাথা খেলিয়ে এই নভেলটি করে

বাহোবা নেবার কেমন ফন্দী এঁটেছে দেখুন! আপনিও ত মেড়ো দেশে মানুষ, আপনার মাথায় কিন্তু ফন্দী বলতে কিছু নেই!

চন্দ্রনাথ: তুমি ত জান—আমি ফন্দীবাজ নই, ধড়িবাজও নই, আমার কাজ—গান বাধা আর সাধা; এই কাজই বরাবর করে এসেছি।

ইন্দ্রাণী: তাহলেও মাঝে মাঝে মাথা খেলাতে হয়। আপনি ইচ্ছা করলে, অমনি একটা কিছু প্লান করতে পারতেন না বলতে চান? আমার গানের পর—হয়ত কতকগুলো ভাড়াটে নাচওয়ালী এনে ওঁরা নাচাবেন।

চন্দ্রনাথ: আমি গান নিয়েই ব্যস্ত থাকি—আমার লক্ষ্য গানে। তোমার শুভানুধ্যায়ীরা ত ও ব্যাপারে কোন নূতন পরিকল্পনা করতে পারতেন! ওখানকার কর্তৃপক্ষের নাচের প্ল্যানও তুমিই মঞ্জুর করেছিলে। এখন রাগিণী দেবীর ব্যবস্থা দেখে হিংসা করা মানে—নিজেকেই ছোট করা। এ ভাল নয়।

চন্দ্রনাথের মুখে একথা শুনিয়া ইন্দ্রাণী যেন অগ্নিপৃষ্ট বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিল; গর্জন করিয়া বলিল:

ইন্দ্রাণী: কি বললেন—আমি হিংসা করে এ কথা বলেছি? আমাকে হিংসুটে বলতে চান? জানেন—আমার এডুকেশন, কালচার, সিভিলিজেসন সব কলকাতায়—মেড়ো দেশে নয়!

অসীম ধৈর্য্যশীল চন্দ্রনাথ ইন্দ্রাণীর মত উত্তেজিত না হইয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ শান্তস্বরে ধীরে ধীরে বলিল:

চন্দ্রনাথ: কিন্তু সত্যকার শিক্ষা, কৃষ্টি বা সভ্যতার কি এই নিদর্শন বলতে চাও যে, একই দেশের আর একটি মেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিনী হয়েছেন

বলে, তাঁর দেশ-ভুই নিয়ে ওভাবে তাঁকে হেনস্তা করা? অথচ ওঁরই বিশিষ্ট পরিকল্পনা তোমার বিক্ষোভের কারণ হয়েছে। এর জন্য তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।

ইন্দ্রাণীর শুভানুধ্যায়ী বন্ধু-বান্ধবীরা ইন্দ্রাণীকে তাতাইয়া দিয়া এতক্ষণ কৌতুক উপভোগ করিতেছিল; এই সময় তাহারাও ইন্দ্রাণীকে প্রবোধ দিতে লাগিল:

নীলিমা: এখন আর মাথা গরম ক'রনা ইন্দ্রা—

কুসুম: তা ছাড়া, নতুন কিছু করবার টাইমও যখন আর নেই!

চন্দ্রনাথ: নূতন কিছু করবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা— যখন নিজেই তুমি গানের নৃত্যরূপ দিবে। নৃত্যের ব্যাপারে তোমার চেয়ে বেশী পটিয়সী আমি ত আর কোন মেয়েকে দেখিনি।

বন্ধু বান্ধবীরা একসঙ্গে বলিয়া উঠিল: হিয়ার, হিয়ার।

ইন্দ্রাণীর মুখে এখন হাসি ফুটিল—আড়চোখে চন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মুখের ভাবটা দেখিয়া লইল।

শোভা বলিল: তোমারই যে অন্যায় ইন্দ্রা, দেশভুঁই তুলে তুমি ঐ মেয়েটার ওপর গায়ের জ্বালা ঝাড়লে, কিন্তু তোমার মাষ্টার মশাই যে ঐ দেশের ছেলে, সে কথা বোধ হয় মনে ছিল না?

ইন্দ্রাণী এবার প্রসন্ন দৃষ্টিতে চন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া মিষ্ট সুরে বলিল: আমার মাষ্টার মশাই হচ্ছেন সত্য যুগের মানুষ—সদাশিব ভোলানাথ, উনি আমার কথায় রাগ করেন না।

ইন্দ্রাণী ভালো করিয়াই জানে যে, এখন মাষ্টার মহাশয়কে চটাইলে তাহারই সমূহ ক্ষতি।

* * *

প্রথম দুই দিনের আসর সায়াহ্নে এবং তৃতীয় দিনের বৈঠক পূর্বাহ্নে অনুষ্ঠিত হইবে, এরূপ ব্যবস্থা উদ্যোক্তাদের পক্ষ হইতে স্থির থাকায় সুসজ্জিত আলোকোদ্ভাষিত বিশাল প্রেক্ষাগারে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই শ্রোতৃবৃন্দ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইয়া সাগ্রহে যবনিকা অপসারণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

এই সময় অনুষ্ঠানটির অধিনায়ক রত্নেশ্বর রায় প্রসারিণী যবনিকার পাশ দিয়া ধীরে ধীরে মঞ্চের প্রত্যন্ত অংশে সঙ্কীর্ণ স্থানটিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সমগ্র প্রেক্ষাগার পরিপূর্ণ; উপরে নিচে সর্বত্র সমান জনসমারোহ—রস-রুচি বোধ-সম্পন্ন নর-নারীদের সমাগমের জন্য কোনরূপ চাঞ্চল্য বা কোলাহল নাই—জনপূর্ণ সুবিস্তীর্ণ স্থান নিস্তব্ধ। সমবেত মহিলা ও পুরুষদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া রত্নেশ্বর রায় একটি সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ দিলেন। যথা :

কলা-বিদ্যার প্রতি নিছক ভক্তি ও অনুরাগ বশতঃই কলা-লক্ষ্মীর সেবাব্রতীরা সঙ্গীত-সম্পর্কে এই বিচিত্র আয়োজন করেছেন। সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে অসাধারণ গায়কগায়িকার আবির্ভাব এবং তাঁদের মনীষামণ্ডিত বৈদগ্ধময় অবদান বিপুল সফলতার স্বাক্ষর রেখে গেছে। ইদানীং একই সময়ে ভারতের দুটি বিভিন্ন প্রদেশে অসামান্য প্রতিভাময়ী দুটি কলাবতী কন্যার আকস্মিক প্রকাশ ও বিস্ময়াবহ খ্যাতি দেশবাসীকে চমৎকৃত করে তুলেছে। এঁদের প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে একথাও রাষ্ট্র হয়েছে যে, উভয়েই এঁরা তরুণ বয়সে কলাবিদ্যা অর্জন করে সহজাত প্রতিভার সাহায্যেই সিদ্ধিলাভের সুযোগ পেয়েছেন। দুজনেই এঁরা অভিজাতবংশের কৃষ্টিশীলা কন্যা। কিছু পূর্বে কুমারী ইন্দ্রাণী ভাদুড়ী কলকাতায় এমনি এক আসরে তাঁর নিজস্ব ব'লে কথিত অভিনব আধুনিক সঙ্গীতের আলাপ করে সারা সহরে একটা

আলোড়ন তুলেছিলেন। ওদিকে—রাগিণী দেবীও রাগপ্রধান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব এনে যুক্তপ্রদেশের গুণী কলাকারদের মধ্যে পরম সম্মানীয় শ্রেষ্ঠ আসন লাভের উপযুক্তা বলে স্বীকৃতা হয়েছেন। এই অবস্থায় আমরা সাধারণ স্তরের কিংবা বহুপরিচিত খ্যাতনামা কলাবিদ্‌দের সমাবেশ না করে, কেবলমাত্র দুই প্রদেশের এই দুটি সুর-সিদ্ধা কলাবতীর সমন্বয়ে রস-যজ্ঞের এই আয়োজন করেছি। বহু বহু কলাকারদের পরিবর্তে মাত্র নবাগতা দুটি প্রতিভাময়ী কলাবতীর দ্বারা বিরাট সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্দেশ্য সার্থক করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই উদ্যম, আয়োজন এবং প্রচেষ্টা যে সর্বাংশে সফল হয়েছে, পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগারই তার সাক্ষ্য দান করছে। স্থানাভাবে যাঁরা এই সম্মেলনে যোগদানের সুযোগ পাননি—তাঁদের জন্য আমরা বেদনাবোধ করছি এবং তাঁদের সংখ্যাও সুপ্রচুর। আপনারা এখনই কুমারী ইন্দ্রাণী দেবীর সাঙ্গীতিক মনীষার সঙ্গে পরিচিত হবেন।

অভিভাষণ সাঙ্গ হইবামাত্র প্রেক্ষাগার হইতে সহর্ষ করতালি এবং মঞ্চ হইতে বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের মিলিত ধ্বনির সংযোগে সমগ্র মণ্ডপ মুখরিত হইল।

ঐক্যতান-বাদনের পরেই বৃহৎ যবনিকা দুই দিকে ধীরে ধীরে অপক্রান্ত হইবা মাত্র আলোকোদ্ভাষিত মঞ্চে উজ্জ্বল পরিচ্ছদ ও মহার্ঘ রত্নালঙ্কারে সুসজ্জিতা ইন্দ্রাণী ভাদুড়ীকে কিংখাপমণ্ডিত উচ্চাসনে সম্রাজ্ঞীর মত গম্ভীর ভঙ্গিতে উপবিষ্টা দেখা গেল। তাহার হাতে রত্ন-খচিত রাজদণ্ডের পরিবর্তে দুর্মূল্য একটি বিলাতী বাদ্য-যন্ত্র। সাজ ও সজ্জায় এবং বসনে ও ভূষণে—আধুনিক কালের দুর্লভ-সমন্বয়ের কোন ত্রুটি বা অভাব কোথাও কিছুমাত্র নাই। বর্তমান যুগের কোন দেশের সম্রাট-নন্দিনীও রূপ-সজ্জায় এত অধিক জাঁকজমকপূর্ণ বসন-ভূষণ ব্যবহার

করেন কিনা সন্দেহ। একেই ত তাহার চক্ষুচমৎকারী রূপ,—তাহার উপর উজ্জ্বল আলোকময় মঞ্চে অত্যুজ্জ্বল পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের এইরূপ বিচিত্র ছটা। সুতরাং প্রেক্ষাগারে উপস্থিত সহস্রাধিক দর্শকের চক্ষুগুলি যদি তাহার আভায় পলক হারাইয়া ফেলে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ক্ষণিক নিস্তব্ধতার পর মুগ্ধ দর্শকগণ সহর্ষে করতালি দিয়া প্রথম দিনের মঞ্চাধিষ্ঠাত্রী সঙ্গীত-অধিরাজ্ঞী ইন্দ্রাণী ভাদুড়ীকে সম্বর্দ্ধনা জানাইলেন।

ইন্দ্রাণী নীরবে তাহার রত্নখচিত মুকুটমণ্ডিত শিরটি সামনের দিক ধীরে ধীরে সামান্য নত করিয়া পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগারের উদ্দেশে গর্বিত ভঙ্গিতে অভিবাদন জানাইল। ঠিক এই সময় ইন্দ্রাণীদেবীর উচ্চ সিংহাসনের উভয় পার্শ্বের আবরণ অপসারিত হইল এবং বিবিধ বাদ্য-যন্ত্রের ঝঙ্কার তুলিয়া সঙ্গতকারীরা আত্মপ্রকাশ করিল। পরক্ষণে ইন্দ্রাণী নৃত্যের তালে তালে আরম্ভ করিল চন্দ্রনাথের রচিত একখানি আধুনিক গান। গানের সময় সঙ্গতিদের ঐক্যতানবাদ্যের সুরই তাহাকে প্রেরণা যোগাইল। প্রেক্ষাগার হইতে উল্লাসধ্বনির সহিত মন্তব্যও শোনা যাইতে লাগিল—এ যেন গীত ও নৃত্যের রাজসূয় যজ্ঞ! উপরের বক্স হইতে ইন্দ্রাণীর বন্ধুদের মন্তব্যও শোনা গেল—ইহার উপর রাগিণী দেবী আর নূতন কি রাগ দেখাইবেন!

প্রথম গানের পর দৃশ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমান বয়সের সমান আকৃতির কতিপয় রূপসী নর্তকী নানা ভঙ্গিতে নৃত্য লীলায় দর্শকদের আনন্দদান করিল। নৃত্যের পর যবনিকা। খানিক পরে পুনরায় যবনিকা উঠিলে সঙ্গতকারীদের সহিত ইন্দ্রাণীকে সমাসীন দেখা গেল। আরম্ভ হইল ইন্দ্রাণীর দ্বিতীয় গান।

এইভাবে পর্যায়ক্রমে ইন্দ্রাণীর গীতের পর ব্যালেট নৃত্য পরিবেষণের

ব্যবস্থা থাকায়, সম্পূর্ণ মজলিসটি মোটের উপর শ্রোতাদের উপভোগ্য হইল। গানে নূতনত্ব থাকায় এবং সুরও গানের উপযুক্ত হওয়ায় গায়িকা তাঁহার গীতায়নে রসোত্তীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও অভিমত প্রকাশ পাইল। প্রথম ও শেষ গানের সহিত ইন্দ্রাণীর নৃত্য বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক হয় এবং তৎকালে প্রেক্ষাগার উল্লাসধ্বনিতে ঘন ঘন মুখরিত হইয়া উঠে! সহস্রাধিক মুগ্ধ শ্রোতার অভিনন্দন এবং উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রাণী সদলবলে বিদায় লইল।

চন্দ্রনাথ এবং ইন্দ্রাণীর বন্ধুবান্ধবীদের জন্য দ্বিতলে দুইখানি বক্স নির্দিষ্ট ছিল। দর্শকরূপেই তাহারা ইন্দ্রাণীর গান উপভোগ করিবে এবং সাধারণ দর্শকদের অভিমত সংগ্রহ করিয়া তাহাকে যথাসময় জানাইবে—বিশেষতঃ, কোন বিষয়ে ইন্দ্রাণীর ত্রুটি চোখে পড়িলে ভিতরে দিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিকে—এরূপ ব্যবস্থা ছিল। এদিকেও একটি বিচার পর্ষৎ বসিয়াছিল ইন্দ্রাণীর পক্ষ হইতে চন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়া। বিরামকালে আলোচনা প্রসঙ্গে চন্দ্রনাথ তাহার মন্তব্য এইভাবে জানাইল যে, গোড়াতেই সে, সময় ও রাগ-রাগিণীর হিসাব করিয়া গানের যে তালিকা করিয়া দিয়াছিল, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইন্দ্রাণী সেগুলির পরিবর্তন করিয়া বুদ্ধিমতীর মত কাজ করেন নাই। ইহার ফলে কয়েকখানি গান 'মোনোটোনাস্' অর্থাৎ এক ঘেয়ে হইয়াছে। উক্ত ত্রুটি সাধারণ দর্শকগণের বোধগম্য না হইলেও বিচারকগণের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়া যাইবে।

গানের মজলিস ভাঙ্গিবার পর অধিক রাত্রি হওয়ায় চন্দ্রনাথ সরাসরি তাহার বাসায় চলিয়া গেল। কিন্তু বন্ধু ও বান্ধবীরা সংগৃহীত খবরগুলি যোগাইবার জন্য ইন্দ্রাণীর একান্ত অনুরোধে তাহার সঙ্গেই ভাদুড়ী ভিলায় যাইতে বাধ্য হইল। সেখানে আসর সম্পর্কে আর এক দফা আলোচনা চলিল: তাহাদের চক্ষে ইন্দ্রাণীকে কেমন মানাইয়াছিল, গানগুলি কিভাবে

তাহারা উপভোগ করিয়াছিল ইত্যাদি। ভনিতার সহিত সে সকল বর্ণনার পর শ্রোতাদের প্রসঙ্গও উঠিল। তাহাদের পক্ষ হইতে ইন্দ্রাণীর রূপ, সাজসজ্জা, ভঙ্গি, 'গান, নৃত্য প্রভৃতি প্রতিটি ব্যাপারে কিরূপ প্রশস্তি শুনিয়াছে, সে সমস্তই তাহাদিগকে শুনাইতে হইল। এই সব আলোচনার পর চন্দ্রনাথের মন্তব্যও শুনিতে হইল তাহাকে। ইহার ফল হইল বিপরীত। মুখখানা আরক্ত করিয়া ইন্দ্রাণীও মন্তব্য করিল: আমি সেখানে থাকলে তাঁর মুখের উপরেই শুনিয়ে দিতাম যে, এটা কলকাতা সহর—খোঁট্টাদের কালচার এখানে অচল, সেই জন্যেই তাঁর তৈরী প্রোগ্রাম আমাকে 'চেঞ্জ' করতে হয়েছিল। আমি খুব ভালো করেই দেখেছি—ঐ রাগিণী দেবীর ব্যাপারে মাষ্টার যেন 'নার্ভাস্' হয়ে পড়েছেন।

ইলা: তাই নাকি ?

কুস্কুম: আপনার দেখছি—আলাদা একটা চোখ আছে, ঠিক ধরেছেন কিন্তু!

নিখিল: ইয়েস, ইয়েস—আমরাও ওটা লক্ষ্য করেছি। এর মধ্যে মিস্ট্রি কিছু আছেই !

কুস্কুম: মাষ্টার অবিশ্যি বলেছে—রাগিণী দেবীকে চেনে না, তার নাম পর্য্যন্ত শোনেনি—অথচ একই প্রভিন্সের লোক ওরা, এবং দুজনেরই এক পেশা।

নিখিল: মাষ্টার হচ্ছে বুদ্ধিমান, জেনেও না জানার ভাণ করে আছে। নিজের রাস্তাও ক্লিয়ার করে রেখেছে আগে থেকেই। ঈশ্বর না করুন, যদিই বিড়ালের ভাগ্যে সিকে ছেঁড়ে—রাগিণী দেবীই প্লেস পান, তখন বলবে যে, আমার প্রোগ্রাম চেঞ্জ করবার জন্যেই এমন হলো। নতুবা—What is the meaning of that remark ?

ইন্দ্রাণী : কুমার ঠিক ধরেছেন ! আরো কি হয়েছে জানেন—আমার সুখ্যাতি শুনে শুনে ওর মনে এখন জেলাসি এসে গেছে ! মাস্টার এখন চাইছে—রাগিণীই উইন করে, আর আমি হেরে যাই ! এমনও হতে পারে, তলে তলে হয় ত ঐ রাগিণীর সঙ্গে……

ইন্দ্রাণীর মুখের কথাটা এই পর্য্যন্ত নির্গত হইয়াই সহসা থামিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিটা পলকের মধ্যে সকলের মুখের উপর দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া বুঝিল যে, সকলেই কথাটা শুনিয়া স্তব্ধ হইয়াছে। হয়ত, ইহার সম্ভাব্য সম্বন্ধে পুরুষ বন্ধুদের মনগুলি দুলিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু বান্ধবীরা এক সঙ্গে কঠিন মুখে প্রতিবাদ তুলিল :

শোভা : না, না, এ অসম্ভব !

নীলিমা : এ সন্দেহ তোমার ভাই অন্যায়।

শোভা : চন্দ্রনাথ বাবুর মত লোক এত নীচে নামতে পারেন না।

কিন্তু ইন্দ্রাণী এ সময় ধৈর্যের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। যেখানে হাজার লোকের মুখে তাহার গানের সুখ্যাতি ধরে না—সকলেই বাহোবা দিয়াছে, সুধু তাহারই বেতনভুক ঐ লোকটা কিনা এই ভাবে তাহাকে ক্রিটিসাইজ করিয়াছে ? এরূপ অবস্থায় নীরব থাকা বা সহ্য করা তাহার স্বভাবের দিক দিয়া একেবারে বিপরীত ব্যাপার। সুতরাং সেই বা তাহাকে রীতিমত আঘাত না করিবে কেন ? তাই বান্ধবীদের মুখের উপরে তাহাকেও দৃঢ়স্বরে বলিতে হইল :

ইন্দ্রাণী : আমার চেয়ে তোমরা তাকে বেশী জানে না। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় ভারি ভদ্রলোক, মনের মধ্যে কোন প্যাচ নেই ; কিন্তু আমি জানি—ওর মাথার মধ্যে কি রকম জিলিপীর প্যাচ পাকিয়ে থাকে, ওর ধারণা হচ্ছে—কলকাতার লোক

সব ফাঁকিবাজ, ভারেই তারা কাটে, যত ধার আর সাঁচ্চা—
ঐ খোঁট্টাই মুলুক! এ অবস্থায় রাগিণীর ওপরে সিমপ্যাথী
খুবই স্বাভাবিক; কাজেই তলে তলে যদি হাত মেলায় কিছুই
আশ্চর্য নয়।

বান্ধবীরা তথাপি নীরব, এত বড় কঠিন অভিযোগ যাহার বিরুদ্ধে,—সেই নিরীহ প্রকৃতি প্রতিভাধর মানুষটির প্রশান্ত প্রসন্ন মুখখানা মনে পড়ায় তাঁহাকে অপরাধীরূপে কল্পনা করিতেও বুঝি ইহাদের বিবেক বুদ্ধি বাধা দিতে লাগিল। কিন্তু পুরুষবন্ধুরা সমস্বরে বাহোবা দিয়া তাহাদের অভিমত জানাইল যে, অসাধারণ বুদ্ধির আলোকে ইন্দ্রাণী দেবী সত্যদর্শন করিয়াছেন—মাষ্টার লোকটা সত্যই ভণ্ড ও মতলব-বাজ!

এই সময় উপর হইতে শয্যাশায়ী ডাঃ ভাদুড়ীর আহ্বনে ইন্দ্রাণীকে উঠিতে হইল। বন্ধু বান্ধবীরাও বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল।

* *
*

দ্বিতীয় দিনেও নিদিষ্ট সময়ে যবনিকা উঠিবার পূর্বে রত্নেশ্বর রায় মঞ্চমুখে পাদ-প্রদীপের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া একটি সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি দিলেন। তাহার মর্ম এইরূপ:

আজকের আসরে রাগিণী দেবী যে গানগুলির আলাপ করবেন, তাদের পিছনে সুসম্বদ্ধ বিষয়-বস্তুর ঐতিহ্য থাকায়, দৃশ্য-সংস্থান এবং প্রাসঙ্গিক রূপ-সজ্জার ব্যবস্থা হয়েছে। অবশ্য, উচ্চস্তরের সঙ্গীতবেত্তাদের পক্ষে এর প্রয়োজন না হতেও পারে। কিন্তু সাধারণ সঙ্গীতানুরাগীদের পক্ষে এই ব্যবস্থা বাহুল্য হলেও উপভোগ্য হবে। প্রতিমা যেমন প্রতীকরূপে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আনন্দ-বর্দ্ধন করে. দেখেই ভক্তিভাব বদ্ধমূল হয়, পক্ষান্তরে সাধনাসিদ্ধ আদর্শ

ব্রহ্মবিদ্‌গণও তার সমর্থন করে থাকেন—এই ব্যবস্থাও তেমনি। রাগিণী দেবীর প্রতিটি গানের পর তাঁর নৃত্য-পটিয়সী ভগিনী কুমারী গীতাদেবী প্রাসঙ্গিক নৃত্যলীলা এবং নেপথ্য থেকে সুসম্বদ্ধ কথার সাহায্যে ঐ গানের রূপটিও যাতে সবার চোখের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, সে চেষ্টা করবেন। এখন সঙ্গীত ব্যাপারে রাগিণী দেবীর এই নূতন পরিকল্পনাটি আপনাদের প্রীতিবর্দ্ধন করলে তিনি যেমন ধন্য হবেন, আমরাও তেমনি এই আয়োজন সার্থক হয়েছে ভেবে বিপুল আনন্দের সঙ্গে পাব প্রচুর উৎসাহ।

এই ঘোষণা প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগারেও তুমুল উল্লাসের সৃষ্টি করিল। নিম্নের সুবিস্তীর্ণ হলে, দ্বিতলে ও ত্রিতলে —বিভিন্ন স্থানে উপবিষ্ট শ্রোতাদের সাধুবাদ ও 'হিয়ার, হিয়ার' ধ্বনি করতালির শব্দের সঙ্গে মিশিয়া প্রচণ্ড একটা কল্লোল তুলিল।

এই সময় দ্বিতলের নির্দিষ্ট পাশাপাশি দুটি বক্সে পূর্বদিনের সেই বিশিষ্ট শ্রোতাদেরও সমাগম হইয়াছে। এদিন তাহাদের মধ্যমণিরূপে বক্স দুইটিকে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করিয়াছে ইন্দ্রাণী—মধ্যস্থলে সগৌরবে অধিষ্ঠিত লইয়া। চন্দ্রনাথ তাহার ঠিক পার্শ্বের আসনেই স্থান পাইয়াছে। রাগিণী দেবীর নূতন ব্যবস্থার কথা শুনিয়াই ইন্দ্রাণী ভ্রূভঙ্গি করিয়া চন্দ্রনাথকে বলিল : শুনলেন? গোড়াতেই টেক্কা দিলে!

সবার সামনে ইন্দ্রাণী চন্দ্রনাথকে তুমি বলিয়া গভীরভাবে ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করিতে চাহিত না। বান্ধবী ইলা বলিল : ঘাবড়াচ্ছ কেন, দেখই না!

পরক্ষণে পূর্বদিনের মত ধীরে ধীরে দুই পার্শ্বে যবনিকা অপসারিত হইতেছে দেখিয়া এখানে কথা আর বাড়িল না, সকলেরই সাগ্রহ দৃষ্টি মঞ্চে নিবদ্ধ হইল। ইন্দ্রাণী ভাবিয়াছিল, ছাতুর দেশের এই দামাল

মেয়েটা হয়ত জমকালো বেনারসী শাড়ীর উপর জড়োয়ার নানা রকমের মোটা মোটা ভূষণ পরিয়া কলিকাতার দর্শকদের চোখে ধাঁধা লাগাইবার ফন্দীতে মঞ্চ জমকাইয়া বসিয়াছে—উজ্জ্বল আলোকপাতে তাহার সাজ-সজ্জার আভা সবার চক্ষুগুলি ধাঁধাইয়া দিবে। কিন্তু একি তাজ্জব কাণ্ড! সমগ্র মঞ্চে যে নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন! ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে সেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া পরিদৃশ্যমান হইল—তমসাচ্ছন্ন দিগন্তবিসারী এক বিশাল বনানীর দৃশ্য। সেই বনভূমির একাংশে ঘন-সন্নিবদ্ধ সারি-সারি বৃক্ষকাণ্ডগুলির মধ্যবর্ত্তী অতি প্রাচীন এক বিশাল বটবৃক্ষতলে দণ্ডায়মান মূর্তিটি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। প্রথম দর্শনে মনে হইল—মূর্তি বুঝি মর্মরনির্মিত। কিন্তু লহমামধ্যে মূর্তির লীলায়িত যুক্ত করপল্লব দুইটির প্রণতি ভঙ্গিতেই প্রতীয়মান হইল—জীবন্ত অবয়বধারী কোন মনুষ্যমূর্তি এই বিজন বনে যুক্ত করে কাহারও উদ্দেশে ভক্তি নিবেদনের জন্য দীর্ঘ সুঠাম দুটি করতল সংযুক্ত করিয়া ললাটে তুলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সুস্পষ্ট হইল যে, অবয়বধারী আর্যকুলোদ্ভব নহে, তাহার বেশ-ভূষা, কেশপাশ, কটিবেষ্টনীও রূপসজ্জা হইতেই প্রকাশ পাইল, সে শবর। প্রবাল ও প্রস্তরনির্মিত আভরণ, পাখীর পালকযুক্ত শিরোস্ত্রাণ, ব্যাঘ্র-চর্মময় মেখলা, গণ্ডারচর্মাবৃত কবচ ও পাদুকা, শঙ্খের বিচিত্র কুণ্ডল প্রভৃতি তাহার সম্প্রদায়গত আভিজাত্যের পরিচয় দিল। পক্ষান্তরে, তাহার বলিষ্ঠ দেহসৌষ্ঠব, উন্নত নাসিকা, আকর্ণবিস্তৃত আয়ত দুটি চক্ষু, সঙ্কল্প-দৃপ্ত মুখভঙ্গি এবং সর্বাঙ্গে বিচ্ছুরিত তারুণ্যের দীপ্তি দেখিয়া এই ধারণাই সবার মনে দৃঢ় হইল যে, শবর হইলেও এই অপূর্ব তরুণমূর্তি সত্যকার মানুষ, প্রাণবন্ত অসামান্য মানুষ! পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগারে সহস্রাধিক নর-নারীকে অভিভূত করিল পলকের মধ্যে মঞ্চের এই শবর মূর্তি।

সঙ্গে সঙ্গেই শবর তাহার কণ্ঠ হইতে কিন্নরী কণ্ঠের সুধাস্রাবী সুরের

এক বিচিত্র ঝঙ্কার তুলিয়া অভিভূত জনসংঘকে বিস্মিত চমৎকৃত ও বিমোহিত করিয়া দিল। অত্যন্ত সাদাসিধা কথায় সবল সহজ ভাষায় গান রচিত হইলেও তাহার ভাব এমন গভীর ও মর্মস্পর্শী যে, শুনিতে শুনিতেই তাহার প্রভাব দেহ ও মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। গানটি ভজনের পর্যায়ে পড়ে—অন্তর্দেবতার কাছে অন্তর্নিহিত সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকিয়া সর্বাংশে তাহাতে সিদ্ধি ও সার্থকতার প্রার্থনা লইয়া এই গান। কিন্তু প্রার্থনা যে এমন তেজোদৃপ্ত হইয়া আগুন ছড়াইতে পারে এবং তাহার ভাষায় রাগ রাগিণীদের রূপও যে ঝলমল করিয়া উঠে—ইহার আগে প্রচলিত কোন ভজনগানে এরূপ সমাবেশ কখনও দেখা গিয়াছে কিনা, বর্ষীয়ান শ্রোতা ও কলাকারদেরও বুঝি তাহা অজ্ঞাত। আপনার অন্তরমধ্যে অধিষ্ঠিত দেবতাকে বন্দনা করিয়া গায়ক চাহিতেছে দেবতার কাছে এমন এক মহাশক্তি—সাধারণতঃ যা দুর্লভ। যে পরম আশা-বারিধির সংস্পর্শে ধন্য হইবার জন্য সে ছুটিয়া গিয়াছিল, অস্পৃশ্য বলিয়া সেই পরম বারি পরশে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে তাহাকে। কিন্তু সেই বারিধারাই যে তাহার অভিষেকের উপচার—অভিষিক্ত সে হইবেই। এই সঙ্কল্প লইয়া সে করিবে কঠোরভাবে আত্মসাধনা—সেই দুর্লভ আশা-বারিধির পানে তাকাইয়া। সেই সাধনার পরম শক্তি তাহার অন্তর-দেবতাকেই দ্রবীভূত করিয়া, আশা-বারিধির সঙ্গে একাত্মভাবে মিশাইয়া স্রোতোবেগে এই সাধনপীঠে আনিয়া তাঁহাকে করিবে অভিষিক্ত—পরিপূর্ণ করিবে তাহার আশা ও সঙ্কল্প। এখন সেই দেবতা অনন্ত হইতে তাহার অন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া গ্রহণ করুন তাহার পূজা, পরীক্ষা করুন ভক্তের নিষ্ঠা; লক্ষ্য করুন এই অপূর্ব সাধন-সমরের গতি। তাহার আগে তিনিই—গুরুরূপে দ্রষ্টারূপে ইষ্টরূপ ভক্তের প্রণতি লউন। ইহাই গানখানির বিষয়বস্তু। কিন্তু রাগপ্রধান এই ভজনগানখানিতে

গায়িকা অপূর্ব কণ্ঠমাধুরী ও বলিষ্ঠ গায়কী দ্বারা যেভাবে বিভিন্ন রূপ-রস, ফুটাইয়া তুলিল, তাহার কণ্ঠস্বর গভীর ভাবের আবেগে প্রথমে অভিমান-দিগ্ধ উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হইয়া আবার পরে সুরময় আবেদনে কোমলতায় নামিয়া এতই মাধুর্য সৃষ্টি করিল—তাহার দীর্ঘায়ত দুইটি চক্ষু যে-ভাবে জলে ভরিয়া উঠিল, তাহাতে অভিভূত শ্রোতাদের মনে হইল যে, গানের নিতলে গায়িকা যেন আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। ফলে, এই প্রথম গানেই তরুণ শবরের রূপসজ্জায় রাগিণী দেবী তাহার অপূর্ব কণ্ঠসম্পদ ও সাঙ্গীতিক প্রতিভার যে স্বাক্ষর দিল—পূর্ণ প্রেক্ষাগারে প্রত্যেক শ্রোতার অন্তরে তাহার রেখা গভীরভাবে মুদ্রিত হইল।

* *

*

ইন্দ্রাণী দেবীর বক্সে তখন—শবরের ছদ্মবেশে রাগিণী দেবীর আবির্ভাবের ব্যাপার লইয়া আলোচনা চলিয়াছে :

ইন্দ্রাণী : ব্যাধ সেজে বনে ভজন গাওয়া হলো কেন? রাগিণী হয়েই গাইলে কি ক্ষতি হত? নিজেকে লুকোবার মানে?

নীলিমা : বোধ হয় চেহারায় কোন খুঁত আছে—এভাবে মেক আপ করলে সেটা চাপা থাকবে।

প্রণব : কিন্তু ব্যাধের যে কাঠামো দেখা গেল—চেহারায় খুঁত আছে বলে ত মনে হলো না।

ইন্দ্রাণী : মাস্টার মশাই যে চুপ করে রয়েছেন? চেহারা দেখে চিনতে পারছেন—আপনাদের দেশের রাগিণীকে।

চন্দ্রনাথ : না। উনি যদি নাম প্রচার আগে থেকে না করতেন—কারুর সাধ্য হত না যে ওঁকে মেয়ে বলে ধরবার। মনে হলো যেন পৌরাণিক যুগের সত্যকার কোন শবর।

ইন্দ্রাণী : ও বাবা! আপনি আবার—পৌরাণিক যুগকে টেনে আনছেন এখানে? কবি মানুষ কিনা, তাই কল্পনার এমন দৌড়!

চন্দ্রনাথ : তাহলে তুমি শুধু ব্যাধকেই দেখেছ—পরিবেশটা দেখনি। হয়ত ব্যাপারটা এখনি জানা যাবে, ওঁর ভগিনী গীতা দেবীর নাচ থেকেই।

চন্দ্রনাথের কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগার পুনরায় অন্ধকারে নিমগ্ন হইল। পরেই পুনরায় যবনিকা উঠিলে দেখা গেল—শবর-কন্যার উপযোগী বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া আছে এক তরুণী। মাইকের সাহায্যে অদৃশ্য কণ্ঠের স্বর ঘোষণা করিল: ইনিই গীতা দেবী—রাগিণী দেবী যে গানখানির আলাপ করলেন নৃত্যভঙ্গিতে ইনি তার রূপটি দেখাবার চেষ্টা করবেন।

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই নৃত্য আরম্ভ হইল! ঘোষকের প্রাসঙ্গিক স্বর—নৃত্যের তালে তালে জনপূর্ণ প্রেক্ষাগারে ধ্বনিত হইতে লাগিল:

রাগিণী দেবীর কণ্ঠে যে মর্মস্পর্শী ভজন গান আপনারা শুনেছেন—গীতাদেবী নৃত্যের দ্বারা তা রূপায়ন করছেন; আর, আমরা মহাপুরাণ মহাভারতের সেই দিব্য আখ্যানটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।....শবর রাজপুত্র একলব্য সে-যুগের প্রসিদ্ধ অস্ত্রবিদ্ গুরু দ্রোণাচার্যের আশ্রমে অস্ত্র-শিক্ষার আবেদন নিয়ে উপস্থিত। কিন্তু গুরু দ্রোণ তখন কুরুবংশের ক্ষত্রিয়-রাজপুত্রদের শিক্ষাদানে ব্রতী; তাঁদের সহপাঠীরূপে অনার্য শবরপুত্রের শিক্ষালাভ সম্ভবপর নয় বলে তিনি হলেন প্রত্যাখ্যাত। তখন দূর থেকে গুরু দ্রোণকে গুরুজ্ঞানেই প্রণাম করে গভীর বনে ফিরে এলেন একলব্য দৃঢ় এক সংকল্পে অনুপ্রাণিত হয়ে। দ্রোণকেই তিনি গুরু স্বীকার

করেছেন এবং সেই শ্রদ্ধেয় গুরুকে উদ্দেশ করেই তিনি আত্ম-সাধনায় প্রবৃত্ত হবেন, সেই সাধনালব্ধ সিদ্ধির আকর্ষণে গুরু দ্রোণকে তিনি সামনে আনবেন—এই তাঁর সঙ্কল্প। তৎকালীন মনের এই সঙ্কল্প ভজনের মধ্যে ব্যক্ত করেছেন একলব্য-বেশ-ধারিণী রাগিণী দেবী। তারই বিশিষ্ট ভঙ্গি দেখাচ্ছেন গীতাদেবী প্রাসঙ্গিক নৃত্যে।

ঘোষকের কথা শুনিতে শুনিতেই সকলে গীতাদেবীর অপরূপ নৃত্য উপভোগ করিতেছিলেন। ঘোষক-কণ্ঠের কাহিনী তাঁহাদিগের অন্তরে অনুভব শক্তি উদ্দীপিত করিল—তাহাতে বর্ণিত ঘটনাটি যেন চোখের উপর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তাঁহারা যেন দেখিতে লাগিলেন—বিশিষ্ট এক আশ্রম ; সমীবৃক্ষমূলে আসন গ্রহণ করিয়া দ্রোণাচার্য কুরুবালকগণকে অস্ত্র শিক্ষা দিতেছেন। এমন সময় তথায় আসিয়া উপনীত হইল অনার্য্যবংশীয় শবর-রাজপুত্র একলব্য। পৃষ্ঠদেশে শরপূর্ণ যুগল তূণ, স্কন্ধে ধনু, বীরত্বব্যঞ্জক তনু তাহার। ভূমিষ্ঠ হইয়া গুরুকে প্রণাম করিয়া সে কৃতাঞ্জলিপুটে আদেশপ্রার্থী হইল।

গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমার পরিচয় ?

একলব্য উত্তর দিলেন : নাম একলব্য—শবর দেশের রাজপুত্র দাস।

গুরু : এখানে আগমনের উদ্দেশ্য ?

একলব্য : অস্ত্র শিক্ষা। দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে প্রভুকেই করেছি গুরুত্বে বরণ।

সবিস্ময়ে গুরু চাহিলেন এই দুঃসাহসী শবর-তরুণের উৎসাহদীপ্ত মুখখানির দিকে এবং পরক্ষণে সেই দৃষ্টি শিষ্যস্থানীয় কুরুবালকদের মুখে নিবদ্ধ করিতেই দেখিলেন—কৌলিক অভিমানের আভা পড়িয়াছে

তাহাদের মুখে, ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাহারা স্পর্ধিত শবরপুত্রটিকে লক্ষ্য করিতেছে। গুরু দ্রোণের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল ; বলিলেন :

গুরু : দুরাকাঙ্ক্ষাই বটে। আমি এখানে রাজ-ব্যবস্থায় রাজপুত্রদের শিক্ষা দানে ব্রতী। তোমার শিক্ষা এখানে অসম্ভব।

একলব্য : সে কি প্রভু! আপনার চরণতলে বসে শিক্ষার সাধনা করব—এই সঙ্কল্প নিয়েই যে আমি গৃহ ছেড়ে এসেছি।

গুরু : সে শিক্ষার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। আমি অক্ষম।

একলব্য : কিন্তু আমার সঙ্কল্প যে অটল প্রভু, এর পরিবর্তন নেই। আশীর্বাদ করুন—সঙ্কল্পভ্রষ্ট না হয়ে আমি যেন সিদ্ধিলাভ করতে পারি।

বলিতে বলিতে পুনরায় ভূমিষ্ঠ হইয়া গুরু দ্রোণকে প্রণাম জানাইয়া চলিয়া গেল সেই প্রত্যাখ্যাত শিক্ষার্থী। রাজপুত্রগণের মধ্যে উঠিল নানারূপ গুঞ্জন। কেহ বলিল—উন্মাদ! কাহারও মতে—ইহা স্পর্দ্ধা! কেহ কহিল—নীচের কি দুঃসাহস!

কিন্তু গুরু দ্রোণ নির্বাক—তাঁহার অন্তর্নিহিত বিপুল শক্তি যেন অশরীরী একটা বাষ্পের আকারে ঐ প্রত্যাখ্যাত অভিমানক্ষুব্ধ সঙ্কল্পদৃঢ় অস্পৃশ্য তরুণকেই অনুসরণ করিয়া ছুটিয়াছে।

* * *

পটক্ষেপনের সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগার উজ্জ্বল আলোকে পুনরায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সহস্রাধিক শ্রোতা বা দর্শক একখানি রাগপ্রধান গানের সহিত সংশ্লিষ্ট এই মর্মস্পর্শী পৌরাণিক উপাখ্যান শুনিয়া এবং বর্ণিত চিত্রগুলি জীবন্তবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া এরূপ অভিভূত ও আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন যে, বাহ্যিক উল্লাস প্রকাশের জন্য কণ্ঠ ও করযুগল যেন আড়ষ্ট

হইয়া গিয়াছে। উপরের বক্সের বিশিষ্ট মানুষগুলির মনেও যে দোলা লাগিয়াছে, তাহাদের সংলাপেই তাহার আভাস পাওয়া গেল :

ইন্দ্রাণী : মাস্টার মশাই ?

চন্দ্রনাথ : বল।

ইন্দ্রাণী : কি বুঝছেন ?

চন্দ্রনাথ : নিজেকে বোঝ—সমস্ত অডিটোরিয়মটা দেখ। বলবার কিছু নেই।

শোভা : আইডিয়াটা কিন্তু খাসা—গানের পিছনে একটা পালা।

প্রণব : কিন্তু জমিয়ে দিয়েছে।

কুঙ্কুম : কবির সেই বিখ্যাত কথাকে ফলো করেছে এরা—একটা নতুন কিছু কর···

নিখিল : যা করেছেও—একবারে নতুনতম! মেড়োদেশের মেয়ের মাথা আছে।

প্রণব : চন্দ্রবাবুর উচিত ছিল মাথা ঘামানো—নতুন কি করা যায় ভাবা।

ইন্দ্রাণী : খুব লোককে বলছেন! বলে—সেই গানখানাই বড় শেখালেন! মার্ক করেছেন···ওঁর সেই নিষিদ্ধ গানের কথা-গুলোর সঙ্গে এই গানের কথার যেন মিল রয়েছে!

চন্দ্রনাথ : আসল কথা হচ্ছে—গায়িকার কণ্ঠ····কেন ভাল লাগছে, সেটা বুঝছনা কেন ?

* *
*

সুমধুর ধ্বনির সঙ্গে যবনিকা উঠিল। প্রেক্ষাগার পুনরায় অন্ধকারে নিমগ্ন হইল। এবার দেখা গেল—সেই নিবিড় অরণ্য মধ্যে বৃহৎ বৃক্ষতলে উচ্চ বেদীর উপর স্থাপিত এক বিগ্রহ সম্মুখে শিক্ষার্থীর ভঙ্গিতে উপবিষ্ট

শবর রাজপুত্র একলব্য। তাহার আকুতি-ভরা কণ্ঠ হইতে এবার যে গানের ঝঙ্কার উঠিল—তাহার সুর রাগ ও রাগিণীর সংযোগে আর এক পর্য্যায়ের। অন্তরের ভক্তি নিষ্ঠা ও নির্ভরতাকে সহায় করিয়া বেদীর উপর উপবিষ্ট উপাস্যের উদ্দেশে আবেদনের ভঙ্গিমায় যে ভাবে সে গানের আলাপ করিল, তাহার বিচিত্র কারিগরিতে—মীড় গমক ও মূর্ছনার গিটকিরিতে যে অপরূপ নৈপুণ্য দেখাইল, তাহা আর এক অভিনব সাঙ্গীতিক প্রতিভার অনবদ্য অবদান।

গানের পর গীতাদেবী শিক্ষার্থী শবরের অন্তর্নিহিত একাগ্রতার মূর্তিতে রূপ সজ্জা করিয়া নৃত্য লীলায় গানের রূপটি প্রকাশ করিয়া দেখাইল এবং সেই সঙ্গে পূর্ববৎ ইহার আখ্যান ঘোষিত হইল:

সঙ্কল্প-দৃঢ় একলব্য সেই বনে বটবৃক্ষমূলে বেদী রচনা করে তার উপরে প্রতিষ্ঠিত করলেন এক বিগ্রহ। সে বিগ্রহ কোন দেবতার নয়—এক আদর্শ মানবের। সে মানব—সাধক একলব্যের স্ব-নির্বাচিত গুরু—দ্রোণ। প্রত্যাখ্যাত হয়েও যে সঙ্কল্প সে গ্রহণ করেছিল, তাঁরই উদ্দেশে আত্মনিবেদিত অন্তরের নিষ্ঠা ও ভক্তি নিয়ে একাগ্রতাকে অবলম্বন করে তারই প্রেরণায় নির্মাণ করেছে পরম উপাস্যের প্রতিমা। তাঁরই চরণ তলে ভক্তি অর্ঘ দান করে—স্বপ্রতিষ্ঠিত এই মৃন্ময়-মূর্তিকেই কায়াময় প্রাণবন্ত গুরু দ্রোণ জ্ঞানে ব্রতী এই অপূর্ব অদ্ভুত শিক্ষার সাধনায়। আশ্চর্য গুরুর উদ্দেশে আশ্চর্য ভক্ত করছেন আবেদন:

যিনি সবার অন্তরে থেকে দেন শক্তি, দেন বুদ্ধি, জাগান প্রেরণা, পরম ক্ষণে আমি পেয়েছি তাঁরই সংকেত—তাই এ কঠিন সংকল্প। দেহমন শুদ্ধ করে বসেছি তোমারি পূজায়। আত্মার ত রূপ নেই—প্রতীক করেছি তাই প্রতিমা....ভক্তের ধ্যান মূর্তি। ধ্যানে জ্ঞানে এস তুমি আত্মায়...দাও প্রভু

আত্মিক শিক্ষা···আদান প্রদান হোক আত্মায় আত্মায়····
জগত জানুক প্রভু—গুরু শিষ্যে দেখা নেই···শিক্ষা হলো
সমাপন।

ইহার পর গানটির ঐতিহ্যময় উপাখ্যান সকলকেই চমৎকৃত করিল। পুরাণের পরিচিত আখ্যান। কিন্তু ইহার অভাবে এই গানখানি অসম্পূর্ণ বা দুর্বোধ্য হইয়াছে—এরূপ মনে করিবার কিছুই ছিল না। অবশ্য গীতাদেবীর নৃত্যের তালে তালে উপাখ্যানটি শুনিবার পর প্রত্যেকেই উপলব্ধি করিলেন যে, পরিপার্শ্বরূপে এগুলি গানের মর্যাদা বহুগুণ বাড়াইয়া দিয়াছে।

ইহার পরবর্তী গানগুলির প্রত্যেকখানি বিভিন্ন প্রকৃতির রসসৃষ্টি করিয়া শ্রোতাদিগকে প্রচুর আনন্দ দিল। বিভিন্ন ঋতুর মধ্যে একক ভক্তের কৃচ্ছ্রসাধনা, মনের বিবিধ ভাব ও অন্তর্দ্বন্দ্ব, সাময়িক দৌর্বল্য—এবং পরক্ষণে দৃঢ়তর নিষ্ঠা-সহকারে আত্ম সংযম প্রভৃতি মনোভাব—এক এক গানে এক এক রাগ ও অনুকূল রাগিণীর সংযোগে আলাপ করিয়া গায়িকা যেন সুর-শতদলকে আশ্চর্যভাবে ফুটাইয়া তুলিল।

সঙ্গে সঙ্গে গীতা দেবীও গানের আখ্যান—উপযোগী সজ্জায় সজ্জিত হইয়া নৃত্যলীলায় এবং ঘোষকের বিবৃত বর্ণনার সহায়তায়, প্রত্যেক গান খানিকে সার্থক করিয়া তুলিল।

এমন কি, চন্দ্রনাথের রচিত যে আধুনিক গানগুলির আলাপ করিয়া ইন্দ্রাণী ভাদুড়ী এ পর্যন্ত এই শ্রেণীর সঙ্গীতে অপরাজিতা বলিয়া সাব্যস্তা ছিল, রাগপ্রধান গানগুলির মধ্যে একলব্যের সাধনাকালে মাধুর্যময় বসন্ত ঋতুর সমাগমে কুমতি যখন তাহাকে উদভ্রান্ত করিতে মোহজাল বিস্তার করে এবং মোহিনীমূর্তিতে এক কিন্নরী সহসা আবির্ভূতা হইয়া সাধনারত একলব্যকে তাহার অনুবর্তিনী হইবার জন্য তাহার তরুণ অন্তরে চাঞ্চল্যের

শিহরণ তোলে—সেই সময় তরুণ সাধক একলব্য অন্তরবাসিনী কুমতি এবং প্রত্যক্ষদর্শিনী কুসুমসজ্জায় সজ্জিতা বিলাসিনী কিন্নরীকে প্রতি-নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত আধুনিক সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করিয়া যে গানের আলাপ করেন—তাহাতে ইন্দ্রাণী ভাদুড়ীর পূর্ব প্রতিষ্ঠা খর্ব হইয়া গেল এবং সে-ই যে ঐ শ্রেণীর গানের একমাত্র প্রবর্তিকা নয়—রাগিণী দেবীও ঐ গানের সাধিকা—ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল!

রাগিণী দেবী রাগপ্রধান গানের সাধিকারূপে খেয়াল, ধ্রুপদ, ঠুংরি প্রভৃতির আলাপ করিয়া তাহার সঙ্গীত-প্রতিভার পরিচয় দিবে—ইহাই ছিল ইন্দ্রাণী ও তাহার বন্ধু বান্ধবীদের ধারণা। কিন্তু কয়েকখানি গানের পর তাহাকেও সহসা অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধানে ইন্দ্রাণীর ঐশ্বর্যভাণ্ডারে অপ্রত্যা-শিতভাবে অনধিকার প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহারা শিহরিয়া উঠিল। এই গানের পর ইন্দ্রাণীর বক্ষে গানখানিকে কেন্দ্র করিয়া আলোচনাও চলিতে থাকে :

ইন্দ্রাণী : এ কি কাণ্ড মাস্টার মশাই? আপনার গান ও পেলে কি করে?

চন্দ্রনাথ : আমার সব গানই ত তোমার কণ্ঠস্থ—ও গান আমার হলে তোমার কি আজানা থাকত?

ইন্দ্রাণী : হয়ত কথায় মিল নেই; কিন্তু ছন্দ, সুর—একই।

ইলা : বরং সুরটি আরো মিষ্টি লাগছে।

চন্দ্রনাথ : সে কণ্ঠের জন্যে।

ইন্দ্রাণী : তখন থেকেই ত আপনি কেবলই কণ্ঠের গুণ গাইছেন! আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকবেন না।

চন্দ্রনাথ : রাগিণী দেবীর মুখে আধুনিক গান শুনে তুমি দেখছি অধৈর্য হয়ে পড়েছ—তাই কথার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

ইন্দ্রাণী: সে দোষ কি আমার বলতে চান? জাঁক করে তখন জানিয়েছিলেন মনে নেই—এই ধাঁজের গানের স্রষ্টাই আপনি?

চন্দ্রনাথ: সৃষ্টির আনন্দে আমি একথা বলে থাকব; অন্তত আমার ধারণা ছিল, এই শ্রেণীর গান আর কেউ লেখেন নি—কিন্তু ভবিষ্যতেও কেউ লিখবেন না, আমিই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' হয়ে থাকব, এ ধারণাও ভুল।

ইন্দ্রাণী: মানলাম, গান না হয় আপনার অনুকরণে লিখেছে, কিন্তু সুর?

চন্দ্রনাথ: গানের সাধিকা হয়ে একথা তুমি কি করে বলছ? ক'মাস আগেও ত তুমি এমনি আসরে গান গেয়েছিলে। কাশীতে, এলাহাবাদে, গোয়ালিয়রে আমিও এ গান কতবার গেয়েছি। সুর কি কেউ হাত দিয়ে চেপে ধরে রাখতে পারে? কণ্ঠের কথা বললেই তুমি রাগ করবে—কিন্তু রাগিণী দেবীর কণ্ঠের জন্যেই এ গান আরও অপরূপ মনে হয়েছে।

বন্ধুদের ভিতর থেকে এই সময় কুঙ্কুম একটু তিক্ত কণ্ঠেই বলিল:

কুঙ্কুম: কথা দিয়ে আপনি যতই নিজেকে ঢাকতে যান মাস্টার মশাই, আপনার এলেম কিন্তু ক্রমশঃ ফিকে হয়ে যাচ্ছে—ঠিক গিল্‌টী করা সোনার যে দশা হয়!

নিখিল: এখন ব্যাপার দেখে ইন্দ্রাণী দেবীর মনে অন্য রকম সন্দেহ হওয়াও আশ্চয নয়।

নিখিলের কথায় চন্দ্রনাথের মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু

এই সময় রাগিণী দেবীর শেষ গানের জন্য যবনিকা উঠিতে থাকায়, কথার পীঠে প্রশ্ন করিবার সুযোগ আর সে পাইল না।

* * *

একলব্যের সাধনা এখন সিদ্ধির পথে। দীর্ঘকালের অবিক্লব ও এক-নিষ্ঠ সাধনার বলে তিনি পারদর্শী হইয়াছেন। সেই পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্য তিনি তাঁহার সকল সত্ত্বা শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া—যে ভগবান তাঁহার চিত্তে দিয়াছেন শিক্ষার সঙ্কল্প—যে ভগবানের প্রসাদে অন্তর রাজ্যে গুরু-শিষ্যের অলৌকিক যোগাযোগ সম্ভব হওয়ায় শিক্ষাসাধনায় তাঁহার এই অপূর্ব সিদ্ধিলাভের সুযোগ ঘটিয়াছে—সেই সর্বশক্তিমান ভগবানকে তিনি উচ্চাঙ্গের এক আধ্যাত্মিক গানের ঝঙ্কার তুলিয়া বন্দনা করিতেছেন। কিন্তু ইহাই সঙ্গীতাচার্য রামময় ভট্টাচার্য মহাশয়ের অনবদ্য সৃষ্টি সেই বিখ্যাত গান—যাহা দীর্ঘকাল নিষিদ্ধরূপে পরিত্যক্ত থাকে এবং লক্ষ্ণৌএ শ্যামলীর কণ্ঠের পরশ পাইয়া যাহার শাপমুক্তি ঘটে। গভীর ভাবোদ্দীপক এই আধ্যাত্মিক গানখানি প্রাসঙ্গিক বলিয়া উপসংহার-সঙ্গীতরূপে সঙ্গীতার্য রামময়ই ইহাকে নির্বাচিত করিয়াছেন।

এই গান প্রেক্ষাগারে সকল শ্রেণীর শ্রোতাদের মধ্যে যেমন এক অভূতপূর্ব আনন্দের আলোড়ন তুলিল, দ্বিতলে বক্সে ইন্দ্রাণী ভাদুড়ীর ধৈর্যের বাঁধটিও তেমনি প্রচণ্ড আঘাতে ভাঙ্গিয়া দিল। সেই সঙ্গে চন্দ্রনাথ এবং ইন্দ্রাণীর বন্ধুবান্ধবীদের চিত্তগুলিও আলোড়িত হইয়া উঠিল।

* *

*

পরিচিত এই গান রাগিণীর কণ্ঠ হইতে নির্গত হইবামাত্র ইন্দ্রাণী সেই যে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি চন্দ্রনাথের মুখে নিবদ্ধ করিয়াছিল, গান শেষ হইয়া

গেলেও তাহার দীপ্তি ম্লান হয় নাই। প্রণব এই সময় বিদ্রূপের সুরে বলিয়া উঠিল :

প্রণব : কুমার বাহাদুরের কথা শুনে তখন ত চোখ পাকিয়ে ওঁকে ভস্ম করতে চেয়েছিলেন চন্দ্রনাথ বাবু! এখন বলুন ত—কথাটা কি উনি অন্যায় বলেছিলেন?

চন্দ্রনাথ : আপনারা কি বলতে চান তাই বলুন?

কুঙ্কুম : আমরা এখন আপনাকেই বলতে বলছি—আপনিই বলুন, রাগিণী দেবী এ গান কোথায় পেলেন? আপনার খাতায় লেখা গান ওঁর গলা থেকে বেরুল কি করে?

চন্দ্রনাথ : ছেলেমানুষের মত আপনারা আমাকে জেরা করছেন দেখছি। এ গান অন্যের জেনেও আপনারা আমাকে এর জন্যে কেন প্রশ্ন করছেন?

নিখিল : আপনার কাছে একথা এখন ভাল লাগছে না বুঝছি, কিন্তু এই গানখানাই আজ মস্ত একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে—যেহেতু ইন্দ্রাণী দেবীই প্রথমে আপনার কাছেই গানখানি পেয়েছিলেন এবং ওর সুর আদায় করবার জন্যে পীড়াপিড়িও অনেক করেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই আপনি এ গান ওঁকে শেখান নি।

বিরক্তির ভঙ্গিতে মুখখানি বিকৃত করিয়া চন্দ্রনাথ বলিল :

চন্দ্রনাথ : আপনাদের এ সব কথার কোন মানে হয় না।—এ গানের ইতিহাস ইন্দ্রাণীদেবী ভাল ভাবেই জানেন। মিছি মিছি এই নিয়ে মাথা গরম করবেন না।

সাধারণতঃ চন্দ্রনাথ বিতর্কে বড় একটা যোগ দেয় না, কথাও বেশী বলিতে সে অভ্যস্ত নয়; কিন্তু তাহার গুরুদেবের সেই ঐতিহাসিক

গানখানি রাগিণীদেবীর মুখে শুনিয়া একেই ত সেও চমৎকৃত হইয়াছিল, এখন সেই গান সম্বন্ধে ইহাদের এই অনধিকার চর্চায় তাহার স্বভাব-সিদ্ধ সংযমের বন্ধনও ছিঁড়িয়া গেল। এরূপ অবস্থায় তাহাকেও আজ মুখ খুলিতে হইয়াছে।

ইন্দ্রাণীদেবী গম্ভীর মুখে বসিয়া জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে একই ভাবে এই এই সত্যো-মুখর মানুষটির দিকে চাহিয়াছিল। তাহার সঙ্গিনীরাও নীরবে দুই পক্ষের বিতর্ক শুনিতেছিল। নীলিমা এই সময় চন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিল:

নীলিমা: তাহলে এ গান রাগিণীদেবী পেলেন কি করে?

চন্দ্রনাথ: ইন্দ্রাণীদেবী কি ভাবে পেয়েছিলেন—যদি তার বৃত্তান্ত জানেন, তাহলে এ প্রশ্নের কোন সার্থকতা থাকে না।

ইন্দ্রাণী সহসা সবেগে আসন হইতে উঠিয়া নীলিমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল:

ইন্দ্রাণী: এ ডেনিয়্যাল হ্যাজ কাম টু জাজমেণ্ট—এর ওপর আর কথা নেই—চল্।

মনের সমস্ত জ্বালাই এই মেয়েটি তাহার মুখের কথাগুলির ভিতর দিয়া বাহির করিয়া এখানেই নিঃশেষ করিয়া দিল—সাধারণ ভাবে ইহা বুঝাইলেও, আসলে যে ইহার সমাপ্তি হয় নাই—ভবিষ্যতের জন্য চাপিয়া রাখা হইল, ইন্দ্রাণী-চরিত্রে অভিজ্ঞ তাহার অন্তরঙ্গদের নিকট ইহা অবিদিত রহিল না।

প্রেক্ষাগার তখন প্রায় শূন্য হইয়া গিয়াছে। শেষের গান খানির পূর্বে আখ্যান-বস্তুর পরবর্তী ঘটনাগুলি বিভিন্ন রূপ-সজ্জা ও ঘোষকের

বাণীর সাহায্যে এমন ভাবে গীতাদেবী নৃত্যলীলায় প্রকাশ করিয়াছিল যে, সমাপ্তি-সঙ্গীতের পর আর কিছুই বলিবার বা দেখাইবার ছিল না।

* *

*

দ্বিতীয় দিনের আসর ভাঙ্গিবার পর এই অনুষ্ঠানে সমবেত সঙ্গীতানুরাগীরা প্রেক্ষাগারেই সাঙ্গীতিক প্রতিভায় রাগিণীদেবীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধেই অসঙ্কোচে এবং উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আভাস দিয়া গেলেন। সহরের গৃহে গৃহে ব্যাপকভাবেই ইহার যে প্রতিধ্বনি উঠিল—তাহা ইন্দ্রাণীরও অগোচর রহিল না। এমন কি, সঙ্গীতশালায় উপরের বক্ষ হইতে নিচে নামিয়া গাড়ীতে উঠিবার প্রাক্কালেই উভয় দিনের প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতির পরিণতিও সে উপলব্ধি করিয়াছিল। কিন্তু প্রতিযোগিনীর অসামান্য প্রতিভার প্রভাবে নিজের ভাগ্য-বিপর্যয়ের জন্য সে নির্বিচারেই বেচারী চন্দ্রনাথকে উপলক্ষ সাব্যস্ত করিয়া আর এক কঠিন পরিস্থিতি উদ্ভবের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিল।

সঙ্গীতশালা হইতে চন্দ্রনাথ এদিনও সরাসরি তাহার বাসায় চলিয়া গেল—ইন্দ্রাণী তাহাকে সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল না; এমন কি, তাহার দিকে আর দৃকপাত না করিয়াই বান্ধবীদের সহিত গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল—চন্দ্রনাথের চোখের সামনে গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে, ইন্দ্রাণী গাড়ীর গবাক্ষ হইতে মুখ বাড়াইয়া তাহার পুরুষ বন্ধুগণকে সনির্বন্ধ আহ্বান জানাইল যে, তাঁহারা যেন ভাদুড়ী ভিলা হইয়া তাহার পর নিজেদের গৃহে যান। ফলে, বন্ধুদের গাড়ীগুলিও ইন্দ্রাণীর গাড়ীর অনুগমন করিতে থাকে। চন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিল, ইন্দ্রাণীর ড্রয়িং রুমে বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে অতঃপর এই আসরের গান সম্বন্ধে যে আলোচনা চলিবে—চন্দ্রনাথের সেখানে কোন স্থান নাই, প্রয়োজনও

নাই। স্তব্ধভাবে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া চন্দ্রনাথ একখানি রিক্সায় চাপিয়া বসিল। তাহার নিরুদ্বেগ চিত্তে তখন উদ্দীপনার ঝটিকা বহিয়াছে। গুরুর নিষিদ্ধ গানখানিই ধূমকেতুর মত তাহার অদৃষ্টাকাশে উঠিয়া দারুণ একটা সংঘাতের আভাস দিতেছে। ইন্দ্রাণীর চোখে মুখে যে জ্বালা সে দেখিয়াছে, তাহাতে শান্তি বা সম্প্রীতির কোন আশাই আর নাই। এমন কি, ভাদুড়ী-ভিলার পথও সম্ভবত তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে—ইহাই তাহাকে বুঝিতে হইবে। রিক্সায় বসিয়াই সে স্থির করিল যে—ইন্দ্রাণীর সশ্রদ্ধ আহ্বান না পাইলে ইহার পর ও বাড়ির ত্রিসীমায়ও সে পদার্পণ করিবে না। তবে কর্তব্যের অনুরোধে পরদিনের অনুষ্ঠানে সে যোগদান করিবে এবং সেখানেই ইন্দ্রাণীর সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া ফেলিবে। ইন্দ্রাণীর সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তের পর দ্বিতীয় সমস্যা হইল, তাহার নিজস্ব সৃষ্টি—নবপর্য্যায়ের এই প্রেম-সঙ্গীত এবং সেই সঙ্গে গুরুর ঐ নিষিদ্ধ গানটি রাগিণীদেবী কি সূত্রে পাইয়াছেন তাহার অনুসন্ধান করা। তবে কি রাগিণী দেবী তাহার গুরুর শিষ্যারূপে তাঁহার সিদ্ধ কণ্ঠে গাহিয়া গানখানিকে মুক্তি দিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন? কিন্তু এই রাগিণী দেবী কে? সমগ্র আসরে আগাগোড়া শবর একলব্যের রূপসজ্জায় অনবদ্য সঙ্গীতে প্রতিভার অপরূপ আলো ছড়াইবার মূলে কি কোন গোপন রহস্য আছে? কিন্তু এদিন আত্মগোপন করিলেও, তৃতীয় দিনের আসরে ত তাঁহাকে স্বরূপ প্রকাশ করিতেই হইবে।

* *

*

ওদিকে ভাদুড়ী-ভিলায় নিচের ড্রয়িং রুমে পুরুষ বন্ধু এবং মহিলা বান্ধবীদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে ইন্দ্রাণী দৃঢ় স্বরেই জানাইল যে, ইচ্ছা

করিয়াই সে ঐ বিশ্বাসঘাতক মাষ্টারটাকে ওখানে ঐভাবে ফেলিয়া আসিয়াছে। অবশ্য, একবার ডাকিলেই সে কুকুরের মত সঙ্গে আসিত, কিন্তু তাহাকে বাদ দিয়াই আলোচনা করা ইন্দ্রাণীর অভিপ্রায়।

এদিনও পুরুষ বন্ধুরা ইন্দ্রাণীর সিদ্ধান্তের সমর্থন করিলে, বান্ধবীদের মধ্য হইতে প্রতিবাদ উঠিল যে, ইহা ঠিক নয়; চন্দ্রনাথের মত গুণী মানুষকে এভাবে তাচ্ছল্য করা খুবই অন্যায় এবং বাড়াবাড়ি হইয়াছে। ইহা যেন সেই—কাগজের কাজ হইয়া গেলে অবজ্ঞায় ওয়েষ্ট পেপারের ঝুড়িতে ফেলিয়া দিবার মত কাণ্ড করিয়াছে ইন্দ্রাণী। কিন্তু ইন্দ্রাণীর ঔদ্ধত্য তখন তীব্রতর হইয়া এমন ভীষণভাবে তাহাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে যে, বান্ধবীদের কোন যুক্তিই তাহার অন্তর স্পর্শ করিল না।

উপরে ডাঃ ভাদুড়ী সাগ্রহে কন্যার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; উপর হইতে ঘন ঘন ডাক পড়িতেছিল, শেষে তাঁহার আহ্বানে অতিষ্ঠ হইয়া ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি পরবর্তী কর্তব্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া বন্ধু-বান্ধবীদিগকে বিদায় দিয়া উপরে চলিয়া গেল।

ডাঃ ভাদুড়ী এ দিনের আসরের কথা মোটামুটি শুনিয়াছিলেন। কন্যার মুখে বিস্তারিত শুনিবার জন্যই তাঁহার এত আগ্রহ ও ডাকাডাকি। কন্যা উপরে আসিয়া পিতার পাশের আসনে বসিয়া বিনা ভূমিকায় ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল :

ইন্দ্রাণী : জানো বাপি, দুধ কলা দিয়ে আমরা এতদিন একটা দুমুখো সাপকে পুষেছিলাম—আজ তার স্বরূপ ধরা পড়েছে।

ডাঃ ভাদুড়ী : ব্যাপার কি? কার কথা বলছ?

ইন্দ্রাণী : ব্যাপার খুব খারাপ। আর কাকে লক্ষ্য করে কথাটা বলিছি—সত্যিই কি বুঝতে পারনি?

ডাঃ ভাদুড়ী : ক' দিন থেকেই দেখছি—চন্দ্রনাথ তোমার চোখের বালি

হয়েছেন, কেবলই তাঁর ছুতো খুঁজে বেড়াচ্ছ তুমি; আর তোমাকে তারাই নাচাচ্ছে—যাদের অভ্যাস হচ্ছে তোমার মন পাবার জন্যে তোষামোদ করা। এ কিন্তু দুর্লক্ষণ বেবি।

ইন্দ্রাণী: ঐ ইতরটাকে নিয়ে তোমার সঙ্গে অনেক তর্ক করিছি বাপি, এখন সে প্রবৃত্তিও নেই। কিন্তু পরের তোষামোদ শুনে নাচবার মেয়ে আমি নই। হাতে কলমে প্রমাণ না পেয়ে কারুর ওপরে খড়্গহস্ত হওয়া আমার অভ্যাস নয়, সে ত তুমিও জান—বাপি!

ডাঃ ভাদুড়ী: কিন্তু কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করে তুমি মাস্টারকে দুমুখো সাপ বলতে পেরেছ—সে তুমিই স্বধু জান!

ইন্দ্রাণী: আমি জেনেছি বলেই তোমাকেও জানাচ্ছি। ঐ যে রাগিণী দেবী—ওর সঙ্গে আগে থেকেই মাষ্টারের যোগ সাজস ছিল। তলে তলে মাস্টার ওর সঙ্গে মিশে গানের এই কমপিটিশনে ও যাতে জিতে যায়, তার পথ পরিষ্কার করে রেখেছিল।

ডাঃ ভাদুড়ী: কি বলছ তুমি?···কিন্তু প্রমাণ—

ইন্দ্রাণী: প্রমাণ—ওর গান। মাষ্টার নিজেকে যে-গানে স্রষ্টা বলে বাহাদুরী করে এসেছে বরাবর...রাগিণীও সেই গান আজ আসরে গেয়েছে। সেই ছন্দ, সেই সুর। বরং ওকে যে গান দিয়েছে—তার রচনা, সুর, ভাব আরো উঁচু দরের। তারপর···সেই যে গানখানা ওর খাতা থেকে পেয়েছিলাম, যে-গান শেখাবার জন্যে কাকুতি মিনতি সাধাসাধির একশেষ করেও মত পাইনি—মনগড়া একটা ওজর তুলেছিল, সেই গানখানা গেয়েই ঐ রাগিণী আসর মাত করেছে বাপি! এরপরও তুমি কা বলতে চাও?

ডাঃ ভাদুড়ী : মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করেছ ?

ইন্দ্রাণী : এখন আর সে মাষ্টার নেই—তার মুখে এখন চড়া কথা, মূর্তিও বদলে গেছে। প্রণববাবু, কুসুম বাবু, কুমার বাহাদুর ঐ গানের কথা তুলতেই একবারে অগ্নি অবতার! সে মূর্তি যদি দেখতে, তুমিও চমকে উঠতে বাপি! পাছে একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড হয়—এই ভয়েই আমি ওখানে চুপ করেছিলাম। কিন্তু এর শোধ আমি নেব, এমন শিক্ষা ওকে দেব যে····

ক্রোধের আবেগে শেষের কথাটা আর ইন্দ্রাণীর মুখ দিয়া বাহির হইল না। কন্যার আরক্ত মুখ দেখিয়া এবং তাহার মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করিয়া ডাঃ ভাদুড়ী বলিলেন :

ডাঃ ভাদুড়ী : অনেক রাত হয়েছে বেবি, এখনো মুখ হাত ধোওনি দেখছি। বাথরুমে যাও, কাপড় চোপড় ছাড়—একটু ঠাণ্ডা হও। খেতে খেতে কথা হবে'খন।

ইন্দ্রাণীর দেহ ও মন তখন যেন ইটের পাজার মত ভিতরে ভিতরে পুড়িতেছিল। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পিতার দিকে একবার চাহিয়া ক্ষিপ্রপদে নিজের ঘরে প্রবেশ করিল।

* *
*

তৃতীয় দিনের আসরে দুই প্রদেশের প্রতিযোগিনী প্রতিভাময়ী গায়িকাদ্বয়কে একত্র দেখিবার জন্য প্রেক্ষাগারে সমাগত নরনারীদের অন্তরে আগ্রহের প্রাচুর্য খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এদিনে অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই মঞ্চ হইতে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিলেন যে, সহসা অসুস্থ হওয়ায় ইন্দ্রাণী

ভাদুড়ী এ দিনের বৈঠকে যোগদান করিতে পারিবেন না; সুতরাং রাগিণী দেবীকে লইয়াই তাঁহারা বৈঠকের কার্যারম্ভ করিবেন।

দ্বিতলের দুইখানি বক্ষে পূর্ব দিনের মত ইন্দ্রাণীর দলের আর সকলেই উপবিষ্ট হইয়া কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তি শুনিতেছে—এমন সময় চন্দ্রনাথ আসিয়া তাহার আসনে বসিল। বিজ্ঞপ্তির পর বিস্ময়োদ্বেগে সে ইন্দ্রাণীর বান্ধবীদের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল: সে কি—ইন্দ্রা আসেনি আজ? কি হয়েছে?

শোভা: তবে শুনলেন কি? বললে না—অসুখ করেছে?

চন্দ্রনাথ: তা শুনিছি—কিন্তু হঠাৎ হলো কি? কি অসুখ?

নীলিমা: আশ্চর্য! আপনি কিছু জানেন না?

চন্দ্রনাথ: না। আমি ত সকালে ওদিকে যাইনি—বাসা থেকে সরাসরি এখানেই এসেছি। অসুখটা কি জানেন? জ্বর—না আর কিছু?

কুঙ্কুম: ঐ বক্ষের কুসনে বসে কালই ত তিনি অসুস্থ হয়েছিলেন—আপনি যে জানেন না, তাও নয়!

প্রণব: অসুখ বলতে বুঝি সুধু জ্বরটাকেই চিনে রেখেছেন?

নিখিল: নিজেই তখন চটে উঠে আপনার মেজাজ খারাপ করেছিলেন, ওঁর মনের দিকটা ত দেখেন নি! দেখলেই, বুঝতে পারতেন—অসুখটা কী, আর—কি রকম কঠিন!

চন্দ্রনাথ: তখন বুঝতে পারিনি সত্যই—এখন অন্ততঃ অনুভব করতে পারছি। কিন্তু ইন্দ্রা খুবই ভুল করেছে! আপনারা যখন তার হিতার্থী—তাকে সুস্থ করে আজকের বৈঠকে আনলেই ভাল করতেন। না আসায় তার দুর্বলতাই প্রকাশ পাবে!

কুঙ্কুম: বেশ, আপনার উপদেশ তাকে শোনাব—হয়ত ওষুধের কাজ করবে।

নীলিমা : কিন্তু হলের মানুষগুলোর কাণ্ড দেখুন, অসুখের জন্যে এক জন আসতে পারল না শুনে কারুর প্রাণে একটুও বাজল না—দিব্যি ক্ল্যাপ দিলে চারদিক থেকে!

চন্দ্রনাথ : ওঁরা টিকিট কিনে এসেছেন আনন্দ উপভোগ করবার উদ্দেশ্যে। একজনের অনুপাস্থতির জন্য যে আপত্তি তোলেন নি, এইটিই সুখের কথা। এর কারণ হচ্ছেন—রাগিণী দেবী।

চন্দ্রনাথের মুখে এই মন্তব্য শুনিয়া বন্ধু বান্ধবীদের পক্ষ হইতে যুগপৎ প্রশ্ন উঠিল : কেন? কেন? কেন?

চন্দ্রনাথ একটু গম্ভীর হইয়া উত্তর করিল : কেন কথাটা বললাম, আপনারা কি সত্যিই বুঝতে পারেন নি? কালকের আসরে রাগিণী দেবীর সঙ্গীত শুনেও? এ আসরে আর কারুর গান জমতে পারে না—সঙ্গীত সম্বন্ধে যাঁদের রসবোধ আছে, তাঁরাই স্বীকার করবেন।

ইলা : তাহলে আপনি এইমাত্র কি উদ্দেশ্যে বললেন যে, এ বৈঠকে ইন্দ্রার আসা উচিত ছিল—সে গান করলেও জমবেনা বলেই যখন আপনার ধারণা?

মুখখানা কঠিন করিয়া চন্দ্রনাথ কহিল : বলেছিলাম এই উদ্দেশ্যে যে, পরাজিত হবার ভয়ে যুদ্ধকে এড়িয়ে যাওয়ার চেয়ে যুদ্ধে নেমে পরাজয়কে বরণ করে নেওয়াও গৌরবের কথা।

চন্দ্রনাথের কথাগুলি শুনিতে শুনিতে শ্রোতা ও শ্রোত্রীদের চোখগুলি উৎসাহে চকচক করিয়া উঠিল—ইহাদের প্রিয়বান্ধবীর রোষানলে ইন্ধন দিবার পক্ষে তথ্যগুলি যে কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ, সে সম্বন্ধে প্রত্যেকেই ছিল সচেতন।

* *

*

যবনিকা উঠিবার পর এদিন প্রথমেই বহুদর্শী বিচক্ষণ সঙ্গীতবিশারদ বিচারকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে তাঁহাদের অধিনায়ক দুই গায়িকার গানের যে বিশদভাবে আলোচনা করিলেন, তাহার মর্মার্থ এইরূপ :

সঙ্গীত-অধিরাজ্ঞী শ্রীযুক্তা ইন্দ্রাণী ভাদুড়ী তাঁর গানগুলির কোমল-মাধুর্য্যের প্রাধান্যে এবং রচনা ও সুরসৃষ্টির অভিনবত্বের জন্যে—প্রারম্ভেই শ্রোতাদের মন কেড়ে নিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর গানগুলি একই পর্যায়ভুক্ত বলে শেষ পর্যন্ত তিনি শ্রোতাদিগকে সমানভাবে আকৃষ্ট করে রাখতে পারেন নি। বিশেষ করে, দ্বিতীয় বাসরে সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী শ্রীযুক্তা রাগিণী দেবী ঠিক এই পর্যায়ের গানখানি সচ্ছন্দ সঞ্চারী-কণ্ঠে অধিকতর নিপুণতার সঙ্গে আলাপ করে—ইন্দ্রাণী দেবীর গানের অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্যকে লঘু করে দিয়ে এই গান সম্পর্কে তাঁরই প্রাপ্য জয়মাল্য খুব সহজেই ছিনিয়ে নিয়েছেন। রাগিণী দেবীর কণ্ঠে এই গানের আলাপের পূর্বে ইন্দ্রাণী দেবী এই অভিনব গানের স্রষ্টা রূপেও পরিচিতা ছিলেন। কিন্তু রাগিণী দেবী তাঁর লিখিত এক বিজ্ঞপ্তিতে স্বীকার করেছেন যে, অভিনব বলে অভিহিত এই পর্যায়ের গানের কথা ও সুরের সত্যকার স্রষ্টা তাঁর এমন এক উদাসীন গুরু—যিনি নাম ও খ্যাতির প্রত্যাশী নহেন। প্রয়োজন হলে তিনি এ সত্য প্রতিপন্ন করতে প্রস্তুত আছেন—রাগিণী দেবী এই গানের রূপ দিয়েছেন মাত্র। সুতরাং এ অবস্থায় ইন্দ্রাণী দেবীকে এই গানের স্রষ্টার মর্যাদাও দেওয়া যায় না। গানের রচনা ভঙ্গি একই ধারা আশ্রয় করেছে, কিন্তু প্রকাশ ভঙ্গির জন্যে রাগিণী দেবীর কণ্ঠের গান অনেক উচ্চ গ্রামে

উঠেছে। তা ছাড়া, ইন্দ্রাণীর তুলনায় রাগিণীর গায়কী আরও লঘু, এবং রোমাণ্টিক আবেগে আরো ক্ষিপ্র ও সচেতন হয়েছে। ইন্দ্রাণী দেবী গানে লাস্যভাবটি বেশী ফুটিয়ে তুলেছেন, পক্ষান্তরে রাগিণী দেবী তাঁর সুদৃঢ় মনের সংযত ভাবের দ্বারা ঐ অংশটিকে মধুর শান্ত রসে পরিণত করেছেন। রাগিণী দেবী প্রথমেই যখন ভজনের আলাপ করেন, সে সময় তাঁর কণ্ঠস্বর গভীর আবেগে এতই মধুর হয়ে ওঠে—যে ভাবে তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে যায়, তাতে মনে হয়েছিল, তিনি যেন গানের নিতলে হারিয়ে গেছেন। খেয়ালের গানে তাঁর কণ্ঠের গম্ভীর সুরময় আবেদন—সাঙ্গীতিক পরিভাষায় যাকে 'বোলন্দ' আওয়াজ বলা হয়, সেটি তাঁর কণ্ঠে বরাবর জড়িয়েছিল। শেষের ধ্রুপদ গানখানি সব দিক দিয়ে অতুলনীয়; ঐ গানের গায়কী যেমন জমাট, তেমনি নিবিড়। গানের অস্থায়ীতেও তিনি যে কুশলতা দেখিয়েছেন, তাও অসাধারণ। আরও বিশেষভাবে প্রশংসনীয় যে, প্রত্যেক গানখানি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, অথচ গানের পিছনে একটি বলিষ্ঠ পৌরাণিক কাহিনী রহেছে বিষয়বস্তুরূপে; কিন্তু প্রতিভাময়ী গায়িকা আরম্ভ গান থেকে শেষ পর্যন্ত সুস্থিরভাবে এমন একটি অখণ্ড রসময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন—যার জন্যে কোথাও কোন অংশে গভীর স্থায়ী রসে বাধার সৃষ্টি করেনি। সুতরাং এই সঙ্গীত সম্মেলনে সমাগত রসজ্ঞ সুধীবৃন্দের সমক্ষে আমরা পরম শ্রদ্ধাসহকারে সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী শ্রীযুক্তা রাগিণী দেবীকে পরম সম্মানীয়া সর্বশ্রেষ্ঠা কলাবতীরূপে স্বীকার করে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

অধিনায়কের উক্ত অভিভাষণের পর মধুর বাদ্য-ঝংকার ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে বহুমানাস্পদা রাগিণী দেবীরূপে শ্যামলী ধীর শান্ত সংযত পদক্ষেপে মঞ্চের আসরে উপস্থিত হইল। সমগ্র জনমণ্ডলী বিপুল আনন্দে বিবিধ ধ্বনিতে সম্বর্দ্ধনা জানাইল তাহাকে। পরণে তাহার লাল পাড়বিশিষ্ট পট্টবস্ত্র, মাথায় অল্প গুণ্ঠন, আপাদপ্রসারিত একখানি সুপ্রশস্ত চাদরে সর্বাঙ্গ আবৃত। আঙ্গিক সজ্জায়—কাজল-পরা আয়ত দুইটি চক্ষু এবং কর্ণ-বলয়-সংলগ্ন মুক্তা-খচিত স্বর্ণ-শৃংখলের টানাটি নাসাঙ্গুরীয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া দুর্বোধ্য প্রহেলিকার মতই এই গায়িকার স্বাভাবিক মুখখানির আকৃতি যেন প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ফলে এই রূপ-সজ্জায় অতি পরিচিতের পক্ষেও ইহাকে শ্যামলী বলিয়া চিনা সম্ভব ছিল না—যুক্তপ্রদেশবাসিনী সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলা বলিয়াই মনে হইতেছিল। মাথায় সিঁথির পাশেও মণিমুক্তাখচিত শিরোভূষণ; কপালে শ্বেত চন্দনের বড় ফোঁটাটি—চন্দনের মতই তার গায়ের রঙের সহিত মিলিয়া গিয়াছে। এই ভাবে রাগিণী দেবীকে এ দিন মঞ্চে দেখিয়া সমগ্র বিদগ্ধ-সমাজের মনে হইল যে, তাঁহাদের কল্পলোক-বিহারিণী মূর্তিমতী সঙ্গীত-রাণীই বৈঠকে উপবিষ্টা।

অনুষ্ঠানের কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক সাড়ম্বরে রাগিণী দেবীর সম্বর্দ্ধনার পরে এই আসরেও তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েকখানি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আলাপ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে নূতন আনন্দ দিলেন। প্রত্যেক গানের সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগারে পূর্বদিনের মতই উল্লাসের আলোড়ন উঠিল, রাগিণী দেবীর জয়ধ্বনিতে সমগ্র হল মুখরিত হইল।

* *

*

এদিনের অনুষ্ঠানের সূচী-পর্ব শেষ হইলে ইন্দ্রাণীর বন্ধুবান্ধবীরা চন্দ্রনাথকে ভাদুড়ী-ভিলায় তাহাদের সহিত যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেও সে তাহাতে সম্মত হয় নাই। তাহার মনের মধ্যেও একটা দারুণ ক্ষোভ গুমরাইতেছিল। তাহারও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ইন্দ্রাণী স্বয়ং আসিয়া আহ্বান না করিলে, ভাদুড়ী-ভিলার ছায়াও সে স্পর্শ করিবেনা।

ব্যাল্‌কনির নিচে দাঁড়াইয়া চন্দ্রনাথ বিপুল জন-সমারোহ এবং রাগিণী দেবীর উদ্দেশে তাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রশস্তি শুনিতেছিল। রাগিণীর গান শুনিয়া চন্দ্রনাথ মুগ্ধ হইলেও একটি বিষয়ে তাহাকে বিশেষ উন্মনা হইতে হইয়াছে। সে-দিনের স্মরণীয় সন্ধ্যায় ইন্দ্রাণীর প্রতীক্ষায় সে যখন পদাবলীর গান ধরিয়াছিল, সেই সময় কোন অজ্ঞাত কণ্ঠে তাহার অপরাংশ গীত হয় এবং অনেক চেষ্টা করিয়াও যাহার রহস্য সে উদ্ঘাটিত করিতে পারে নাই—সেই রহস্যময় কণ্ঠের সঙ্গে রাগিণী দেবীর কণ্ঠসঙ্গীতের আশ্চর্য রকমের সাদৃশ্য রহিয়াছে। চিন্তাসূত্রে সহসা তাহার মনে পড়িয়া যায়—শ্যামলীর কণ্ঠের কথা। যদিও গান সে জানে না, গান শিখবার আগ্রহ থাকিলেও কোনদিন সে সুযোগ তাহার অদৃষ্টে ঘটে নাই, কিম্বা চন্দ্রনাথ নিজেই তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছিল সেই সুযোগ লাভে....কিন্তু তাহার স্বাভাবিক কণ্ঠও ছিল এমনই সরস, সুন্দর ও সুমধুর! যদিও সেই ঘটনার কিছু পরে সহসা সেই ঘরে শ্যামলীর আবির্ভাব হইয়াছিল....কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করিয়া সে কিছুতেই ধারণা করিতে পারে নাই যে, শ্যামলীর মত সাধারণ মেয়ের পক্ষে ইহা সম্ভব হইতে পারে!....তাহার পর নিজেরই হঠকারিতার দোষে অত্যন্ত অপ্রীতিকর অবস্থা সৃষ্টি করিয়া শ্যামলী তাহার আদেশে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। যেমন সহসা সে আসিয়াছিল, তেমনই সেই রাত্রেই সে অদৃশ্য হইয়া যায়। তাহার পর এ পর্যন্ত শ্যামলীর কোন সন্ধানই নাই। মঙ্গলকে জিজ্ঞাসা করিলে সে

বলিয়াছে—শ্যামলী যেখান হইতে আসিয়াছিল, সেইখানেই চলিয়া গিয়াছে। চন্দ্রনাথও তাহাই বুঝিয়াছিল। কিন্তু রাগিণী দেবীকে প্রথম দিনে মঞ্চের আসরে দেখিয়া, তাহার কণ্ঠ সঙ্গীত শুনিয়া—শবর-বেশ ধারিণী নারীর মুখেও চন্দ্রনাথ যেন শ্যামলীর মুখের কিছুটা আদল দেখিয়াছিল। তাহার পর, আজিও মঞ্চের বৈঠকে রাগিণীর স্বাভাবিক মূর্তির পানে বহুক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া চাহিয়া চন্দ্রনাথ উপলব্ধি করিয়াছে যে, এই মুখখানির পরিমণ্ডলেও যেন শ্যামলীর মুখের আদল রহিয়াছে। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে গান দুইখানির কথাও গভীর ভাবে তাহার মনে দোলা দিয়া আসিতেছে। অথচ, উভয়ের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান—তাহাও তাহার অজ্ঞাত নয়। মানুষের মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্যের কথাও ত শোনা যায়! এই সব চিন্তার পর চন্দ্রনাথ স্থির করিল যে, রাগিণী দেবীর সঙ্গে যে কোন প্রকারে হোক দেখা করিয়া সে তাহাকেই ঐ গান দুই খানি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে। ইহা অসঙ্গতও নয়—যেহেতু একখানি গানের স্রষ্টা সম্পর্কে রীতিমত চ্যালেঞ্জ রহিয়াছে এবং গুরুদেবের গান খানির সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও তাহার পিছনের ইতিহাসটির সহিত সেও যখন সংশিষ্ট। কিন্তু রাগিণী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে রত্নেশ্বর রায়কে ধরিতে হয়। ভাদুড়ী-ভিলাতেই তাঁহার সহিত চন্দ্রনাথের আলাপ হইয়াছিল। চন্দ্রনাথ অগত্যা রত্নেশ্বরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

কিন্তু সঙ্গীতশালার বহির্মহল হইতে ভিতর মহলের সুসজ্জিত চত্বরের দ্বারপথে গিয়াই দেখিল যে, সহরের বিভিন্ন সমাজ, সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠানের বহু বরেণ্য ব্যক্তি নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী উপহার সামগ্রী লইয়া রাগিণী দেবীর দর্শনপ্রার্থী-রূপে সেখানে উপস্থিত—নামের কার্ড আগেই ভিতরে পাঠাইয়া আহ্বানের প্রতীক্ষা করিতেছেন ইঁহারা। সংবাদপত্রের

রিপোর্টারগণ রাগিণী দেবীর বিবৃতি লইবেন। কতিপয় উৎসাহী শিল্পী ক্যামেরা লইয়া আসিয়াছেন, উদ্দেশ্য—রাগিণীদেবীর ফটো তুলিয়া বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে সরবরাহ করিবেন। স্কুল ও কলেজের কতকগুলি ছাত্র-ছাত্রীও উপস্থিত, তাহাদের হাতে খাতা ও ঝর্ণাকলম—রাগিণী দেবীর অটোগ্রাফ তাহারা লইবেই।

অল্পক্ষণ পরেই রত্নেশ্বর ভিতর হইতে আসিয়া করজোড়ে সমবেত সকলকে অভিবাদন জানাইয়া সবিনয়ে বলিলেন: রাগিণীদেবী গানের আসরে গায়িকা রূপেই সাধারণের সম্মুখীন হইয়া থাকেন; কিন্তু গানের পর তিনি পুরাদস্তুর পরদানসীনা হয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতেই অভ্যস্ত। কোন অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ আলোচনাই তিনি পছন্দ করেননা। নিজের প্রদেশের বাইরে এসেই যে তাঁকে এই ভাবে পরদানসীনা হতে হয়েছে তা নয়; লক্ষ্ণৌ নগরেও এই ভাবে অন্তঃপুরিকার মত তিনি জীবন যাপন করেন। কেবল মাত্র গানের আসরেই এর ব্যতিক্রম হয়, অর্থাৎ সাধারণের সম্মুখীন হয়ে গানের আলাপ করেন এই পর্যন্ত। কিন্তু গান ছাড়া অন্য কথার সঙ্গে কোন সম্পর্কই থাকেনা ওঁর। সংবাদপত্র থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁরাও এ কথা থেকেই বোধ হয় বুঝতে পারছেন যে, নিজেকে প্রচার করবার কোন সাধ বা আগ্রহ ওঁর নেই। নিজের শিক্ষা দীক্ষা কিম্বা কৌলিক কোন কথা উনি বলবেন না। নিজের ছবি উনি এ পর্যন্ত কাউকে তুলতে দেননি—দেবেনও না। অটোগ্রাফও কাউকে দিতে নারাজ। যাঁরা ওঁর প্রতিভা দেখে তুষ্ট হয়েছেন, তাঁদের আশীর্বাদ কিম্বা শুভেচ্ছা উনি সাগ্রহে নেবেন, কিন্তু তার দরুণ কোন রকম পুরস্কার নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করলে, উনি সেটি নির্যাতন ভেবে নিদারুণ বেদনা-বোধ করবেন। ওঁর সম্বন্ধে সব কিছুই নিবেদন করা হয়েছে ভেবে আমি

ওঁরই পক্ষ থেকে আপনাদের প্রত্যেককে প্রীতির সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এমন ভাবে কথাগুলি সবিনয়ে অথচ গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া রত্নেশ্বর বাবু বলিয়া গেলেন যে, আশাভঙ্গ হইলেও অনেকেই মনে মনে প্রীত এবং অভিভূত হইয়া এই নিষ্ঠাবতী সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞীর প্রতি শুভেচ্ছা জানাইয়াই চলিয়া গেলেন। আবার কেহ কেহ বা নীতিশাস্ত্রের 'সর্বমত্যন্তগর্হিতম্' যুক্তি লইয়া বিরুদ্ধ সমালোচনাও করিলেন। কিন্তু আর কাহাকেও কোন দিক দিয়া কোন প্রকার অনুরোধ করিতে দেখা গেল না। এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চন্দ্রনাথ আগাগোড়া সমস্তই প্রত্যক্ষ করিল। ইহার পর তাহার পক্ষেও রত্নেশ্বর রায়ের সম্মুখীন হইয়া প্রস্তাবটি উত্থাপিত করা সম্ভব হইল না।

বাসায় আসিতেই মঙ্গল খামে মোড়া একখানি পত্র চন্দ্রনাথকে দিয়া বলিল—উর্দী পরা এক চাপরাসি এই চিঠি দিয়া একখানি খাতায় তাহার টিপসহী লইয়া গিয়াছে। চিঠি লইয়া চন্দ্রনাথ তাহার দ্বিতলের ঘরে গেল। খাম খুলিয়া চিঠি পড়িয়াই তাহার চক্ষুস্থির! সঙ্গীতশালায় যাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায় অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল সে, অথচ, আশা তাহার পূর্ণ হয় নাই—সেই রত্নেশ্বর রায়ই তাহাকে এই চিঠি লিখিয়াছেন। চিঠিখানি এইরূপ :

সঙ্গীত-ভবন : ৯নং চৌরিঙ্গী রো, কলিকাতা

প্রিয় চন্দ্রনাথবাবু,

একটি নারীর জীবন-মরণ-সম্বন্ধ-সূচক ঘটনা সূত্রে আপনাকে আগামী কল্য ২৮শে ডিসেম্বর সকাল আটটা হইতে নয়টার মধ্যে এখানে

আসিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। সাক্ষাতে সবিশেষ জ্ঞাত হইবেন। প্রীতি জানাইতেছি। ইতি ২৭শে ডিসেম্বর...

ভবদীয়

শ্রীরত্নেশ্বর রায়

এরূপ পত্র পড়িয়া চন্দ্রনাথের মত নিরীহ প্রকৃতি মানুষের চক্ষু পল্লব নিষ্পলক হইবারই কথা। একটি নারীর জীবন-মরণের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ—চিঠিখানি বার বার পড়িয়া এবং বহুক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়াও সে স্থির করিতে পারিল না। সেই নারী যে কে, তাহার সহিত কি সম্বন্ধ—চিঠিতে তাহার কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং এ ক্ষেত্রে চিন্তারও বিরতির কথা নহে। কলিকাতায় আসিয়া অবধি কোন্ কোন্ নারীর সহিত তাহার সম্বন্ধ বা আলাপ পরিচয় ঘটিয়াছে—উদ্বেলিত বক্ষে ও ক্লান্ত মস্তিষ্কে সে তাহাদেরই তালিকা করিতে বসিল। প্রথমেই যাহার নাম মনে পড়িল, সে হইতেছে—ইন্দ্রাণী ভাদুড়ী। তাহার পর যে মেয়েগুলির সহিত তাহার আলাপ হইয়াছে, আজও সঙ্গীতশালায় যাহাদের সহিত বসিয়া সঙ্গীত সম্মেলনের অনুষ্ঠান দেখিয়াছে, তাহারা হইতেছে ঐ ইন্দ্রাণী ভাদুড়ীর বান্ধবীর দল। সকলের নাম তাহার মনেও নাই। তাহার পরে—সেই সাংঘাতিক রাতে কয়েক ঘণ্টার জন্য এই বাসায় আসিয়াছিল, তাহাদের কাশীর বাড়ীর সম্পর্কে—শ্যামলী। সত্য কথা বলিতে কি, এই মেয়েটিকে লইয়াই আজ চন্দ্রনাথেরও চিন্তার অবধি নাই। সেইরাত্রে হঠাৎ আসিয়া এমন কাণ্ড বাধাইয়াছিল—যে জন্য ইন্দ্রানীর কাছে তাহার মুখখানা কালো হইয়া যায়! নিরূপায় হইয়াই তাহার প্রতি নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার করিতে হইয়াছিল তাহাকে। সে যাহাই হৌক, ঐ শ্যামলীর পর আর ত কোন নারীর সহিত তাহার আলাপ হয় নাই। তাহা হইলে চিঠিতে বর্ণিত এই নারীটি কে?...বুকের

মধ্যে, মাথার স্নায়ুপুঞ্জে এই সময় হঠাৎ ঐ শ্যামলীর নামটাই আবার যেন তালগোল পাকাইতে লাগিল—সেই সঙ্গে একটা প্রশ্নও উঠিল....এই শ্যামলীকে লইয়া কিছু হয় নাই ত?....ক্ষুদ্র প্রশ্ন, কিন্তু ইহার সঙ্গে কত কথা, কত সন্দেহ, কত সম্ভাবনা একটির পর একটি জড়াইয়া রহিয়াছে!....এই ঘরে এই শয্যায় বসিয়া পদাবলীর সেই গান—তাহার পরেই অলক্ষ্যে থাকিয়া সেই গানের আর এক অংশ কে যে গাহিয়াছিল, আজ পর্যন্ত তাহা নির্ণয় করিতে পারে নাই চন্দ্রনাথ। সেই গানের পরেই শ্যামলীর আবির্ভাব! তাহার উপরেই সন্দেহ স্বাভাবিক, কিন্তু সে স্বীকার করে নাই এবং গানও সে জানে না।...ইহার পর সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী রাগিণীর মুখ এবং কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ঐ শ্যামলীর মুখ ও কণ্ঠের মিল দেখিয়া মনে মনে এমন কল্পনাও সে করিয়াছে—যাহা মুখে বলিতেও তাহার সঙ্কোচ হয়, অন্য কেহ শুনিলেও তাহাকে খ্যাপা ভাবিয়া উপহাস করিবে।...এইরূপ কত চিন্তাই আসিয়া তাহাকে বিব্রত করিতে থাকে। শেষে অস্থির হইয়া কি ভাবিয়া অস্বাভাবিক কণ্ঠে চন্দ্রনাথ চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল: মঙ্গল—মঙ্গল—মঙ্গল!

মঙ্গল নিচের পাকশালায় গিয়া বাবুর মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করিতেছিল ঠাকুরকে লইয়া। এরূপ অদ্ভুত ডাক শুনিয়া সে সব ফেলিয়া পাগলের মত উপরে ছুটিয়া আসিল।

চন্দ্রনাথ তখন চিঠিখানার উপর পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছে—তাহার মুখ ও চক্ষু বিকৃত। ভীতকণ্ঠে মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল: কি হয়েছে? কার চিঠি? কি লিখেছে?

চিঠিখানা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া চন্দ্রনাথ কহিল:

চন্দ্রনাথ: একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, ঠিক জবাব দেবে বল?

মঙ্গল: বেঠিক জবাব কবে দিয়েছি যে এ কথা বলছ?

চন্দ্রনাথ : শ্যামলীর খবর কিছু জান ?

মঙ্গল : যা জানতুম, তোমাকে ত বলিছি--একবার নয়, দশবার। তুমি শ্যামল দিদিকে শ্যাল কুকুরের মত তাড়িয়ে দিলে, আর তিনি কান্নায় ফুলকোমুখো হয়ে চলে গেলেন। তবু আমি সুধিয়ে ছিনু—এত রাতে কোথায় যাবে দিদি? তিনি হাউ হাউ করে কেঁদে কইলেন—যেখান থেকে এয়েছিনু, সেইখানেই আবার ফিরে চলনু।

চন্দ্রনাথ : কোথা থেকে এসেছিল? এখানে কোথায় উঠেছিল—সে খবর কিছু জানো মঙ্গল দা? বল, বল, লক্ষ্মীটি—জানো?

মঙ্গল : আমায় ত শ্যামলদি কয়নি দাদাবাবু, কি করে জানব বলো? হয়ত সরাসরি এহানেই এয়েছিলেন। এখন ভাবি দাদাবাবু, অভিমানে না আপ্ত হত্যে করে বসেন।

মঙ্গলের কথার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রনাথ বাধা দিবার ভঙ্গিতে চীৎকার করিয়া আর্তকণ্ঠে কহিল:

চন্দ্রনাথ : চুপ কর মঙ্গলদা! বোলনা ওকথা—বোলনা। আচ্ছা, তুমি এখন যাও।

মঙ্গল : তা যাচ্ছি···ঠাকুর তোমার খাবার আনছে। আমি ওঘরে জল টল সব থুয়ে রেখিছি। শীগগীর হাত মুখ ধুয়ে নাও।

বলিতে বলিতে মঙ্গল চলিয়া গেল। কিন্তু মঙ্গলের মুখের ঐ 'আপ্তহত্যে' কথাটি তখন চন্দ্রনাথের দুই কাণের ভিতর দিয়া মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছে। গভীর আবেগে আর এক চিন্তা স্নায়ুপুঞ্জে আলোড়ন তুলিয়াছে—তাইত! দুর্ঘটনার সম্পর্কেই চন্দ্রনাথ বাবু তাহাকে এই পত্র লেখেন নাই ত? শ্যামলীর মত অভিমানী ও তেজস্বিনী মেয়ের পক্ষে সেই অপমান সহ্য করা সম্ভব

না হইতেও ত পারে! মঙ্গলের অনুমান যদি সত্য হয়, যদি সে সত্যই আত্মহত্যা....চন্দ্রনাথের সমস্ত অন্তর যেন অসহ্য এক বেদনায় মোচড় দিয়া উঠিল, দুই করপুটে ম্লান মুখখানি রাখিয়া চাপা গলায় আর্তস্বরে ডাকিল: শ্যামলী! ওরে শ্যামলী!!

* *

*

পরদিন সকালে বৃহৎ বাড়ির বহির্মহলের পাঠাগারে টেবিলের সামনে বসিয়া রত্নেশ্বর সংবাদপত্র পড়িতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার মন যুগপৎ ভিতরে ও বাহিরে ছুটাছুটি করিতেছিল। আটটা হইতে নয়টার মধ্যে চন্দ্রনাথের আসিবার কথা—কল্যকার পত্রে সেইরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তৎপূর্বে শ্যামলীরও এ ঘরে আসা প্রয়োজন—ভিতর মহলে প্রসাধন-কক্ষে সে প্রয়োজনমত রূপসজ্জা করিতেছে। সেই সূত্রে কক্ষের ভিতর দিককার দ্বারে টাঙানো পরদার উপর ঘন ঘন রত্নেশ্বরের দৃষ্টি পড়িতেছিল। কিছুক্ষণ প্রতীক্ষার পরেই পরদা ঠেলিয়া যে মেয়েটি কক্ষে প্রবেশ করিল—তাহাকে পূর্বদিন সম্মেলনের বৈঠকে অবিকল এই রূপ-সজ্জায় রাগিণী দেবীর ভূমিকায় দেখা গিয়াছিল।

শ্যামলী সহাস্যে বলিল: এসেছি মামাবাবু!

রত্নেশ্বর: দেরী করে ফেললে মা?

শ্যামলী: আটটা বাজতে এখনো পাঁচ মিনিট বাকি...আটটার আগে ত আর তিনি আসছেন না! মেক্ আপ করতেই যে এক ঘণ্টা লাগলো—দেখুন ত, ঠিক কালকের মতন হয়েছে কিনা?

রত্নেশ্বর: তা হয়েছে। চন্দ্রবাবু সামনে বসেও তোমাকে শ্যামলী বলে সন্দেহ করবেন না বলেই মনে হচ্ছে।

শ্যামলী : কিন্তু আমি তাঁকে যতদূর জানি মামাবাবু—সন্দেহ ওঁর মনে হবেই—এবং হয়েছেও।

রত্নেশ্বর : বল কি?

শ্যামলী : শিল্পীদের চোখে কোন চেহারা একবার ধরলে, হাজার সাজ বদলালেও সে ছবি যে মুছে যায় না মামাবাবু!

রত্নেশ্বর : হ্যাঁ, এ কথা মানি। তাহলেও আমরা যে রাস্তা ধরেছি—সন্দেহটাকে আমলই দেব না।

শ্যামলী : কিন্তু ওঁর মনে যদি ঐ আঘাতটা না লাগে?

রত্নেশ্বর : লাগবে না? অসম্ভব! শিল্পী মাত্রেই সেনটিমেণ্টাল—একটুতেই ওরা অনুশোচনায় ভেঙে পড়ে।

এই সময় গুর্খা ভৃত্য বাহাদুর সিং এক টুকরা কাগজ হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। উভয়কেই সামরিক প্রথায় শ্রদ্ধা জানাইয়া কাগজখানি রত্নেশ্বরের টেবিলের উপর রাখিয়া প্রভুর নির্দেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রত্নেশ্বর চিরকুটখানি তুলিয়া লইয়া পড়িলেন : চন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

ভৃত্যের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে রত্নেশ্বর বলিলেন : বাবুকে এখনি নিয়ে এসো।

বাহাদুর চলিয়া গেল। শ্যামলীর প্রফুল্ল মুখখানির দিকে চাহিয়া রত্নেশ্বর বলিলেন : আমি যে কথা বলছিলাম, নিজের চোখেই তা দেখতে পাবে।

শ্যামলী : আমি এখন কি করব?

রত্নেশ্বর : পাশের ঘরে সব ঠিক আছে। ওখান থেকে তুমি সব শুনতে এবং দেখতে পাও—এমন ভাবেই সোফাখানা রাখা হয়েছে। তুমি যাও মা—উনি আসছেন।

বাঁ করিয়া শ্যামলী সরিয়া গেল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই চন্দ্রনাথকে পৌঁছাইয়া দিয়া ভৃত্য বাহাদুর প্রস্থান করিল। রত্নেশ্বর বাবুকে অভিবাদন করিবার উদ্দেশ্যে চন্দ্রনাথের যুক্ত করযুগল ললাটস্পর্শ করিবার আগেই রত্নেশ্বর তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন: আসুন, চন্দ্রনাথ বাবু—আসুন। বসুন—বসুন!

টেবিলের অপরদিকে রক্ষিত সুদৃশ্য একখানি কেদারায় তাড়াতাড়ি বসিয়া চন্দ্রনাথ বলিল: আপনার চিঠি কাল পেয়েছি।

প্রসন্ন মুখে রত্নেশ্বর বলিলেন: সে বুঝিছি। নতুবা এত সকালে আপনার মত গুণী লোকের শুভাগমন কি প্রত্যাশা করতে পারি! যাক্—আগে চিঠির কথাই বলি। খুলে ত সব লিখতে পারিনি! এখন শুনুন···হ্যাঁ, একটু চায়ের ব্যবস্থা করি?

চন্দ্রনাথ: মাপ করবেন···ওদিকে কোন রুচিই এখন নেই। আমার মনের অবস্থা হয়ত বুঝতে পারছেন না····আপনি বলুন স্যার!

রত্নেশ্বর: আমি জানি—আপনারা···আই মীন···যাঁরা শিল্পী···কলাবিদ্ ····একটুতেই ভেঙে পড়েন। তবে এটা ভেঙে পড়বার মত ব্যাপারও বটে। সত্যই মেয়েটার জীবন-মরণ সমস্যা চলেছে···

চন্দ্রনাথ: সে কথা ত আপনি লিখেই জানিয়েছেন। কিন্তু সেই মেয়েটি কে····তাঁর সম্বন্ধে···

রত্নেশ্বর: সেই কথা বলবার জন্যই আপনাকে কষ্ট দিয়েছি চন্দ্রনাথবাবু! গোড়া থেকেই তাহলে বলি শুনুন: জানেন ত, এই সম্মেলন নিয়ে কি ভাবে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে? কিন্তু এর ওপরেও যে ঝনঝাট্ চেপেছে ঘাড়ে, সে এক মহা মুশকিলের ব্যাপার। শুনেছেন বোধ হয়, রাগিণী দেবী আমার এখানে উঠেছেন? তাঁর আসার পরেই এই বিভ্রাট! ঠিক সাত দিন

আগেকার কথা বলছি ; সে দিনটা—শনিবার। আমহার্ষ্ট এমপোরিয়মে রাগিণী দেবীকে নিয়ে কিছু সওদা করতে গিয়েছিলাম। ফেরবার মুখে হলো এক য়্যাকসিডেণ্ট !

চন্দ্রনাথ : য়্যাকসিডেণ্ট ? সে কি ?

রত্নেশ্বর : আর. বলেন কেন ? আবার—আপনাদের পাড়ার কাছেই—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ওপরে ঘটলো এই ব্যাপার! হঠাৎ একটা মেয়ে আমাদেরই মোটরে চাপা পড়লো !

চন্দ্রনাথ : চাপা পড়লো !···মেয়ে ?····য়্যা !

রত্নেশ্বর : ড্রাইভার অবিশ্যি বলছে—তার কোন দোষ নেই, মেয়েটিই ছুটে এসে মোটরের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল···

চন্দ্রনাথ : তারপর····তারপর কি হলো ?

রত্নেশ্বর : ড্রাইভার আমার খুব পাকা, ব্রেক কষে মোটর তখনি রুখেছিল; কিন্তু ভীষণ চোট খেয়ে মেয়েটি সেন্স হারিয়ে ফেলে। আমরা তাকে সেই অবস্থায় মোটরে তুলে ধর্মতলায় আমাদেরই একটা জানা শোনা নার্সিং হোমে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিলাম। একটা আলাদা চেম্বার, নার্স, ভালো ডাক্তার, ওষুধ পত্র—সব কিছুই ব্যবস্থা করা গেল। এদিকে সম্মেলনের হাঙ্গামা, ওদিকে অচেনা একটা মেয়েকে নিয়ে এই ঝামেলা ! বুঝুন—ব্যাপার খানা !

চন্দ্রনাথ : তার পর ?···এখন তার অবস্থা ?

রত্নেশ্বর : সেই কথাই এবার বলছি ! কাল সকালে খবর পেলাম···· মেয়েটির জ্ঞান হয়েছে···কথা বলছে !

চন্দ্রনাথ : কথা বলছে ?····তাহলে···নামটাও···

রত্নেশ্বর : শুনুন.ত·· শুনেই ছুটলাম সেই হোমে। এদিকে ত সকালেই

সম্মেলনের তৃতীয় আসর—জানেন! গিয়ে দেখি, সেন্স এসেছে, আর কথা বলছে; মানে—ডিলিরিয়মের স্পীচ্‌···ভাঙা ভাঙা এলো মেলো ডায়লেক্ট্‌···তাতে আপনার নাম শুনেই····

চন্দ্রনাথ: আমার নাম···

রত্নেশ্বর: নতুবা আপনাকে ও ভাবে চিঠি লিখতে পারি চন্দ্রনাথ বাবু? বিকারের ঝোঁকে বললেও এমন কতকগুলি চেনা নাম তার মধ্যে শোনা গেছে, যাতে উপেক্ষা করা যায় না। সেই জন্যেই আপনাকে কষ্ট দিয়েছি—যদি তা থেকে মেয়েটির কোন পরিচয় পাওয়া যায়। তার ঐ অসংলগ্ন কথাগুলি আমি নোট করে নিয়ে যে সেনটেন্সটি তৈরী করেছি, সেটা এই রকম দাঁড়ায়; আমি ডায়েরিতে লিখে রেখেছি, পড়ি শুনুন—

টেবিল হইতে বাঁধানো ডায়েরী বহি খানি লইয়া তাহার মধ্যে লিখা পৃষ্ঠাটি রত্নেশ্বর পড়িতে লাগিলেন:

'চন্দর দা···কি করে তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিলে····ইন্দ্রাণী তোমার এত আপনার হলো....সে গান জানে ব'লে····কিন্তু তুমি ত শ্যামলীকে গান শেখাও নি···ইন্দ্রাণীর মন রাখতে তুমি তাকে তাড়িয়ে দিলে····এ প্রাণ ত শ্যামলী রাখবে না।'····এ থেকে মনে হয়—মেয়েটির নাম শ্যামলী। তার পর ঐ গানের সঙ্গে 'ইন্দ্রাণী' এবং 'চন্দ্রদা' নামটি শুনে মনে হলো—আপনাকে আর ইন্দ্রাণী ভাদুড়ীকে একবার জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। তাই···

ডায়েরীতে লিখা পরিচিত কথাগুলি শুনিতে শুনিতে চন্দ্রনাথের সমস্ত অন্তরটি মথিত করিয়া সেই রাত্রের অপ্রীতিকর ব্যাপারটি বাস্তব ছবির মত তাহার চক্ষুর উপর যেন ফুটিয়া উঠিল! উদ্বেলিত বক্ষে কম্পিত কণ্ঠে অপ্রকৃতিস্থের মত সে চীৎকার করিয়া বলিল: জিজ্ঞাসা করবার আর

আবশ্যক নেই রত্নেশ্বর বাবু! আপনি সুধু দয়া করে আমাকে এখনি সেখানে নিয়ে চলুন—আমি তাকে দেখব…আমি তার সেবার ভার নেব …আমাকে নিয়ে চলুন….দোহাই আপনার… নিয়ে চলুন সেখানে।

বলিবার সঙ্গে সঙ্গে সবলে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল চন্দ্রনাথ। রত্নেশ্বর জোর করিয়া মুখে বিস্ময়ের ভাব ও ভঙ্গি ফুটাইয়া বলিলেন: আপনি তাহলে ঐ মেয়েটিকে চেনেন নাকি? তবে কি ডিলিরিয়ামের কথাই ঠিক….ওর নাম তবে…

অধৈর্য্যভাবে চন্দ্রনাথ বলিল: এসব কথা এখন থাক….আমি আপনাকে সব বলব, সব বলব….তবে জেনে রাখুন স্যার.. আপনি যা শুনেছেন, যে সব কথা বলেছেন শ্যামলী…সব সত্য….সত্য .. হ্যাঁ—সত্য…. আপনি আমাকে নিয়ে চলুন স্যার…

চন্দ্রনাথকে অত্যন্ত বিহ্বল দেখিয়া রত্নেশ্বর তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন, বলিলেন: আপনি অধীর হবেন না চন্দ্রনাথ বাবু! বসুন, আমি এখনি আপনার সামনেই ফোনে খবর নিচ্ছি।

টেবিলের পাশেই টেলিফোন ছিল। চন্দ্রনাথের সামনেই রত্নেশ্বর বাবু রিসিভারটি কানের কাছে ধরিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন:

আমি রত্নেশ্বর….হঁ্যা…চন্দ্রনাথ বাবু এসেছেন ..ওঁর কথায় বুঝতে পারছি—ঐ শ্যামলী….উনি ভারি ব্যস্ত হয়েছেন দেখবার জন্যে ..এখন হবে না…ঘুমুচ্ছে …বটে…বিকেলে… পাঁচটার সময়….বেশ—তাই..হ্যাঁ—উনি কাশীর লোক; ওখানেই বাড়ী—ডোমিসাইল্ড.. কেন বলত….চেনা আছে…. সহপাঠী….আচ্ছা দিচ্ছি….

ফোনের রিসিভারটি হাতে রাখিয়া রত্নেশ্বর বলিলেন:

রত্নেশ্বর: শুনুন, আজকের অবস্থা অনেকটা ভালো—অনেকদিন পরে

আরামে ঘুমিয়েছেন। কাজেই এ বেলা দেখা হবেনা—বিকেলে পাঁচটার সময় আপনাকে নিয়ে যেতে বললেন ওখানকার ইনচার্জ অবনী ডাক্তার। উনি আপনার সঙ্গে কথা কইতে চান ; আপনার নাম, পেশা ও জন্মস্থানের পরিচয় পেয়ে চিনে ফেলেছেন—এলহাবাদ কলেজের সহপাঠী আপনার।

চন্দ্রনাথ : সহপাঠী—আমার ?

রত্নেশ্বর : হ্যাঁ—ওঁর নাম অবনী চৌধুরী। শ্যামলীর কথাও উনি···

চন্দ্রনাথ : অবনী ? সে এখানে····

রিসিভার লইয়া এবং কানে লাগাইয়া চন্দ্রনাথ আলাপ আরম্ভ করিল :

অবনী····আশ্চর্য ! তুমি ডাক্তার হোয়ে এখানে···বটে ?···· হ্যাঁ—হ্যাঁ···সেই শ্যামলী···যার কথা নিয়ে মেসে···শেষে তোমার হাতেই ওর জীবন মরণ ··বাঁচবে ?····সত্য বলছ ?···· আচ্ছা, ও ঘুমালেও এখন দেখতে কি বাধা আছে ?····সুধু দাঁড়িয়ে দেখব ওকে···তবে থাক···তাহলে বিকেল পাঁচটায়··· হ্যাঁ বলব—সব বলব ···আচ্ছা ··আচ্ছা ··

চন্দ্রনাথ রিসিভার রাখিয়া দিয়া আসনে বসিতেই রত্নেশ্বর বলিলেন :

রত্নেশ্বর : যাক্—অবনীর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে জেনে আমিও আশ্বস্ত হলাম।

চন্দ্রনাথ : এলাহাবাদের হোষ্টেলে আমরা দুজনে এক ঘরে থাকতাম। অবনী ডাক্তারী পড়ত। ডাক্তার হোয়ে কলকাতায় এসে যে প্রাকটিস্ করছে তা জানতাম না। ওকে অনেক করে বললাম—শ্যামলীকে এখনই দেখবার জন্যে ; বললে—উপায় নেই।

রত্নেশ্বর : এ রকম রোগী ঘুমালে, তার ঘরের ত্রিসীমায়ও কাউকে যেতে

দেওয়া হয় না কি না। তাহলে আমিই বলতাম। অবনী আমার ছোট ভায়ের মত স্নেহভাজন।

চন্দ্রনাথ: তাহলে এখন উঠি স্যার! বিকেলে ঠিক সাড়ে চারটায় আমি আসছি।

রত্নেশ্বর: যখন এসেছেন, রাগিণী দেবীর সঙ্গে একবার আলাপ করে যাবেন না?

চন্দ্রনাথ: না—স্যার, এখন নয়—আমার মনে কিম্বা মাথায় আর কিছুই এখন সৈঁধুবে না। সে অন্য একদিন হবে!

রত্নেশ্বর: দেখুন—রাগিণী দেবীও ঐ মেয়েটির জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। তার প্রথম কারণ হচ্ছে—উনি যে গাড়ীতে ছিলেন, তাতেই ও চাপা পড়েছিল; দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে—ওর মুখখানা কতকটা রাগিণী দেবীর মুখের মতন।

চন্দ্রনাথ: আমি তা জানি।

রত্নেশ্বর: জানেন? .. মানে....

চন্দ্রনাথ: রাগিণী দেবীকে মঞ্চে দেখেই আমি চমকে উঠেছিলাম। স্বধু মুখের আদল বলে নয় স্যার, গলার স্বরেও আশ্চর্য মিল। এমন সাদৃশ্য বড় একটা দেখা যায় না। তাছাড়া, আর একটা কারণে ওঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কালও আমার মনে প্রচুর আগ্রহ ছিল; গ্রীণ রুমের দিকে আমি এগিয়ে গিয়েছিলামও। কিন্তু আপনার বক্তৃতার পর আর চেষ্টা করি নি।

রত্নেশ্বর: বটে! আমি কিন্তু আপনাকে ওখানে লক্ষ্য করিনি। তা—ঐ কারণটি শুনতে পাই না?

চন্দ্রনাথ: আজ আর নয় স্যার, আমার মনের আবস্থা এখন ভাল নয়,

আর, যে জন্যে আগ্রহ জেগেছিল তখন, এখন আর তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। উঠলাম স্যার—নমস্কার।

রত্নেশ্বর সবিনয়ে প্রতি নমস্কার করিয়া বলিলেন: আপনাকে আর কষ্ট করে এখানে আসতে হবে না, আমিই আপনাকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে যাব।

চন্দ্রনাথের প্রস্থানের পর পরদার পাশ দিয়া ঘরখানি চঞ্চল দৃষ্টিতে দেখিয়া ধীরে ধীরে শ্যামলী প্রবেশ করিল। তাহার পর যে চৌকীতে চন্দ্রনাথ বসিয়াছিল, তাহাতেই বসিয়া সাহাস্যে বলিল:

শ্যামলী: তাহলে এত সাজন গোজনই সার হলো মামাবাবু?

রত্নেশ্বর: অদৃষ্ট! কিন্তু আমার এই অব্যর্থ চালটির জন্য এখন বাহোবা দাও। কালও যে লোক রাগিণী দেবীর সঙ্গে মুলাকাতের উদ্দেশ্যে আর্জী জানাতে গিয়েছিল, আজ সেই লোকই রাগিণী দেবীকে দেখা দেবার আর্জী নামঞ্জুর করলে! এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে শ্যামল —

ইন্দ্রাণী রাগিণী সব গেছে অস্ত—
চন্দ্রনাথই এখন শ্যামলী-গ্রস্ত!

শ্যামলী: আপনি থামুন—তবু যদি সে রাতে শ্যামলীর খোয়ার দেখতেন! কি রাগ, কি তম্বী!

রত্নেশ্বর: আর আজকের মুখখানার ভঙ্গিটাও দেখেছ ত আড়াল থেকে! ভাবলাম, বেচারা বুঝি ডাক ছেড়ে কেঁদেই ফেলে মেয়েদের মত!

শ্যামলী: শেষকালে ঐ কেঁচো খুলতে খুলতে সাপটাকে বার করে কিন্তু ভারি মুস্কিলে ফেললেন মামাবাবু!

রত্নেশ্বর: অবনীর কথা বলছ? আরে তোমাদের দুজনের নাম শুনেইত

সেদিন আদিকাণ্ড গেয়েছিল অবনী মনে নেই? হাতের ডাক্তার আর নিজেদের হোম না হলে কি আর এভাবে একটা 'মক্-ফাইট' করা সম্ভব হোত? এখন বুঝতে পারা গেল এই কাণ্ড থেকে—যেখানে যত বেশী উপেক্ষা, সেখানেই তত বেশী প্রতীক্ষা!

শ্যামলী: যান্—আপনি ভারি দুষ্টু!

* *
*

ধর্মতলা ষ্ট্রীটের একাংশে ক্যালকাটা নার্সিং হোমের ফ্লাটটি কেতাদুরস্তভাবে সাজানো এবং এখানকার ব্যবস্থাগুলিও সর্বাঙ্গসুন্দর। হোমের সঙ্গে একটি ডাক্তার-খানাও আছে। এলাহাবাদ হোষ্টেলে পঠদ্দশায় চন্দ্রনাথের সঙ্গে অবনীর সম্প্রীতির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তৎকালে চন্দ্রনাথ তাহাদের কাশীর বাড়িতে শ্যামলীর অবস্থিতি এবং তাহার প্রতি মাতার একান্ত নির্ভরতা ও পক্ষপাতিতায় বিক্ষুব্ধ হইলে—এই অবনীকেই অপরিচিতা শ্যামলীর পক্ষ সমর্থনে তাহার সহিত বিতর্ক করিতে দেখা গিয়াছে। সেই অবনীর চিকিৎসা-নৈপুণ্যে প্রীত হইয়া রত্নেশ্বর তাঁহার বিশিষ্ট চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনাভার তাহাকেই অর্পণ করিয়াছেন।

এক নির্বোধ সঙ্গীত-শিল্পীকে হাতে কলমে রীতিমত আক্কেল দিবার উদ্দেশ্যে, তাঁহার ভাগিনেয়ী শ্যামলী সংক্রান্ত ব্যাপারটি অবনীকে বলিবার সময়, পূর্বের সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া যায়। অবনী তখন সহাস্যে জানায় যে, সেই বোকা শিল্পিটিই তাহার এককালের প্রীতিবদ্ধ বন্ধু, এবং শ্যামলী সংক্রান্ত তৎকালের তথ্যগুলিও তাহার অপরিজ্ঞাত নয়। ইহাতে রত্নেশ্বর বাবু উৎফুল্ল হইলেও, শ্যামলী লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিন্তু

অবনীই তাহাকে উৎসাহ দিয়া বলে—'আপনি এখন লজ্জা করছেন; কিন্তু আপনাকে না দেখলেও—আপনার সম্বন্ধে জোরালো কথা সব শুনে, আপনার পক্ষ নিয়েই তখন তর্ক করেছি চন্দ্রনাথের সঙ্গে। কে জানত, আপনাদের মধ্যে মিলনগ্রন্থী পরাবার জন্যে শেষে ডাক্তার হয়ে আমাকেই এভাবে চিকিৎসার ভাণ করতে হবে!'

শ্যামলী অবনীকে কিছু না বলিয়া মুখের খানিকটা আঁচলে চাপা দিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া রত্নেশ্বরের কানে কানে বলে—একটা কথা আছে মামাবাবু—'মোষের শিং বাঁকা, কিন্তু যোঝবার সময় একা।' এই বন্ধুদের দশাও তাই! ভয় হচ্ছে, যদি আগেই সব ফাঁস করে দেন?

হো হো করিয়া হাসিয়া রত্নেশ্বর বাবুই জবাব দেন—'সে ভয় নেই—চন্দ্রনাথের সাবেক বন্ধু হলেও, হালে এখন উনি আমাদের হাতে। ওঁকে দিয়েই অভিনয়টা খাসা ওতরাবে দেখো!'

ইহার পর অবনী ডাক্তারের প্রধান কাজ হইল, বিভিন্ন প্রকৃতির এই দুইটি তরুণ তরুণীকে উপলক্ষ করিয়া অভিনব এই রঙ্গ-নাট্যটির অভিনয় সার্থক করা। তাই তিনি নির্দেশ দিলেন—নার্সিং হোমে চন্দ্রনাথের আসিবার পূর্বেই শ্যামলীকে সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দুর্ঘটনায় পতিতা বিকারগ্রস্তা রোগিণী সাজিয়া এখন শয্যাশায়িনী হইতে হইবে। এই সূত্রে একখানি স্বতন্ত্র ঘরে চুপিসাড়ে ইহার ব্যবস্থা চলিতে থাকে। শ্যামলীর সহিত গীতাও আসিয়াছে নার্স দুটিকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে। সেই রাত্রে যেরূপ বেশভূষা করিয়া, ঝি সাজিয়া শ্যামলী চন্দ্রনাথের বাসায় গিয়াছিল, অঙ্গে এবং কক্ষে তাহাদের নিদর্শন রাখা হইল। শ্যামলীকে এখানে রাখিয়া রত্নেশ্বর চন্দ্রনাথকে আনিতে গেলেন।

অবনী ডাক্তার তাহার চেম্বারে প্রস্তুত হইয়া রহিল। এই ধরণের রহস্য চিকিৎসা তাহার জীবনে এই প্রথম।

পাঁচটা বাজিবার মিনিট কয়েক পূর্বেই রত্নেশ্বর চন্দ্রনাথকে লইয়া ডাক্তারের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার সহর্ষে উঠিয়া দুইজনকেই অভ্যর্থনা করিয়া সামনের আসনে বসাইল।

চন্দ্রনাথ: আমি যেমন আঘাত পেয়েছি, তেমনি আশ্বস্ত হয়েছি—এ সময় তোমাকে পেয়ে অবনী। সেই শ্যামলী—তুমি যার পক্ষ নিয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করতে!

অবনী: আমিও কম আঘাত পাইনি চন্দ্র! আরো ব্যথা পেয়েছি—ওবেলাই তোমার অনুরোধ রাখতে না পারায়। সত্যই আমি তখন নিরুপায় হয়ে পড়েছিলাম।

রত্নেশ্বর: এবেলার কি খবর?

অবনী: কিছুটা সেন্স এসেছে, তবে ব্রেণটা ঠিক ওয়ার্ক করছে না। চলুন না, দেখবেন। এখন জেগে আছেন, টেমপারেচারও প্রায় নর্মাল। চলুন...চন্দ্র, তুমিও চল;

* *

*

রোগিনীর ঘর। লোহার খাটে সাদা বিছানার উপর শ্যামলী শুইয়া আছে। মাথায়, ঘাড়ে, দুই বাহুমূলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। দুইজন নার্স, পরিচর্যা করিতেছে। অবনী ডাক্তার, রত্নেশ্বর ও চন্দ্রনাথ শয্যার কাছে দাঁড়াইয়া শ্যামলীর দিকে চাহিয়া আছেন। শ্যামলীর মুখের ভঙ্গি যেন অস্বাভাবিক।

শ্যামলীর অবস্থা দেখিয়া চন্দ্রনাথের আয়ত দুটি চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, সুন্দর মুখখানা কালো হইয়া গিয়াছে; সে আর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, সহসা সবেগে সেই শুভ্র শয্যার দিকে ছুটিয়া

গিয়া খাটের পাশে জানু পাতিয়া বসিয়া আর্তস্বরে ডাকিল: শ্যামলী—শ্যামলী—শ্যামল!

ডাক্তার অবনীও তাড়াতাড়ি চন্দ্রনাথের কাছে গিয়া দাঁড়াইল সতর্ক দৃষ্টি তাহার দিকে নিবদ্ধ করিয়া। চন্দ্রনাথের দুই চক্ষু বাহিয়া তখন অশ্রুর বন্যা নামিয়াছে।

চন্দ্রনাথের কথা কানে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু অনুভব কিছু করিতেছে না—এমনই ভঙ্গিতে শ্যামলী ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চন্দ্রনাথের পানে নিস্পলক নয়নে একই ভাবে কিছুক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া রহিল। অশ্রুপ্লাবিত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চন্দ্রনাথ পুনরায় ডাকিল: শ্যামল! আমি এসেছি—আমি তোমার চন্দরদা!

এবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল শ্যামলী—হাসির পরেই মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল: না না না....বোক না চন্দরদা, বোক না—হাসব না! তাড়িয়ে দিও না আমাকে—আমি খাব না—সত্যি বলছি খাব না...

ইহার পর আবার সেই খিল খিল করিয়া হাসি!

চন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল: শ্যামল! আমাকে ক্ষমা কর। তুমি সেরে ওঠ শ্যামল, আমি তোমাকে আদর করে খাওয়াব, আমি তোমাকে গান শেখাব শ্যামল, আমি তোমাকে নিয়ে কাশী ফিরে যাবো, তুমি সেরে ওঠ শ্যামল!

যেন কথাগুলি কানে যায় নাই, বুঝিতে পারে নাই, এমনি মুখভঙ্গি করিয়া শ্যামলী এবার হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল! কান্নার সঙ্গে অসংলগ্নভাবে বলিয়া চলিল: আমি খাবনা, খাবনা—আমাকে বোক না, আমি মরবো, আমি মরবো! ও মাগো!....

আবার সেই কান্না এবং সেই সঙ্গে বন্ধনে আড়ষ্ট দেহটাকে তুলিবার

জন্য কি তাহার উন্মত্ত প্রয়াস! সতর্ক দুইটি নার্স সবলে তাহাকে ধরিয়া রাখিল।

অবনী ডাক্তার তাড়াতাড়ি চন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া বলিল: আর নয় চন্দ্র—চলো। তুমি থাকলে ওঁর অনিষ্ট হবে। আমরা ভারি ভুল করেছি।

নির্বাক দৃষ্টিতে শ্যামলীর মুখের পানে একটিবার চাহিয়া, সমস্ত বেদনা সবলে চাপিয়া, অবনীর হাতখানি ধরিয়া চন্দ্রনাথ টলিতে টলিতে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

* *

*

ইহার পর আরও কয়েক দিন অতীত হইয়াছে। কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যে অপরিসীম আগ্রহ সত্ত্বেও চন্দ্রনাথ শ্যামলীকে দ্বিতীয় বার আর দেখিতে পায় নাই। অবনী ডাক্তার বলিয়াছেন যে, প্রথম দিনের সাক্ষাৎকারের ফল শ্যামলীর পক্ষে এতই খারাপ হইয়াছে—তাহার টাল সামলাইতে এখন সাতটা দিন কাটিয়া যাইবে। যদি শ্যামলীকে বাঁচাইতে চাও, তাহা হইলে সাক্ষাতের চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইবে। কাজেই, চন্দ্রনাথ আর কোনদিনই নার্শিংহোমের ফুটপাথও মাড়ায় নাই। এই কয়দিন প্রত্যহ সকালে সে রত্নেশ্বরের বাড়িতে আসিয়া বসে; সেখান হইতেই ফোনে তাহার সংবাদ লয় এবং রত্নেশ্বর বাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া চলিয়া যায়। আশ্চর্য এই যে, একটা বৎসর যে লোক শ্যামলীর নামও করে নাই, এখন তাহার মুখে শ্যামলী ছাড়া আর কথা নাই; বুঝি তাহার চিন্তা, বিশ্রাম, আহার, নিদ্রা, এক কথায়—তাহার সমস্ত সত্তাই এখন শ্যামলীময় হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে রত্নেশ্বর বাবু রাগিণীর কথা তুলিয়াছেন, তাহার সহিত আলাপের প্রস্তাবও করিয়াছেন, কথায় কথায় ইন্দ্রাণীর প্রসঙ্গও উঠিয়াছে, কিন্তু চন্দ্রনাথের

ভ্রূক্ষেপও নাই সেদিকে—কোনরূপ আগ্রহই প্রকাশ পায় না তাহার কথায় বা মুখের ভঙ্গিতে। শ্যামলী না সারিলে কোন মেয়ের সংস্পর্শেও সে যাইবে না, গানের কথা মুখেই আনিবে না—ইহাই তাহার এখনকার মনোভাব এবং কথাপ্রসঙ্গে গম্ভীরমুখে এই কথাই সে বলিয়া থাকে।

অন্তরাল হইতে শ্যামলী শোনে চন্দ্রনাথের কথা, তাহারও দুই চক্ষু আর্ত হইয়া উঠে; পিছন হইতে গীতা চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া বলে—'আর ফাঁকি চলছে না, ধরে ফেলেছি। বেচারীকে কিন্তু খুব খেলালে! সেদিন সবার সামনে যে কাণ্ড করলে—হাসি-কান্নার যে লীলা দেখালে, মাগো! মনে পড়লে এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! কে বলবে যে মিছে—অভিনয়!

শ্যামলী তাড়াতাড়ি আত্মসম্বরণ করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া জবাব দেয়—জানিস, এও একটা সাধনা!

* *
*

রত্নেশ্বর সযত্নে চন্দ্রনাথকে নিজের গাড়ী করিয়া তাহার বাসায় প্রতিদিন পঁহুছাইয়া দেন। এমন কি, দুদিন-সকালেও মোটর পাঠাইয়াছিলেন তাহাকে আনিবার জন্য। কিন্তু লাজুক-প্রকৃতি চন্দ্রনাথ ইহাতে সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। 'সকালে অন্যত্র কাজ থাকে, সে কাজ সারিয়া আসিতে হয়'—এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া সে মোটর পাঠাইবার ব্যবস্থা রহিত করিতে পারিয়াছে, কিন্তু ফিরিবার সময় কোন সঙ্গত যুক্তি তাহার মাথায় না আসায় মোটরে উঠিতে হয়, রত্নেশ্বরের মত মানী লোকের অনুরোধকে ত আর উপেক্ষা করা যায় না! কিন্তু ইহার মধ্যে সুযোগ পাইলেই ফোনে শ্যামলীর খবর লইবার পর অতর্কিতভাবে কোন কোন

দিন সরিয়াও পড়ে। সেদিনও এমনই একটি সুযোগ ঘটিয়া গেল। চন্দ্রনাথকে দেখিয়াই রত্নেশ্বর জানাইলেন: এইমাত্র ফোনে খবর পেয়েছি—শ্যামলীর সে ক্রাইসিস্‌টা (crisis) কেটে গেছে—আর দুদিন পরে দেখা করতে পারা যাবে।

চন্দ্রনাথের মুখখানি এই সুসংবাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ মনে মনে হিসাব করিয়া ফেলিল—'আজ রবিবার, কাল সোমবার, পরশু বুধবার—তাহলে আস্‌ছে বৃহস্পতিবার ওখানে যাওয়া চলবে।'

সাংসারিক অনেক বিষয়েই এই উচ্চশিক্ষিত উদার যুবকটির মনোবৃত্তিতে এইরূপ বালকসুলভ চপলতার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। রত্নেশ্বর বলিলেন: বোস।

কিন্তু চন্দ্রনাথ বসিবামাত্রই রত্নেশ্বরকে উঠিতে হইল—কক্ষান্তরে একদল দর্শনপ্রার্থীর সহিত আলোচনার উদ্দেশে। চন্দ্রনাথকে বলিয়া গেলেন: ওঘরে একটা কাজ সেরে আসছি।

চন্দ্রনাথ ভাবিল—স্থানত্যাগের এই এখন উত্তম সুযোগ। নতুবা, চায়ের সহিত এক থালা জলখাবার এখনি আসিবে এবং রত্নেশ্বর বাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করা চলিবে না। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই সে ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল।

কিন্তু বিধাতা তাহার অদৃষ্টে যে দুর্ভোগ লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ত আর ব্যর্থ হইবার নহে। রত্নেশ্বরের বাড়ির বাহিরে কিছু দূরেই তিনটি রাস্তার সংযোগ স্থল। চন্দ্রনাথ এইখানে আসিয়া একটা রিক্সার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ধরিয়া একখানি বাড়ীর মোটর এই স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল। গাড়ীর ভিতরের দুটি আরোহী-যে শ্যেনদৃষ্টিতে চন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিতেছিল, তাহা চন্দ্রনাথ লক্ষ্য করে নাই এবং ইহা

তাহার লক্ষণীয়ও নয়। আরোহীদ্বয় যুগপৎ গাড়ী হইতে নামিয়া সবেগে চন্দ্রনাথের উভয় পার্শ্বে আসিয়া সোল্লাসে বলিল : হ্যাল্‌লো চন্দ্রনাথ বাবু!

সবিস্ময়ে চন্দ্রনাথ দেখিল—ইন্দ্রাণীর বৈঠকখানার বন্ধু কুঙ্কুম ও প্রণব। অমনি তাহার মুখখানা অন্ধকার হইয়া গেল। কঙ্কুম বলিল :

কুঙ্কুম : আপনাকে দেখেই গাড়ী থেকে নেমে এলাম। কি ব্যাপার বলুন ত? ইন্দ্রাণী দেবী ত আপনার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছেন—লোকের পর লোক পাঠাচ্ছেন, অথচ আপনার দেখা নেই!

চন্দ্রনাথ : আমি তা শুনেছি। কিন্তু আমার শরীর মন দুটোই ভাল নয়; এক আত্মীয়ের কঠিন অসুখ—

প্রণব : আপনি ত কাশীর মানুষ, এখানে আবার আত্মীয় পেলেন কোথা থেকে?

চন্দ্রনাথ : ভগবানই জুটিয়ে দিয়েছেন।

এই সময় একখানি খালি রিক্সা দেখিতে পাইয়া চন্দ্রনাথ সেইদিকে মনোযোগ দিল, জোর গলায় ডাকিল : এই—রিক্সা! এখানে।

কিন্তু প্রণব তৎক্ষণাৎ হাত তুলিয়া রিক্সাওয়ালাকে নিবৃত্ত করিয়া সহানুভূতির স্বরে চন্দ্রনাথকে বলিল :

প্রণব : আমাদের গাড়ী দাঁড়িয়ে, আর আপনি যাবেন রিক্সায়—তা হবে না। উঠুন, আপনাকে পৌঁছে দেব।

চন্দ্রনাথ : না, না, আমি রিক্সাতেই যাব।

কিন্তু চন্দ্রনাথের মুখের আপত্তি ও দৈহিক বাধা উপেক্ষা করিয়া প্রকাশ্য দিবালোকেই শ্রদ্ধার অত্যাচার চালাইয়া তাহাকে এক রকম বলপ্রয়োগেই মোটরে তুলিয়া লইল প্রণব ও কুঙ্কুম। মোটরের গতির সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রনাথের আপত্তি—'ছাড়ুন, ছাড়ুন!' এবং প্রণব ও কুঙ্কুমের

সহাস্য অনুরোধ—'চলুন স্যার, চলুন!' ....উভয় পক্ষের মিলিত কণ্ঠধ্বনি বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া চলিল গতিশীল মোটরখানির পিছনে পিছনে।

* *

*

ইন্দ্রাণীর বৈঠকে আজ রবি-বাসরীয় অনুষ্ঠান। অনেকগুলি নূতন বন্ধু-বান্ধবী অনেক দিন পরে আজ সমবেত হইয়াছে। ইন্দ্রাণীর মনে শান্তি নাই। সেই অবধি চন্দ্রনাথও আর এ বাড়ীতে আসে না। তাহাকে আসিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে, কিন্তু সে আহ্বানে কোনরূপ সাড়াও দেয় নাই চন্দ্রনাথ। ইন্দ্রাণী বুঝিয়াছে, ইহার জন্য দায়ী সে নিজেই। কোন প্রমাণ না পাইয়া পাকে প্রকারে সে চন্দ্রনাথকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছে। অথচ এখন সে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, চন্দ্রনাথের অভাবেই আজ তাহার অন্তরের এই দৈন্য—সব থাকিতেও তাহার মত দুঃখিনী কেউ নেই। চন্দ্রনাথের প্রকৃতি ত তাহার অজ্ঞাত নয়; সে জানে, যদি অভিমান ভুলিয়া একবার নিজে তাহার বাসায় গিয়া দাঁড়ায়, তখনই চন্দ্রনাথের অভিমানও ভাঙিয়া যাইবে। অতঃপর একদিন আপন মনে ভাবের আবেগে ইন্দ্রাণী স্থির করিয়া ফেলে—সে যাইবে, নিশ্চয় যাইবে; তাহাকে আনিবে।

কিন্তু ইন্দ্রাণীর যাওয়া হইল না। সেই দিনই কুঙ্কুম আসিয়া এক সাংঘাতিক সংবাদ দিল তাহাকে। সে বলিল:

কুঙ্কুম: শুনেছেন ইন্দ্রাণীদেবী, রাগিণী দেবীর কুঞ্জে যে এখন চন্দ্রোদয় হচ্ছে।

ইন্দ্রাণী: দেখেছেন আপনি?

কুঙ্কুম: নিশ্চয়ই—প্রণবকেও দেখিয়েছি। রত্নেশ্বর রায়ের চৌরঙ্গী-

ভিলার সামনে—সকালে সন্ধ্যায় ওত পেতে একটু থাকলেই
আপনার মাষ্টারের দর্শন মিলবে।

যে অনল ধিকি ধিকি করিয়া ইন্দ্রাণীর অন্তরে জ্বলিতেছিল, নিজের চেষ্টাতেই ইন্দ্রাণী যাহা নিবাইবার জন্য শান্তির বাতাস দিতে উন্মুখ হইয়াছিল, কুঙ্কুমের কথায় সেই আগুণ সহসা লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথায় উঠিল। ইন্দ্রাণী বলিল: যদি প্রমাণ করতে পারেন কুঙ্কুম বাবু, তাহলে আপনাদের সকলের সামনে এমন শাস্তি তাকে দেব, যা কেউ কল্পনা করতে পারবে না।

এই ঘটনার পর কঙ্কুম প্রণবকে লইয়া রত্নেশ্বরের বাড়ির নিকট মোটরে টহল দিতে থাকে এবং তাহাদের এই প্রচেষ্টা কয়েকদিনের প্রতীক্ষার পর সহসা সার্থক হইয়া উঠে।

নিরানন্দ পুরীতে আনন্দের পুনারাবৃত্তির জন্য ইন্দ্রাণী এদিন তাহার পুরাতন বন্ধু বান্ধবীদের আহ্বান করিয়াছে রবি-বাসরীয় বৈঠকে। অনেকগুলি তরুণ তরুণীর সমাগম হইয়াছে; চা ও জলযোগ চলিয়াছে গানের সঙ্গে। তরুণ তরুণীরা সমবেত কণ্ঠে এমন এক খানি হাসির গান গাহিতেছিল, চা পান ও জলযোগ যাহার বিষয়বস্তুর অঙ্গ স্বরূপ। এই গানের মধ্যে ঝড়ের বেগে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার ভঙ্গিতে প্রবেশ করিল কুঙ্কুম। সকলেই গান ছাড়িয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল তাহার দিকে।

কুঙ্কুম বিশেষ একটি ভঙ্গির সঙ্গে বলিল:

কুঙ্কুম: গানের আসরেই গানের মাষ্টারের এখন বিচার হোক। রাগিণীর
কুঞ্জের দরজা থেকেই ধরে আনা হয়েছে তাঁকে। আসতে
কি চান—জোর করেই এনেছি। ঐ যে—

কুঙ্কুমের শেষ কথার সঙ্গেই প্রণব চন্দ্রনাথকে জোর করিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে কক্ষের মধ্যে আনিয়া সশব্দে উন্মুক্ত দরজাটি বন্ধ করিয়া দিল।

চন্দ্রনাথের বেশভূষা বিস্রস্ত, পাঞ্জাবীর হাতার দিকটা দুই দিকেই ছিঁড়িয়া গিয়াছে! বুঝা গেল যে, তাহাকে এখানে ধরিয়া আনিতে রীতিমত ধস্তাধস্তি করিতে হইয়াছে। চন্দ্রনাথ তখনও হাঁফাইতেছিল, সেই অবস্থায় বলিল:

চন্দ্রনাথ: এ কিন্তু ভদ্রতা নয়—অত্যাচার!

প্রণব: বেশ ত, বিচারকর্ত্রী সামনে—ভদ্রাভদ্রের বিচার উনিই করুন। যেমন কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসেছেন—অমনি গিয়ে হাতে নাতে গ্রেপ্তার!

কুঙ্কুম: এখন ভদ্রলোকের মতন কথাটা স্বীকার করুন।

ইন্দ্রাণী এই সময় সোফা হইতে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর লম্বা লম্বা করিয়া পা ফেলিয়া দর্পিত ভঙ্গিতে চন্দ্রনাথ ও কুঙ্কুমের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। কুঙ্কুমের কথাগুলি ইন্দ্রাণীর কাণে তখনও বাজিতেছিল; সেই কথা ধরিয়া কুঙ্কুমকে বলিল: 'করুন' বলছেন কাকে কুঙ্কুম বাবু? জানেন না—যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর? আমি বলছি—কুঙ্কুম বাবুর কথা মিথ্যা বলবার সাহস তোমার আছে? বলো....জবাব দাও। নৈলে চেন ত আমাকে....

চন্দ্রনাথ স্তব্ধ ভাবে ক্ষণকাল ইন্দ্রাণীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে বলিল:

চন্দ্রনাথ: এই ভাষায় তুমি আমার মুখের ওপরে জিজ্ঞাসা করতে পারলে—মুখে তোমার বাধল না ইন্দ্রা?

ইন্দ্রাণী: সাট আপ্, ইয়ু ব্রুট! ইন্দ্রা!...রাস্তার কুকুর প্রশ্রয় পেলে এমনি আস্পর্দ্ধা তার হয়, তার পর একদিন যে কে সেই নিচেয় নামে। আমি সব জানি। আমাকে দাবাবার জন্যে সেই গান খানা নিয়ে চালাকী খেলেছিলে আমার সঙ্গে....

তারপর চুপি চুপি টাকা খেয়ে রাগিণীকে শিখিয়েছ! আমার সব খবর তাকে তুমি জানিয়েছ। স্বার্থপর, বেইমান, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী ....

দীর্ঘ দেহটিকে টান করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে ইন্দ্রাণীর ক্রোধদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া চন্দ্রনাথ বলিল:

চন্দ্রনাথ: বাস্ · বাস্! তোমার বলা ত হয়েছে, না—আরো আছে?

তেমনই তর্জন করিয়া ইন্দ্রাণী বিকৃত কণ্ঠে বলিল:

ইন্দ্রাণী: এখনো বুজরুকী! ও সব নেকামী ঢের দেখেছি। এখন জবাব দাও আমার কথার—কত টাকা খেয়েছ ঐ মেড়ো মাগীটার কাছে? ডুবে ডুবে জল খাবার সব খবর আমি রাখি! বলো....জবাব দাও...

রূঢ় বাক্যাহত সৌম দেহটিকে আরো কঠিন ও ঋজু করিয়া দৃঢ়স্বরে চন্দ্রনাথ উত্তর করিল:

চন্দ্রনাথ: নিজের ইতর প্রবৃত্তি নিয়ে যা ইচ্ছা হয় তুমি কল্পনা করতে থাক—তাতে আমার কিছু আসে যাবে না। কিন্তু তোমার ও প্রশ্নের কোন জবাব আমি দেব না। আমার উচিত ছিল—সেই রাত্রেই শ্যামলীর চোখের আলোকে তোমাকে চিনে ফেলা। সে এক দণ্ডেই তোমাকে চিনেছিল, আমার চিনতে এক বছর লাগল। তোমাকে নমস্কার...

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া চন্দ্রনাথ সবেগে দরজার দিকে দ্রুতপদে যাইতেই ইন্দ্রাণী চীৎকার করিয়া ডাকিল:

ইন্দ্রাণী: দাঁড়াও—শাস্তি তোমার এখনো বাকি আছে। নীলু! আমার হাণ্টারটা নিয়ে আয় ত....

ব্যাপারটি চরমে উঠিতেছে দেখিয়া নীলুই বাহির হইতে এই সময়

দরজাটি ঠেলিয়া খুলিয়া ফেলিতেই চন্দ্রনাথ মুক্ত দ্বার-মুখে দাঁড়াইয়া সহসা মুখখানা ইন্দ্রাণীর দিকে ঘুরাইয়া বলিল :

চন্দ্রনাথ : এই ত নীলু এসেছে। শাস্তি দিতে যা বাকি রেখেছ দাও—আমি দাঁড়িয়ে আছি।

ইন্দ্রাণী ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে ঝড়ের বেগে দরজার কাছে গিয়া দুই হাতে চন্দ্রনাথকে সবেগে ঠেলিয়া দিয়া বলিল :

ইন্দ্রাণী : দূর হও এখান থেকে....

চন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গ তখন কাঁপিতেছিল; সেই প্রকম্পিত ও অসতর্ক দৈহিক অবস্থায় ইন্দ্রাণীর উভয় হস্তের ধাক্কায় পদস্খলিত হইয়া সে দরজার অপর দিকে চাতালের উপর পড়িয়া গেল—সেই সঙ্গে দ্বারপার্শ্বে সজ্জিত পিতলের বৃহৎ ভাসটিও স্থানচ্যুত হইয়া তাহার দেহের উপর সশব্দে গড়াইয়া পড়িতেই নীলু আর্তনাদ করিয়া উঠিল :

নীলু : কি করলে দিদিমণি! কি সর্বনাশ করলে! সাধু মানুষকে খুন করলে তুমি!

বলিতে বলিতে নীলু চন্দ্রনাথের মাথাটি তুলিয়া ধরিয়া নিজের জানুর উপরে রাখিয়া মাথার পিছন দিকের যে স্থানটি ভাসের আঘাতে থেঁতলাইয়া গিয়া রক্তপাত হইতেছিল—কাঁধের তোয়ালে দিয়া সেই ক্ষত স্থানের রক্ত মুছিতে লাগিল। ইন্দ্রাণীর ক্রোধ তখনও নিবৃত্ত হয় নাই, নীলুর কথা এবং এইরূপ সহানুভূতি তাহাকে আরও ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। উত্তেজিত কণ্ঠে তর্জনের সুরে সে বলিল :

ইন্দ্রাণী : উঠে আয় তুই! আয় বলছি—পাজী, জানোয়ার! নৈলে চাবুক মেরে বিদেয় করে দেব।

চোখের উপর গৃহাগত দেবতার এই নির্য্যাতন দেখিয়া গৃহ-ভৃত্যের অন্তরের দেবতাও তখন বুঝি বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, তাই দৃপ্ত কণ্ঠে

অজ্ঞাধীন ভৃত্য নীলু এই প্রগল্‌ভা প্রভুকন্যার নিষ্ঠুর আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া তেজোদৃপ্ত স্বরে বলিল :

নীলু : রইল তোমার চাকরী, আর আমার পাওনা গণ্ডার দাবী দিদিমণি! এনারে নিয়ে আমি চললাম বাসায় থুতে। আর আসবনি—তোমারে পেরণাম গো দিদিমণি!

ড্রয়িং রুমের দরজার মুখে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া এক ঘর লোক তখন অবাক বিস্ময়ে দেখিল যে, সেই প্রৌঢ় ভৃত্য নীলমণি যেন অসুরের মত অদম্য শক্তিতে দুই হাতে চন্দ্রনাথের রক্তাপ্লুত দেহটি তুলিয়া লইয়া ফটকের দিকে ছুটিয়াছে। উপর হইতে এই সময় ডাঃ ভাদুড়ী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে চীৎকার করিতেছিলেন : বেবি, বেবি! নীলু! বীরু!

* * *

ওদিকে রত্নেশ্বর পাঠাগারে অস্থির ভাবে পদচারণা করিতেছিলেন। চন্দ্রাবতী, শ্যামলী ও গীতা তিন জনেই এখানে উপস্থিত—প্রত্যেকের মুখগুলি উত্তেজনায় কঠিন।

চন্দ্রনাথের প্রস্থানের খানিক পরেই কক্ষান্তরে কাজ সারিয়া রত্নেশ্বর পাঠাগারে আসিয়া দেখিলেন, চন্দ্রনাথ চলিয়া গিয়াছে। চন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার কিছু পরামর্শ করিবার ছিল, আগন্তুকদের বিদায় দিয়া সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্রনাথ আজ যে এত তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবেন, তাহা জানিতেন না। শুনিলেন, চা ও জল-খাবার খাইয়া যান নাই—ভৃত্য সেগুলি আনিয়া তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। অগত্যা স্থির করিলেন, নিজেই চন্দ্রনাথের বাসায় গিয়া প্রস্তাবটি করিবেন। উঠি উঠি করিতেছেন, এমন সময় এই পল্লীরই তাঁহার এক স্নেহভাজন তরুণ দ্রুতবেগে আসিয়া যে দুঃসংবাদ দিয়া গেল, তাহা শুনিয়া

তিনিত স্তম্ভিত হইয়াছেনই এবং তৎক্ষণাৎ চন্দ্রাবতী, শ্যামলী ও গীতাকে ডাকাইয়া আনিয়া খবরটি তাহাদিগকেও শুনাইয়া উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছেন! রত্নেশ্বরের সেই স্নেহভাজন তরুণটি বহুদিন পরে আজ আহূত হইয়া ভাতুড়ী-ভিলায় ইন্দ্রাণীদেবীর মজলিসে গিয়াছিল। সেখানে চন্দ্রনাথকে লইয়া যে অত্যন্ত অপ্রীতিকর ব্যাপার সংঘটিত হয়, শেষ পর্যন্ত সে ছিল তাহার প্রত্যক্ষ্য-দর্শী সাক্ষী। শেষে সে-ই একখানা রিক্সা আনিয়া রিক্সাওয়ালা ও নীলুর সাহায্যে চন্দ্রনাথকে তাহাতে তুলিয়া দিয়া এখানে খবর দিতে আসিয়াছে। নীলু চন্দ্রনাথের বাসা জানে এবং ঠিক ভাবে তাহাকে লইয়া যাইবে জানিয়া সে আর সঙ্গে যায় নাই।

চন্দ্রাবতী, শ্যামলী ও গীতার সমক্ষে ঘটনাটি বিবৃত করিবার পর রত্নেশ্বর বলিলেন :

রত্নেশ্বর : একেই বলে দৈব! আমি কোথায় চন্দ্রনাথকে বুঝিয়ে ভাতুড়ীর ঐ বাসা ছেড়ে দিয়ে এ বাড়িতে আসবার জন্যে আজ অনুরোধ করব, তার আগেই সে চলে গেল, আমার ফেরার অপেক্ষা না করেই। ওদিকে, ওরাও বাইরে ওত পেতে ছিল ওকে ধরবার জন্যে!

চন্দ্রাবতী : কিন্তু কি রকম ভদ্রলোকের মেয়ে উনি? যে ডালে বসেছিলেন—সেই ডালই নিজের হাতে কাটতে হাত তুললেন কি করে?

গীতা : আমি বলি, পুলিসে খবর দিন মামা বাবু! শ্যামলী দি যে চুপ করে আছ—কিছু বলছ না?

শ্যামলী : আমার বলবার আর কিছু নেই! সেই যে কথায় বলে—অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি, আমারো হয়েছে তাই। বুদ্ধির

খেলা খেলতে গিয়ে নিজের জালেই নিজের ভালোকে জড়িয়ে ফেলেছি।

রত্নেশ্বর : তুমি যে-জাল ফেলেছিলে মা, সে ত গুড়িয়ে এনে কাজ গুছোবার সময় হয়েছিল। কিন্তু এমন যে উলটো উৎপত্তি হবে, কে জেনেছিল বল ?

এই সময় সোফায় আসিয়া জানাইল—সে গাড়ী বাহির করিয়াছে। শুনিয়াই শ্যামলী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল :

শ্যামলী : মামাবাবু, আমি যাবো—আমি নিজে গিয়ে ঐ ইন্দ্রাণীর সামনে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে এর বোঝাপড়া করব। আমি তাকে....

তৎক্ষণাৎ চৌকি হইতে উঠিয়া দ্রুতপদে উত্তেজিত শ্যামলীর কাছে আসিয়া তাহার মাথার উপর হাতখানি রাখিয়া রত্নেশ্বর সস্নেহে বলিলেন :

রত্নেশ্বর : ছি—মা! অধৈর্য্য হয়ো না; তুমি ত অবুঝ নও। এখন যদি জানাজানি হয়ে যায়, হয়ত অনিষ্টই হবে। জেনো যে, আমি একটা উদ্দেশ্য নিয়েই চলেছি। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক ; আর—ওঁর মা যাতে ঘুণাক্ষরেও এ সব কথা জানতে না পারেন—সেদিকে লক্ষ্য রাখ।

* *
*

চন্দ্রনাথের বাসার দরজার কাছে রিক্সাখানি আসিয়া এইমাত্র দাঁড়াইয়াছে। রিক্সার মধ্যে নীলুর কাঁধে মাথা রাখিয়া আচ্ছন্নের মত পড়িয়া আছে চন্দ্রনাথ—মাথায় নীলুরই তোয়ালেখানি বাঁধা, তার স্থানে স্থানে রক্ত মাখা। মঙ্গল ভিতরে কলতলায় ছিল ; নীলুর আহ্বান

শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। নিচে নামিয়া রিক্সার মধ্যে চন্দ্রনাথকে এই অবস্থায় দেখিয়া সে আর্তনাদ করিয়া উঠিল:

মঙ্গল: হে ভগবান! দাদাবাবুর এ কি দশা দেখালে!

মঙ্গলের আর্ত্তস্বর শুনিয়া চন্দ্রনাথ চক্ষু মেলিয়া চাহিল, তাহার পর হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া গাঢ় স্বরে বলিল:

চন্দ্রনাথ: দেখছ মঙ্গলদা···কেমন গুরু দক্ষিণা নিয়ে এসেছি!

রিক্সা হইতে নীলু বলিল: মঙ্গল ভাই, এসো, দুজনে ধরাধরি করে বাবুকে নামাই—ওপরে নিয়ে যেতে হবে ত···

চন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে বলিল: তোমারই জুড়ি মঙ্গলদা, আমার জন্যে দরদী হয়ে চাকরী ছেড়ে এসেছে····

এমন সময় রত্নেশ্বরের মোটর আসিয়া রিক্সার পিছনে থামিল। রত্নেশ্বর নিচে নামিয়া রিক্সার কাছে আসিয়া বলিলেন: আমি সব শুনেছি। ব্যবস্থা যা করবার আমি সব করছি।

সোফারের পাশে গুর্খা ভৃত্য বাহাদুর বসিয়াছিল। তাহাকে ডাকিয়া রত্নেশ্বর বলিলেন: শোন, এই বাড়ীতে চন্দ্রনাথবাবুর যে সব জিনিসপত্র আছে, ওঁর লোক এই মঙ্গল যা যা দেখিয়ে দেবে—একখানা গাড়ীতে তুলে আমার বাড়িতে নিয়ে যাবে। আর মঙ্গল, নীলু, তোমরা দুজনেই ওর সঙ্গে আসবে। এ বাড়ীতে তোমাদের বাবু বা তোমাদের কারুর থাকা হবে না—থাকার ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি।

রত্নেশ্বর বাবু রিক্সার ভাড়ার সহিত দুই টাকা বখশিস এবং অন্যান্য খরচ বাবদ কয়েকখানি নোট মহাবীরকে দিলেন। চন্দ্রনাথকে ধরাধরি করিয়া রত্নেশ্বরের মোটরে তোলা হইল। পথশ্রমে এবং এই তোলা-নামার ব্যাপারে মাথার পিছন দিকে যে স্থানটি থেঁতলাইয়া গিয়াছিল, সেখান হইতে পুনরায় রক্তস্রাব হইতে লাগিল তোয়ালে ভেদ করিয়া।

পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া রত্নেশ্বর তাহার উপরে চাপিয়া ধরিলেন।

পথে এক সময় চন্দ্রনাথ বলিল: আপনার সেই হোমে নিয়ে চলুন স্যার! এক ঘরে শ্যামলী, আর এক ঘরে আমি···বেশ হবে।

চন্দ্রনাথকে দেখিয়া এবং দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত শুনিয়া অবনী ডাক্তারকেও স্তম্ভিত হইতে হইল। তৎপরতার সঙ্গে স্বতন্ত্র ঘরে পরিচ্ছন্ন শয্যায় চন্দ্রনাথকে লইয়া গিয়া প্রাথমিক চিকিৎসা ও যথোপযুক্ত পরিচর্যার ব্যবস্থা চলিল। একজন অভিজ্ঞ নার্স তাহার সেবার ভার গ্রহণ করিল।

খানিক পরে ডাক্তারের চেম্বারে বসিয়া রত্নেশ্বর বলিতেছিলেন: দেখ ডাক্তার, ঈশ্বরের কি লীলা! একটা য়্যাকৃসিডেণ্ট ক্রিয়েট করে শ্যামলীর জন্যে যে ঘর ও শয্যার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেদিন, আজ সত্যকার য়্যাকৃসিডেণ্ট ঘটিয়ে সেই ঘর ও শয্যায় এলো আমাদের চন্দ্রনাথ!

* *
*

রত্নেশ্বর বাবুর ব্যবস্থায় আহত চন্দ্রনাথের চিকিৎসা চলিবার এবং তাহার জিনিসপত্র লইয়া বাড়ি ছাড়িয়া ভৃত্য মঙ্গলের উঠিয়া যাইবার কথা যথাসময় ইন্দ্রাণীর কর্ণগোচর হইয়াছে। এই সম্পর্কে সে ইহাও শুনিয়াছে যে, চন্দ্রনাথের বাসায় সে-রাত্রিতে নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইলে, সেখানে চন্দ্রনাথের বাড়ীর পরিচারিকা শ্যামলীর সহিত কলহ-সম্পর্কে তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া চন্দ্রনাথ সেই মেয়েটিকে বাড়ি হইতে বিদায় করিয়া দিবার পরেও—সে রাত্রিতে আরও এক উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেই শ্যামলীমেয়েটি ঐ পাড়াতেই মোটর চাপা পড়ে। ঘটনা-চক্রে সেই মোটরেই রাগীণী দেবীকে লইয়া রত্নেশ্বর বাড়ী ফিরিতেছিলেন। তিনি তাঁহারই এক পরিচিত চিকিৎসালয়ে শ্যামলীকে ভর্তি করিয়া দেন।

ধিকারের ঝোঁকে শ্যামলী নাকি চন্দ্রনাথ, ইন্দ্রাণী, শ্যামলী, কাশী, গান, বাসায় খাওয়াদাওয়া, ঝগড়া, তাড়িয়ে দেওয়া—এই সব কথা বলায়, রত্নেশ্বর বাবু চন্দ্রনাথকে খবর দেন। ইন্দ্রাণীকেও ডাকিবার ইচ্ছা ছিল তাঁহার, কিন্তু চন্দ্রনাথ নিজেই সমস্ত দায়িত্ব লওয়ায় তাহাকে আর এ ব্যাপারে জড়ানো হয় নাই। এই জন্যে চন্দ্রনাথ দুইবেলা রত্নেশ্বরবাবুর বাড়িতে শ্যামলীর খবর লইতে যাইত—রাগিণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎকার বা ঘনিষ্ঠতার কথা সর্বৈব মিথ্যা। স্বয়ং রত্নেশ্বর বাবু ইহার সাক্ষী। ইন্দ্রাণী আরও শুনিয়াছে, তাহাদের ড্রয়িং রুমের দ্বারদেশে চন্দ্রনাথের উপর যে নির্যাতন হইয়াছিল, তজ্জন্য থানা পুলিস করিবার জন্য কেহ কেহ ইচ্ছুক হইলেও, চন্দ্রনাথ শয্যাশায়ী অবস্থাতেই তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তাহাতে বাধা দিয়াছিল, নতুবা এতদিনে ইন্দ্রাণীদের বাড়িতে পুলিসের হাট বসিয়া যাইত।

যে সূত্রে ইন্দ্রাণী এই সকল সংবাদ পাইয়াছে, সেখানে অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। ইহার পর ইন্দ্রাণী বন্ধুদিগকে প্রশ্ন করিয়া জেরা করিয়া এমন কিছুই বাহির করিতে পারে নাই, যে জন্য চন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এত বড় গুরুতর অপরাধ চাপাইতে পারা যায়। এখন সে নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছে, সুধু গায়ের জ্বালায় এবং অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সে এত বড় একটা অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে। চন্দ্রনাথের সহিত যেদিন হইতে তাহার ছাড়াছাড়ি হইয়াছে, সেইদিন হইতে প্রতিদিনের হাসিখুশি আমোদ প্রমোদ সুখদুঃখ শান্তি অশান্তি—প্রত্যেকটির জমাখরচ করিয়া দেখিয়াছে, যে জমার ঘরে কিছুই পড়ে নাই—সে যেন দেউলিয়া হইতে বসিয়াছে। একটা মানুষের অভাবে এ কি বিপর্যয়! কিন্তু সেই মানুষকে সে চিনিতে পারে নাই কাছে থাকিতে! অমনি তাহার সমস্ত অন্তর হাহাকার করিয়া উঠে। ইদানীং সে ডাক্তার ভাদুড়ীকে—তাহার দরদী বন্ধুর মত

সাথী—বাপিকে সর্বদাই এড়াইয়া চলিতেছিল ; তিনিও অবস্থাটি উপলব্ধি করিয়া কন্যাকে পীড়াপীড়ি করেন নাই। তবে তিনি জানিতেন, চন্দ্রনাথ লোকটি সত্যকার খাঁটি মানুষ—ইন্দ্রাণী তাহার বিরুদ্ধে যে সকল দোষারোপ করিয়াছে, তাহা অমূলক—একদিন কন্যার ভুল ভাঙিবেই।

তাই যেদিন ইন্দ্রাণী বিনা আহ্বানে নিজেই ডাঃ ভাদুড়ীর কাছে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার বুকের মধ্যে মুখখানি চাপিয়া ভাবার্দ্র স্বরে বলিল : বাপি, আমি মস্ত ভুল করেছি—মাস্টার মশায়ের কোন দোষ নেই—আমি তাঁকে অকারণ অপমান করেছি। এখন তুমিই বল—আমি কি করি?

কন্যার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাঃ ভাদুড়ী বলিলেন : আমি জানতাম মা, একদিন তোমাকে এইভাবে ভেঙে পড়তেই হবে—তাই হলো। এখন শোনো, এই নিয়ে বেশি ভেব না, মনে মনে ঈশ্বরকে ডাক—এ ছাড়া উপায় নেই ; আমি এরই মধ্যে রত্নেশ্বর বাবুকে ডেকে একটা মীমাংসার চেষ্টা করব।

সেদিনের সেই দুর্বিনীতা মেয়েটি এদিন শান্ত সুবোধ অসহায়া বালিকার মত ম্লানমুখে সজল নয়নে পিতার মুখের পানে গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ডাঃ ভাদুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন : মাস্টার এখন আছে কেমন খবর পেয়েছ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ইন্দ্রাণী বলিল : সঠিক খবর ত আমাকে কেউ দেয় না বাপি, যারা আসে প্রত্যেকেই সুবিধাবাদী—তারা চায়, যাতে এ বাড়ীতে তাঁর আসার পথ বন্ধ হয়ে যায়। তবে আমি শুনেছি, এখনো তিনি নার্সিং হোমে আছেন, চিকিৎসা চলছে ; ভয় নেই।

ডাঃ ভাদুড়ী বলিলেন : আমি যে, থেকে নেই মা, নৈলে নিজেই এর বিহিত করতাম। এখন ভরসা—ভগবান!

আশ্চর্য, যে ভগবানের নামও কোনদিন ইন্দ্রাণীর মুখে শোনা যায় নাই, অন্যের মুখে শুনিলে মুখ টিপিয়া হাসিত, মনে মনে উপহাস করিত, এখন তাহাকেই করযোড়ে সেই অজ্ঞাত অপরিচিতের উদ্দেশে প্রার্থনা নিবেদন করিতে দেখা যায়—কি প্রার্থনা জানায়, সে নিজে এবং সেই দেবতা ভিন্ন অন্যে কি বুঝিবে?

* *

*

নার্শিংহোমে পক্ষাধিক কাল চন্দ্রনাথকে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছে। তাহার মাথার ঘা সেফটিক্ হইয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল। সুচিকিৎসা ও বিশেষ পরিচর্যার প্রভাবে সেই বিপত্তি হইতে সে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। রত্নেশ্বরের বাড়িতে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না; অন্ধ রামময়কে পরিবেষ্টন করিয়া এবং সন্তর্পণে মহামায়া দেবীর নিকট এতথ্য গোপন রাখিয়া, সকলে পরামর্শ করিতে বসেন। শ্যামলীর একান্ত ইচ্ছা, সে হোমে গিয়া চন্দরদার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সেবা করে। কিন্তু অবনী-ডাক্তারের তাহাতে ভীষণ আপত্তি; এমন কি, নার্স ছাড়া বাড়ির সম্পর্কে কাহাকেও সে নার্সিং হোমের ত্রিসীমায় যাইতে দিতেও সম্মত নয়—তাহাতে নাকি হিতে বিপরীত অবস্থা ঘটিবে। শ্যামলী কাতর কণ্ঠে বলে—'এ প্রকৃতির প্রতিশোধ—আমার কঠোর প্রায়শ্চিত্য।' রামময় আশ্বাস দিয়া বলেন—'তোমার আত্মসাধনা যখন তোমাকে শিক্ষার সিদ্ধি দিয়েছে, তোমার সেই নিষ্ঠাই তোমার গুরুকে রক্ষা করবে; আমি বলছি—শেষ পর্যন্ত তুমিই জয়ী হবে।' পরম গুরুর সেই কথা হইয়াছে সত্য—চন্দ্রনাথের বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, শীঘ্রই তাহাকে এবাড়ীতে আনা

হইবে, তজ্জন্য রত্নেশ্বরের ব্যবস্থায় গৃহসজ্জা চলিয়াছে; বাসা হইতে আনীত চন্দ্রনাথের সখের জিনিসপত্র সমস্তই সেই ঘরে রাখা হইয়াছে; গীতা ও শ্যামলীর উপর সাজাইবার ভার পড়িয়াছে।

ওদিকে চন্দ্রনাথের চিত্তোদ্বেগের কিছুই উপসম হয় নাই; এত বড় ব্যাধির যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও বিকারের ঝোঁকে বরাবর শ্যামলীকে খুঁজিয়াছে, শ্যামলীর উদ্দেশে কথা বলিয়াছে, সকাতরে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছে, তাহার পর সেই বিপদ কাটাইয়া আরোগ্যের পথে আসিয়াও 'শ্যামলী—শ্যামলী' করিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। কাহারও কথায় তাহার এখন প্রত্যয় নাই; স্বধুই শ্যামলীর খবর শুনিতে তাহার আর আগ্রহ নাই—তাহাকে চোখে দেখিতে চায়, সে জন্যে কি সাধাসাধি! শেষে অবনী ডাক্তার বুঝাইয়া বলিয়াছে—'তুমি সারলেও, তোমার সামনে আনবার মত অবস্থা এখনো শ্যামলীরই হয়নি। রত্নেশ্বর বাবুর বাড়ি গিয়ে তাকে দেখতে পাবে। আমি তোমার বন্ধু, মিথ্যা স্তোক দিচ্ছি না, ওখানে গেলেই—তার দেখা পাবে—আমি এ প্রতিশ্রুতি তোমাকে দিচ্ছি।'

এই কথার পর চন্দ্রনাথ আশ্বস্ত হইয়া তাহার যাইবার দিন মনে মনে গণনা করিতে থাকে। ইহারই মধ্যে একদিন সন্ধ্যার দিকে অপ্রত্যাশিত ও একান্ত অতর্কিত ভাবে আর এক অপ্রীতিকর কাণ্ড ঘটিয়া গেল। চন্দ্রনাথ তখন পথ্য পাইয়াছে এবং আর দুই দিন পরেই বাড়ি যাইবে—দিন স্থিরও হইয়া গিয়াছে। এমনই সময়—সেই সন্ধ্যায় এক সুবেশধারিণী তরুণী মোটর হইতে নামিয়া নার্শিংহোমের ফ্লাটে ঢুকিয়া সরাসরি একেবারে চন্দ্রনাথের কামরায় উপস্থিত হইল।

চন্দ্রনাথ তখন বিছানার কাছে জানালার নিকট একখানি আরাম কেদারায় অঙ্গ ঢালিয়া তাহার বাসায় অনুষ্ঠিত সেই রাত্রির অপ্রীতিকর ব্যাপারটিই আগাগোড়া ভাবিতেছিল। আগন্তুকার পদশব্দ তাহার

প্রতিস্পর্শ করিল না। গৃহে তখনও আলো জ্বলে নাই; কিন্তু বাহিরের আলো গবাক্ষ পথে চন্দ্রনাথের রোগ-পাণ্ডুর মুখে পড়ায় আগন্তুকা কিছু-ক্ষণ কক্ষের মাঝখানে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া গভীর দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর কি ভাবিয়া আস্তে আস্তে কেদারাখানির পিছনে গিয়া চন্দ্রনাথের মাথার দিকে ঝুঁকিয়া মাথার আহত স্থানটি লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল। চন্দ্রনাথের চিন্তা তখন সেইখানে আসিয়াছে—শ্যামলী যেখানে তাহার নিষ্ঠুর আদেশ শুনিয়া মুখখানি ম্লান করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। সেই নিদারুণ মানসিক অবস্থায় আকস্মিকভাবে এই স্পর্শানুভব করিয়া চন্দ্রনাথ চমকিত হইয়া মুখখানা কেদারার দিকে উঁচু করিয়া তুলিতেই ডাগর ডাগর দুইটি আর্ত চক্ষুর সহিত তাহার বিস্মিত দুই চক্ষুর সংযোগ হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎস্পর্শবৎ একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খাইয়া চন্দ্রনাথের কণ্ঠ পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল এবং সেই কম্পনের সঙ্গে একটা নাম নির্গত হইল—ইন্দ্রাণী?

বিজলীর বেগে ঘুরিয়া একেবারে সামনে আসিয়া ইন্দ্রাণী উত্তর করিল: ইন্দ্রাণী নয়—তোমার ইন্দ্রা; তোমার ছাত্রী, তোমার সেবিকা।···শাস্তি নিতে এসেছি, আমাকে শাস্তি দাও···চন্দ্র!

চন্দ্রনাথের বোধ হইতে লাগিল—পদতল হইতে একটা জ্বলন্ত বাষ্প তাহার সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়া মাথা পর্যন্ত ছাপিয়া উঠিতেছে; সে এখন কি করিবে—বসিয়া থাকিবে, না উঠিয়া পলাইবে, কিম্বা চীৎকার করিয়া কাহাকেও ডাকিবে নিষ্কৃতির জন্যে? কি যে করিবে তাহা যেন স্থির করিতে পারিতেছে না। শেষে বুঝি তাহার অজ্ঞাতেই কণ্ঠ দিয়া ভাঙা কাঁসর বাজার মত আর একটা নাম উপর্যুপরি দুইবার খসিয়া উঠিল—শ্যামলী···শ্যামলী···

বিকৃত হইলেও এত তীক্ষ্ণ এ স্বর যে, তাহার ধ্বনিতে সমগ্র ফ্লাটটি

যেন ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। অবনী ডাক্তারের চেম্বারে বসিয়া তখন রত্নেশ্বর বাবু চন্দ্রনাথ সম্বন্ধেই পরামর্শ করিতেছিলেন; কক্ষান্তরে নার্সগণ বৈকালী চা পান করিতেছিল, ভৃত্যগণ ঘরে ঘরে আলো জ্বালিতে ব্যস্ত; এক সঙ্গে সকলেই চন্দ্রনাথের কণ্ঠে সেই বিকৃত ধ্বনি শুনিয়া তাহার কক্ষের দিকে বিভিন্ন দিক দিয়া ছুটিল। তখনও ঘর অন্ধকার। সর্বাগ্রে গিয়া ডাক্তার সুইচ টিপিতেই দেখিলেন—শবের মত বিবর্ণমুখে চন্দ্রনাথ গবাক্ষেই চাহিয়া আছে, আর এক সুসজ্জিতা তরুণী জানু-পাতিয়া তাহার পদতলে প্রার্থনার ভঙ্গিতে উপবিষ্টা—দৃষ্টি তাহার চন্দ্রনাথের মুখের দিকে নিবদ্ধ। আলো জ্বলিতেই কম্পিতকণ্ঠে চন্দ্রনাথ চীৎকার করিয়া উঠিল: ডাক্তার, ডাক্তার! শ্যামলী কোথায়? তাকে ডাক, তাকে ডাক··· আমাকে রক্ষা করুক!

সম্মেলনের আসরে ডাক্তার ইন্দ্রাণীকে দেখিয়াছিল; সুতরাং চিনিতে বিলম্ব হইল না। ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ভৃত্য ও নার্সদের দিকে নিক্ষেপ করিয়া ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল: কার হুকুমে ইনি এ ঘরে এসেছেন?

রত্নেশ্বর অগ্রসর হইয়া বলিলেন: সে বিচার পরে হবে। এখন মিস্ ভাদুড়ী, যে পথে এখানে এসেছিলে, সেই পথেই এখনি বেরিয়ে যাও।

ইন্দ্রাণীও ইতিমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সময় রত্নেশ্বরের দিকে ফিরিয়া সে কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু দৃঢ়স্বরে রত্নেশ্বর বলিলেন: কোন কথা নয়—এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও।

চন্দ্রনাথের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে একটিবার চাহিয়াই পরক্ষণে দুই হাতে সমস্ত মুখখানা চাপিয়া ইন্দ্রাণী যেন নিজেকে লুকাইতে চাহিল। কয়েক পলকেও পরেই কি ভাবিয়া সেই মুখখানি করপুটের আবরণ মুক্ত করিয়া নীরবে টলিতে টলিতে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

* * *

রাস্তায় ফুটপাথের পার্শ্বেই ইন্দ্রাণীর মোটর লইয়া সোফার প্রতীক্ষা করিতেছিল। ইন্দ্রাণীকে দেখিয়াই সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিল। এই প্রগল্‌ভা প্রভুকন্যাটির সম্বন্ধে প্রত্যেক কর্মচারী ও অনুচর অনুচরীকে কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হয়; কারণ, ত্রুটি কিছু হইলে আর নিস্তার থাকে না। আজ ইন্দ্রাণীর অস্বাভাবিক গতি এবং মোটরের মধ্যে বসিবার ভঙ্গি এই সোফারটিকেও কৌতূহলী করিয়া তুলিল। মিস্ ভাদুড়ীর কোন অসুখবিসুখ হয় নাই ত? এ অবস্থায় নিজের স্থানে বসিবার পূর্বে মোটরের দরজা বন্ধ করিবার অছিলায় ইন্দ্রাণীর মুখের পানে চাহিয়াই সে চমকিত হইল। সেই অপূর্ব সুন্দর কমনীয় মুখের এ কি অদ্ভুত পরিবর্তন! দেহের সমস্ত রক্ত যেন মুখমণ্ডলে আসিয়া জমিয়াছে এবং তাহার চাপে শিরাগুলি এমনি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে যে, একটু ছিদ্র পাইলেই বুঝি সমস্ত রক্ত পিচকারী দিয়া সবেগে বাহির হইয়া পড়িবে! চোখ দুটির দৃষ্টিও এমনই বিশ্রী ও অস্বাভাবিক যে, কোন সুস্থা তরুণীর চোখে সে প্রকার অদ্ভুত দৃষ্টি কল্পনাও করা যায় না। হয়ত দুই সেকেণ্ড মাত্র বিলম্ব হইয়াছে—গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া তাহার আসনে গিয়া বসিতে। কিন্তু ইহাতেই ইন্দ্রাণী ধৈর্য হারাইয়া আরক্ত মুখখানাকে রাক্ষসীর মুখের মত বিকৃত ও বীভৎস করিয়া অস্বাভাবিক কণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিল: বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও...

সোফার তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে তাহার স্থানে বসিয়া মোটরে ষ্টার্ট দিল: জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইল না—কোথায় যাইবে। অগত্যা, আপন মনে বাড়ির দিকেই গাড়ী চালাইল। কিন্তু তাহার মনে ক্রমাগতই এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল—হয়ত একটু বিলম্ব সে করিয়াছে, সেজন্য অন্য কোন কথায় ধমক না দিয়া উত্তেজিতভাবে বারবার 'বেরিয়ে যাও' বলিলেন কেন মিস্ ভাদুড়ী? মোটর চালাইতে চালাইতে সন্তর্পণে ভিতরের দিকে

বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মনের সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিল। ইন্দ্রাণী তেমনই অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে তর্জনী তুলিয়া আপন মনে বিড় বিড় করিয়া কি সব কথা বলিতেছে··· তাহার মধ্যেও 'বেরিয়ে যাও' কথা দুইটি সুস্পষ্টভাবেই শুনা যাইতেছে। তবে কি মিস্ ভাদুড়ী কাহারও সহিত ঝগড়া করিয়া আসিয়াছেন ঐ বাড়ি হইতে? সারা পথ এই ভাবেই ইন্দ্রাণীকে গাড়ীর মধ্যে সে দেখিল। বাড়ির ফটক দিয়া ভিতরে গাড়ী প্রবেশ করিয়া গাড়ী বারাণ্ডার নিচে থামিতেই ইন্দ্রাণী সলম্ফে নামিয়া হরিণীর মত বিচিত্র গতিতে ড্রয়িং রুম লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

* *

*

ডাঃ ভাদুড়ীর নির্দেশেই ইন্দ্রাণীর মনের প্রফুল্লতার জন্য এদিন সন্ধ্যার পর সঙ্গীতের বিশেষ এক আসরের ব্যবস্থা হইয়াছে। নিত্যকার বন্ধু-বান্ধবীরা ছাড়াও অতিরিক্ত কয়েকজন ইতিমধ্যেই আসিয়া আসর জমকাইয়া বসিয়াছেন। সন্ধ্যার খানিকটা আগেই ইন্দ্রাণী কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাই মোটরে বাহির হইয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, কোনও প্রকারে সাধ্য সাধনা করিয়া নার্শিং হোম হইতে চন্দ্রনাথকে এই আসরে আনিয়া সকলকে, এমন কি—বাপিকে পর্যন্ত অবাক করিয়া দিবে। বিশস্ত সূত্রেই সে সংবাদ পাইয়াছিল যে,—চন্দ্রনাথ বেশ সুস্থ হইয়াছেন, এবং দুই এক দিনের মধ্যেই নার্সিং হোম হইতে রত্নেশ্বরবাবুর বাড়িতে যাইবেন। এই আত্মভোলা ভদ্র মানুষটির প্রতি তাহার পূর্বের দুর্বার প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়া সে সঙ্কল্প করে—চন্দ্রনাথের সহিত বোঝাপড়া করিয়া আজই তাহাকে আয়ত্তে আনিয়া ফেলিবে। কিন্তু সেই দৃঢ় সঙ্কল্প অপ্রত্যাশিতভাবে বিপর্যস্ত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার

ইন্দ্রিয়গুলিও প্রচণ্ড চোট খাইয়া নিদারুণ হইয়া উঠে। দুর্বার ক্ষুধা যেমন ইন্ধন না পাইলে আধারস্বরূপ দেহকেই জীর্ণ করিয়া ফেলে, মানুষের অন্তরের দুরন্ত রিপুগুলিও অভাবনীয়ভাবে নির্যাতিত হইলে নগ্নরূপে বীভৎস হইয়া মানুষের সৎপ্রবৃত্তিগুলিকেও বিকৃত করিয়া তোলে। ঠিক এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে—ধনীর দুলালী অপ্রতিহত প্রতিপত্তিশালিনী সুবিধাবাদিনী তরুণী ইন্দ্রাণী ভাদুড়ী।

ড্রয়িং রুমে সঙ্গীতের মজলিস তখনও জমিয়া উঠে নাই মজলিসের অধিরাণী ইন্দ্রাণীর অভাবে। এ অবস্থায় যেমন হইয়া থাকে—কোথায়ও চাপা কণ্ঠের আলাপ, কোথায়ও বা মৃদুস্বরে গানের গুঞ্জণ, কেহ কেহ বা যন্ত্রের তারে মোচড় দিয়া ঘরখানিকে সরগরম করিয়া তুলিতেছেন…এমন সময় বিশ্রস্তভাবে চঞ্চল ভঙ্গিতে কক্ষ মধ্যে ইন্দ্রাণী প্রবেশ করিল। অমনি সকলেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; কিন্তু মনের উল্লাস মুখেও প্রকাশ করিতে উৎসাহী হইল প্রণব ও কুঙ্কুম—ইন্দ্রাণীর দুই অন্তরঙ্গ পুরুষ বন্ধু। চন্দ্রনাথের অনুপস্থিতির সুযোগে ইহারা দুইজনেই ইদানীং ইন্দ্রাণীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও চলিয়াছে ঘনিষ্ঠতম হইবার আশায়। প্রণব ছুটিয়া গিয়া বিশেষ ভঙ্গিতে ইন্দ্রাণীর উদ্দেশে স্তুতিবাদ করিল:

প্রণব: ওঁ আয়াহি বরদে দেবী….

কুঙ্কুম একটি বীণাযন্ত্রে সুর দিবার চেষ্টা করিতেছিল। তৎক্ষণাৎ সবেগে উঠিয়া বাদ্যযন্ত্রহস্তেই প্রণবের পার্শ্বে গিয়া অপরূপ ভঙ্গিতে স্তোত্রের পরবর্তী কথাগুলি বিকৃত করিয়া বলিল:

কুঙ্কুম: ত্র্যক্ষরে 'বীণাবাদিনী'…

হাতে বীণা থাকায় কথার সঙ্গেই বীণাটি ইন্দ্রাণীর হাতে সমর্পণ করিল কুঙ্কুম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কেহই নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করে নাই—

তাহাদের দেবীটি কি মূর্তিতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! সে ভুল ভাঙ্গিল—দেবী যখন দানবীর মত ভীষণা হইয়া স্তুতিবাদের আঙ্গিক প্রতিবাদ করিল। বীণাযন্ত্র হাতে পাইবামাত্র সেটি দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া সে যুগপৎ কুঙ্কুম ও প্রণবের মাথায় স্কন্ধে হাতে পৃষ্ঠে উপর্য্যুপরি আঘাত করিতে লাগিল। প্রথমে মনে হইয়াছিল, রঙ্গপ্রিয়া ইন্দ্রাণী বুঝি রঙ্গের উত্তরে রঙ্গলীলাই করিতেছে। কিন্তু কুঙ্কুম ও প্রণবের আর্তনাদের সঙ্গে রক্তপাত সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিল সকলের। চারিদিক দিয়া নানা কণ্ঠে বিস্মিত প্রশ্ন উঠিল: এ কি কাণ্ড · করছেন কি মিস্ ভাদুড়ী ·· ইন্দ্রা—ইন্দ্রা এ কি···

কিন্তু ইন্দ্রাণীর তখন ভ্রূক্ষেপ নাই কাহারও কথায়, কোনদিকে—সকলেই যেন তাহার কাছে আজ অপরিচিত। কুঙ্কুম ও প্রণব ভীষণ প্রহার খাইয়া রক্তাক্ত দেহে সভয়ে তাহার নাগালের বাহিরে পলাইয়া গেল; ইন্দ্রাণীও ভাঙ্গা বীণাটি মেঝের উপর আছাড় দিয়া ঘরে সাজানো অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রগুলি লইয়া পড়িল। এক একটি যন্ত্র তুলিয়াই আছাড় দিতে লাগিল—দামী দামী দুর্লভ যন্ত্রগুলির দুর্দশা দেখিয়া এবং এই আকস্মিক ধ্বংসাত্মক ব্যাপারটির রহস্য না বুঝিয়া—প্রিয়বান্ধবী নীলিমা ইন্দ্রাণীকে সামলাইতে ছুটিয়া গেল। একটা যন্ত্র লইবার জন্য ইন্দ্রাণী তখন হাত তুলিয়াছে, এমন সময় নীলিমা কাছে গিয়া সেই উদ্যত হাতখানি ধরিয়া মিনতির স্বরে বলিল: থাম্ ইন্দ্রা থাম, হয়েছে কি? কার ওপরে রাগ করে তুই····

কিন্তু আর তাহাকে বলিতে হইল না; এক ঝট্‌কায় ইন্দ্রাণীর হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া ঝটিতি দুই পাশ দিয়া দুই হাতের বেষ্টনী দিয়া নীলিমার গলাটি এমন প্রচণ্ড জোরে চাপিয়া ধরিল যে, তাহার মুখ দিয়া কথা ত বাহির হইলই না—চোখ দুটিও যেন ঠিকরাইয়া বাহির

হইবার মত হইল। দেখিতে দেখিতে নীলিমার মুখখানা ক্রমশঃ ছায়ের মত বিবর্ণ হইতে লাগিল, আর ইন্দ্রাণীর মুখখানা ফুলিয়া ভীষণতম হইয়া উঠিল। আর্তকণ্ঠে বন্ধুবান্ধবীরা কোলাহল তুলিল : খুন হলো, খুন হলো—মরে গেল!

গণ্ডগোল শুনিয়া ইতিমধ্যেই আফিসের কর্মচারিগণ, চাপরাশি, চাকর-বাকর, দারোয়ান, সোফার, মালি প্রভৃতি অনুচরবর্গ ছুটিয়া আসিয়াছে। উপরে ডাঃ ভাদুড়ীও কন্যার কাণ্ডের কথা শুনিয়া তাঁহার চক্রময় চলন্ত কেদারা-সহ তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া নিচে নামাইয়া লইয়া যাইবার জন্য উপরের ভৃত্যাদিগকে বাধ্য করিয়াছেন। ফলে, সিঁড়ির মুখে কেদারা আসিতেই কন্যার হাতে নীলিমার শোচনীয় অবস্থা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল এবং কেদারারূঢ় অবস্থায় তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন : বেবি! বেবি! ছেড়ে দাও ওকে—ছেড়ে দাও, মরে যাবে....

কিন্তু পিতার কণ্ঠস্বর বেবির কর্ণ স্পর্শ করিবামাত্র তাহার মুখ ও চক্ষুর ভঙ্গি আরও উগ্রতর হইল; সেই সঙ্গে নীলিমার কণ্ঠে আরও প্রবলতর চাপ দিয়া বিকৃত মুখে বেবি হুঙ্কার দিয়া বলিল : আমি রাক্ষসী....রাক্ষসী...বেরিয়ে যাও....বেরিয়ে যাও....

সুন্দরী নারীর মুখের ভঙ্গি যে এমন বিশ্রী হইয়া উঠে এবং সেই মুখ দিয়া যে এমন ভীষণ হুঙ্কার নির্গত হইতে পারে, কাহারও বুঝি তাহা ধারণাও ছিল না। ডাঃ ভাদুড়ী তখনও ত্রিশঙ্কুর মত সিঁড়ির মাথায় ভৃত্যদের হস্তে ধৃত কেদারা-বক্ষে অর্ধশায়িত! সেই অবস্থায়, সেইখান হইতেই তিনি তাঁহার চরম আজ্ঞা দিলেন : দেখছ কি, বেবি পাগল হয়েছে—ওর জ্ঞান নেই, এখন ও রাক্ষসী! কিন্তু তোমরা কী? মানুষ না জানোয়ার? এত গুলো লোকের সামনে ঐ মেয়েটা খুন হবে? ছাড়িয়ে নাও—জোর করে ছাড়িয়ে নাও।

গৃহস্বামীর এই কঠোর আদেশ এতক্ষণে সকলকেই সক্রিয় ও সচেতন করিয়া তুলিল এবং এক সঙ্গে অনেকগুলি হস্তের প্রয়োগকৌশলে অতিকষ্টে নীলিমাকে ইন্দ্রাণীর উভয় হাতের সাঁড়াশীর মত সুদৃঢ় বেষ্টনী হইতে মুক্ত করা সম্ভব হইল। কিন্তু এই ব্যাপারে ইন্দ্রাণী আরও ভয়ঙ্করী হইয়া যে কাণ্ড আরম্ভ করিল, স্বাভাবিক মস্তিষ্কে কোন ভদ্র নারীর পক্ষে কোনক্রমেই যাহা সম্ভবপর নয়।

নীলিমাকে কবলমুক্ত করিবামাত্র ইন্দ্রাণী হাতের কাছে যে কোন দ্রব্য পাইল, তাহাই তুলিয়া এলোপাথাড়ি ভাবে সেই বিশাল কক্ষে সমবেত সকলকেই আক্রমণ করিল। মাথায় চোট খাইয়া কেহ বসিয়া পড়িল, কাহারও হাত ভাঙিল, টাঙানো ঝাড়ের ডাল, দেয়ালগিরি ভাঙিয়া পড়িল এবং সেই সঙ্গে সিঁড়ির দিকে সবেগে নিক্ষিপ্ত একটি বৃহৎ ফুলদানী কেদারা-বাহকদের একজনের মাথায় লাগিতেই কেদারার হাতল ছাড়িয়া দিয়া সে ব্যক্তি সিঁড়িতে পড়িয়া গেল। পরক্ষণে আরও দুইটি সৌখীন বস্তু ঐভাবে নিক্ষিপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ অপর একজন বাহক এবং ডাঃ ভাদুড়ীর উপরে পড়িল— ফলে, তৎক্ষণাৎ কেদারাটি অসহায় ভাদুড়ীকে লইয়া দোতলার সেই দীর্ঘ সোপানশ্রেণী হইতে গড়াইতে গড়াইতে ড্রয়িং রুমে আসিয়া পড়িল। একটা ঘর্ঘর শব্দের সঙ্গে এতগুলি নরনারীর ভীতকণ্ঠের ধ্বনি মিশিয়া সমস্ত বাড়ীখানা কাঁপাইয়া তুলিল! সেই সাংঘাতিক অবস্থায়ও আর্ত-কণ্ঠে ডাঃ ভাদুড়ী ঘন ঘন হাঁকিতে লাগিলেন: ওকে ধরে পাশের ঘরে পূরে ফেল—পাশের ঘরে···

তখন রীতিমত সংগ্রাম করিয়া সেই দুর্বিনীতা প্রচণ্ডা উন্মাদিনীকে বহুকষ্টে পাশের ক্ষুদ্র কক্ষে পুরিয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তখনও তাহার বিক্রম কমে নাই—নিরস্ত হইবার কোন

লক্ষণই নাই ; রুদ্ধ ঘরের ভিতর হইতে সে দ্বারে ঘন ঘন পদাঘাত করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে ক্রুদ্ধ কণ্ঠের অবিরাম চীৎকার : বেরিয়ে যা....বেরিয়ে যা....দূর—দূর—মার মার মার।" খানিক পরেই দরজার কাচ ভাঙিয়া পড়িল ভিতর হইতে। তখন সেই ছিদ্রপথে দেখা গেল—পায়ের গহনা, জামা, পরনের সাড়ি' জোর করিয়া টানিয়া টানিয়া খুলিয়া ফেলিতেছে উন্মাদিনী—সেই ঘরের মধ্যে চীৎকার তুলিয়া দাপাদাপি করিতে করিতে।

ভিতরের লোকজন তখন মুমূর্ষুপ্রায় ডাঃ ভাদুড়ী, নীলিমা ও অন্যান্য আহতদের পরিচর্যায় ব্যস্ত। ডাক্তারকে ফোন করা হইয়াছে। ইন্দ্রাণীর শেষের পাগলামীর কথা ডাঃ ভাদুড়ীকে বলিতেই তিনি ভগ্নস্বরে বলিলেন : ওর লজ্জা নেই........তোমরা ত নির্লজ্জ নও .....আলো নিভিয়ে দাও ; আমাদের ওপরে নিয়ে চলো।

ইন্দ্রাণী তখন ব্লাউসটা ছিঁড়িবার জন্য সবেগে টানাটানি করিতেছে... এমন সময় আলো নিবিয়া গেল—ঘরখানি অন্ধকারে নিমগ্ন হইল।

* *

*

শ্যামলী তাহার ঘরে বসিয়া আবার সেদিনের মত রাগিণী দেবীর রূপসজ্জায় সাজিতেছিল। এই সময় গীতা আসিয়া সহাস্যে বলিল : সেদিন সাজন গোজন সার হয়েছিল বলে দুঃখ করেছিলে,—আজ কিন্তু সজ্জা সার্থক হবে। তবে, শেষরক্ষা যে কি করে করবে ভাই, সেইটিই ভেবে পাচ্ছি নে। তুমি কিছু ভেবেছ ?

কর্ণ-সজ্জা করিতে করিতে শ্যামলী বলিল : আমার সেই এক চিন্তা— ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

গীতা : কিন্তু এবাড়িতে এসে অবধি ত তোমার মানস-গুরু কেবলি

'শ্যামলী শ্যামলী' করেই পাগল; তবুও কি রাগিণীর খোলস পরবার প্রয়োজন আছে?

শ্যামলী: সব জেনেও তুই যে নেকা হচ্ছিস গীতা! এই খোলস পরেই আমাকে শেষের পরীক্ষা নিতে হবে, তা জানিস?

গীতা: তাহলে আগের পরীক্ষায় গুরু জিতেছেন বল?

শ্যামলী: এখনো বলতে হবে রে! জানিস্, ভাবতে বসলে আমি চোখের জল রাখতে পারি না। এই পরীক্ষা করতে গিয়েই ত হারাতে বসেছিলাম! অথচ এমনি অবস্থায় এসেছি—কি করে যে শেষ রক্ষা হবে ভেবে পাচ্ছি নে। তাই না চিন্তামণির শরণ নিয়েছি।

* *

*

শ্যামলী যখন রাগিণীর রূপসজ্জায় ব্যস্ত, চন্দ্রনাথ তখন তাহার জন্য নির্বাচিত সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া রত্নেশ্বর ও অবনী ডাক্তারের সহিত আলাপ করিতেছিল। আরোগ্যলাভ করিয়া আজই চন্দ্রনাথ এবাড়িতে আসিয়াছে; সুস্থ হইয়া উঠিলেও দুর্বলতা এখনও রহিয়াছে। এখানে আসিয়া গৃহসজ্জা ও আদর আপ্যায়নের ঘটা দেখিয়া চন্দ্রনাথ প্রথমে দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে; কিন্তু রত্নেশ্বর তাহাকে বুঝাইয়াছেন:

রত্নেশ্বর: জানেন ত আপনি চন্দ্রনাথ বাবু, আমার সংসার বলতে কিছু নেই, আপনাদের মত কলাবিদ্‌দের নিয়েই আমার দিন কাটে। আপনাদের আপদে বিপদে অসময়ে যদি না দেখলাম, তাহলে অর্থের কি সার্থকতা বলুন? তারপর, রাগিণী দেবী এতদিন কলকাতায় ছিলেন, আজ তিনি চলে যাচ্ছেন। এখানে যেজন্যে বিষম ভাবনা তাঁর ছিল, সেই শ্যামলীরও

বিপদ কেটে গেছে। তার পর আপনিও অত বড় দুর্ঘটনা থেকে ভালয় ভালয় সেরে স্থরে উঠে এখানে এসেছেন। এই সব উপলক্ষে আজ একটা প্রীতিভোজের আয়োজন করা গেছে। আপনি এর জন্যে কিছুমাত্র লজ্জিত হবেন না, বা মনে কোন সঙ্কোচ করবেন না; ভাববেন, আপনার নিজের বাড়ি।

চন্দ্রনাথ তাহার স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের ভঙ্গিতে ইহার উত্তর করিল:

চন্দ্রনাথ: আপনি যা করেছেন, যে ঋণে জড়িয়েছেন আমাকে, এ জীবনে তা থেকে অব্যাহতি আমার নেই। তবে আমি অকৃতজ্ঞ নই—আপনার এই মহত্ব আমার চিরজীবনের ধ্যানের বস্তু হয়ে থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা—আমি সব চেয়ে বেশি ঋণী আর কৃতজ্ঞ শ্যামলীর জন্যে। আপনি যদি তাঁকে না বাঁচাতেন রত্নেশ্বরবাবু, তাহলে আমার সারা জীবন অনু-শোচনাতেই কাটত।

রত্নেশ্বর: তা যদি বলেন, এর মূলেও রাগিণী দেবী। ওঁর জন্যেই বিপত্তি, আবার ওঁর জন্যেই নিবৃত্তি। ঐ যে চেহারার দিক দিয়ে মিল থাকায় মায়া পড়ে যায় ওর ওপরে। সেই জন্যে ত, আপনার শ্যামলী সেরে না ওঠা পর্যন্ত উনি নিজের যাওয়া বন্ধ রাখেন। আজ নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন।

অবনী: রাগিণী দেবীর সঙ্গে তোমার ত এ পর্যন্ত আলাপই হয় নি, সেটা এখনই সেরে নিলে হয় না? তোমার নাকি গান সম্বন্ধে ওঁকে কিছু জিজ্ঞাস্যও ছিল ......

চন্দ্রনাথ: এখন আর সে আগ্রহ নেই অবনী! আগেই ত বলেছি—রাগিণী ইন্দ্রাণী সব লুপ্ত হয়ে শ্যামলীই এখন আমার মনটাকে

ব্যাপ্ত করে রেখেছে। এখন তাকেই দয়া করে আনাও ভাই, তোমার সেই প্রতিশ্রুতি যেন ভুলে যেও না।

অবনী : শ্যামলীর কথা আমি ভুলিনি ; তিনিও এখানে এসেছেন এবং তোমার সঙ্গে দেখা করতে তাঁরও আগ্রহ কম নয় জেনো। কিন্তু শিষ্টাচারের অনুরোধে রাগিণী দেবীর সঙ্গেও তোমার আলাপ করা উচিত এবং সেটাই আগে সেরে ফেলা চাই।

রত্নেশ্বর : মুস্কিল হয়েছে, আমি তাঁকে বলে রেখেছি কিনা—ঐ গান সম্বন্ধে আপনার জিজ্ঞাসা করবার কথাটা! আর, আমার অনুরোধেই তিনি রাজি হয়েছেন ; নতুবা, বাইরের কারুর সঙ্গেই তিনি বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ করেন না, আর আপনিও তা জানেন। যদি বলেন, তাহলে তাঁকে নিয়ে আসি এখানে।

চন্দ্রনাথ : আপনি যখন বলছেন, এর ওপর আর কথা নেই।

রত্নেশ্বর : বাঁচা গেল, আপনি আমার মুখ রক্ষা করলেন। আমি তাহলে তাঁকে নিয়ে আসি।

রত্নেশ্বর পরদা ঠেলিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। পার্শ্বের ঘরেও আলাদা এক বৈঠক বসিয়াছে। সেখানে রামময়, চন্দ্রাবতী, গীতা এবং রাগিণীর সজ্জায় শ্যামলী—এক একখানি সোফায় উপবিষ্ট হইয়া বাহিরের কথাগুলি সব শুনিতেছিলেন। এই ঘর হইতে বাহিরের ঘরের সবই দেখা যায়, কথাও কর্ণগোচর হয়।

মহামায়া দেবীকে এতদিন অন্ধকারে রাখা হইয়াছিল, আজ সকালে চন্দ্রাবতী তাঁহাকে চন্দ্রনাথ, শ্যামলী ও ইন্দ্রাণী সম্পর্কে সমস্ত কথাই বলিয়াছেন, মঙ্গলও এতদিন অন্তরালে ছিল অতি সন্তর্পণে ; আজ সেও যথাসময় আসিয়া গিন্নীমার চরণ বন্দনা করিয়াছে। তাহার পর চন্দ্রনাথকে

ও-ঘরে আনিয়া বসাইবামাত্র এই ঘর হইত তিনি পুত্রকে নীরবে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া অলক্ষ্যে আশীর্বাদও করিয়াছেন। কথা আছে, শ্যামলীর আত্মপ্রকাশ করিবার সময় চন্দ্রাবতী তাঁহাকেও ও-ঘরে লইয়া গিয়া সকল সমস্যা ও সংশয় ভঞ্জন করিয়া দিবেন।

রত্নেশ্বর এই ঘরের মধ্যে আসিয়া শ্যামলীর দিকে চাহিয়া কহিলেন:

রত্নেশ্বর: শুনলে ত, শ্যামলীই এখন ওঁর অন্তর-আকাশ জুড়ে আছে! অনেক সুপারিশের পর রাগিণী দেবীর আর্জী মঞ্জুর হয়েছে। এখন এসো।

শ্যামলী নীরবে রত্নেশ্বরের অনুসরণ করিল।

* *

*

বাহিরের ঘরে অবনী চন্দ্রনাথকে বলিতেছিল:

অবনী: আমি বলি কি, কোন ভূমিকা না করে একবারে গানের কথাই তুলো, আর হিন্দীতেই তোমার প্রশ্ন ক'রো।

চন্দ্রনাথ: তাই হবে।

রত্নেশ্বরের সঙ্গে রাগিণী একটু সঙ্কুচিত ভাবেই কক্ষে প্রবেশ করিল এবং গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া চন্দ্রনাথ ও অবনীকে নমস্কার জানাইতেই তাহারাও সসম্ভ্রমে প্রতি নমস্কার করিল। রত্নেশ্বর তাহাকে চন্দ্রনাথের সামনাসামনি একখানি সোফায় সম্বর্দ্ধনা করিয়া বসাইলেন।

সঙ্গীত সম্মেলনে তৃতীয় দিনের বৈঠকে যেরূপ সাজ-সজ্জা ও গাম্ভীর্যময়ী মূর্তিতে এই সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞীকে দেখা গিয়াছিল, এদিনও এখানে পশ্চিম-প্রদেশ-প্রচলিত সেইরূপ রূপসজ্জায় সেই প্রতিভাময়ী নারীকে চন্দ্রনাথ দেখিল।

একটিবার তাহার দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া

অত্যন্ত সহজ হিন্দীতে চন্দ্রনাথ প্রথমে গানের কথা জিজ্ঞাসা করিল এবং শ্যামলীও তাহার যথাযথ উত্তর দিল :

চন্দ্রনাথ : ইয়ে গানা আপকো কাঁহাসে মিলা ?

শ্যামলী : আপ কোন্ সে গানেকী বাৎ কর রহে হ্যায় ?

চন্দ্রনাথ : ওয়হী, যো আপনে উস দিন গায়াথা, অউর কহাথা কি—ওয়হ গানা আপকে গুরুজী কা হ্যায়। আচ্ছা, আপকে গুরুজীকা নাম কেয়া হ্যায় ?

শ্যামলী : শ্রী দ্রোণাচার্য। (করযোড়ে উদ্দেশে প্রণাম করিল)

চন্দ্রনাথ : দ্রোণাচার্য ! বড়ো তাজ্জব কী বাত হ্যায়....আচ্ছা, আপনে যো আখ্‌রী গানা গায়া, ও আপনে কাঁহাসে শিখা ?

শ্যামলী : ও। ও তো মেরে গুরুজীকো গুরুকা গানা থা।

বলিয়াই শ্যামলী পুনরায় পূর্ববৎ করযোড়ে উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। নীরবেই চন্দ্রনাথ দেখিল। ইহার পর সে আর কি প্রশ্ন করিবে ? যাহা জিজ্ঞাস্য ছিল, রাগিণী দেবী ত স্পষ্ট কথায় তাহার উত্তর করিয়াছেন। যেমন ক্ষুদ্র তাহার প্রশ্ন, উওরও তেমনি সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্ট। আধুনিক গানখানির সম্পর্কে রাগিণী দেবী তাঁহার গুরুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন, সে গুরু হইতেছেন—দ্রোণাচার্য। অমনি ঝাঁ করিয়া চন্দ্রনাথের মনে পড়িয়া গেল—একলব্য ও দ্রোণাচার্যের উপাখ্যানকে অবলম্বন করিয়া রাগিণী-দেবীর গীতাত্মক অভিনয়। তবে কি ঐ আখ্যায়িকা রূপক, রাগিণীদেবীর আত্মজীবনের সহিত ইহার কোন গূঢ় সম্বন্ধ আছে ? ‥ তাহার পর··· শেষের সেই নিষিদ্ধ গানখানির ব্যাপারেও তিনি তাঁহার গুরুর উল্লেখ করেন নাই ; বলিয়াছেন—গুরুর গুরু অর্থাৎ পরম গুরুই তাঁহাকে ঐ গান শিখাইয়াছেন। কিন্তু সে-গুরুর নাম রাগিণীদেবী বলেন নাই, হয়ত নাম বলিবার ইচ্ছা নাই। একবার মনে হইল, সেই পরম গুরুর নামটি

জিজ্ঞাসা করে ; কিন্তু নিজেই সবলে সে ইচ্ছা দমন করিয়া এ ব্যাপারের যবনিকা এই খানেই ফেলিতে চাহিল চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথকে নীরব ও চিন্তামগ্ন দেখিয়া রত্নেশ্বর তাহার কানের কাছে মুখখানা রাখিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন :

রত্নেশ্বর : আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন ? কোন সংশয় যদি থাকে····

চন্দ্রনাথ : না। আমি ত আগেই বলেছি—এ সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোন কৌতূহল এখন নেই।

রত্নেশ্বর : ভালো কথা, রাগিণী দেবী একটা প্রস্তাব করেছেন আমার কাছে—শুনবেন ?

চন্দ্রনাথ : বলুন ?

রত্নেশ্বর : বলছিলেন, আপনার আগ্রহ থাকলে উনি আপনাকে সসম্মানে লক্ষ্ণৌএ নিয়ে যেতে রাজী আছেন।

চন্দ্রনাথ : উদ্দেশ্য ?

রত্নেশ্বর : ওঁর ইচ্ছা, ভদ্র ঘরের মেয়েদের গান শিক্ষার একটা প্রতিষ্ঠান খোলেন। আপনার উপরেই তার ভার থাকবে! আর ইন্দ্রাণী দেবী আপনাকে যে টাকা দিতেন, তার দ্বিগুণ টাকা বৃত্তি স্বরূপ দেবেন। আপনি মত দিলে—এখনি আমার সামনেই লেখা পড়া হয়ে যায়।

চন্দ্রনাথ : মাপ করবেন রত্নেশ্বর বাবু, টাকার মোহ আমার কেটে গেছে। টাকার জন্যে আমাকে যেন আর কোথাও চাকরী স্বীকার করতে না হয়—এই আশীর্বাদই করুন। ওঁকেও আপনি এই কথা বলুন—যেন কিছু মনে না করেন।

রত্নেশ্বরকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া, চন্দ্রনাথের কথার

উত্তর রাগিণী-রূপিনী শ্যামলীই পরিষ্কার বাঙলা ভাষায় যুক্তির সহিত ব'লিয়া চন্দ্রনাথকে আর এক দফা অবাক করিয়া দিল। সে বলিল:

শ্যামলী: আমার মনে করবার কিছু নেই বাবুজী, তবে বলবার কিছু আছে। টাকার মোহ না হয় আপনার কেটে গেছে, কিন্তু শিক্ষার মোহ কি কাটাতে পারবেন? আমি জানি, যাঁরা শিক্ষাব্রতী, বিদ্যার সাধক, তাঁদের কাছে কেউ শিক্ষার্থী হলে, কিছুতেই তাকে ত্যাগ করতে পারেন না।

কথাগুলি চন্দ্রনাথকে বুঝি অভিভূত করিল; তথাপি কথার পীঠে সে উত্তর না করিয়া পারিলনা। কহিল:

চন্দ্রনাথ: আপনি খাঁটি কথাই বলেছেন; শিক্ষাব্রতী কোন শিক্ষার্থীকে ত্যাগ করতে পারেন না, আর সেটা উচিতও নয়। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী;—আমি পেরেছি; এবং আমার পক্ষেই ঐ অন্যায় সম্ভব হয়েছে—শিক্ষা ব্রতের নির্দারুণ অমর্যাদা করেছি আমি।

কৃত্রিম বিস্ময়ের স্বরে শ্যামলী বলিয়া উঠিল:

শ্যামলী: সে কি! আপনি?

চন্দ্রনাথ: হ্যাঁ, সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী! আমিই। ঐ যে শ্যামলী—আপনার মোটরের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল; জানেন—তার জন্যে দায়ী কে? আমি, আমি।...হ্যাঁ, শুনে চমকাবেন না! কাশীতে ও আমার কাছে গান শিখতে চেয়েছিল; তার জন্যে কি আকুতি, মিনতি, সাধ্য সাধনা; কিন্তু আমি ওকে উপেক্ষা করেছিলাম। শুধু কি তাই? ইন্দ্রাণীর মোহে পড়ে...আমি সব ভুলেছিলাম; গৃহ, সংসার, মা, শ্যামলীর মত দরদী—সবই, সবাইকে। আমার সন্ধানে

তিনি কলকাতায় এসেছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রাণীর সামনে আমি তাঁকে চরম অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম !

শ্যামলী : তাই নাকি ?

চন্দ্রনাথ : যাবার সময় শ্যামলী আমাকে বলেছিলেন—ইন্দ্রাণীকে উনি চিনেছেন, আমি চিনতে পারিনি ? সে কথা আমি স্বীকার করছি। শ্যামলী বলেছিলেন···আমার ভুল একদিন ভাঙবে···· সে ভুল যে ভেঙেছে, বুঝতেই পারছেন। এখন আমার জীবনের কি কামনা জানেন ? ....আমার যা কিছু সঞ্চয়···সমস্ত নিঃশেষ করে শ্যামলীকে দেব ; তাঁকে গানে পটিয়সী করে তুলব। আজই আমি শ্যামলীকে নিয়ে কাশী যাবো। একমুখী হয়ে তাঁকে শিক্ষা দেওয়াই হবে আমার এক মাত্র কর্তব্য।

ভাবের আবেগে এমনই মর্মস্পর্শীস্বরে চন্দ্রনাথ কথাগুলি বলিয়া গেল যে, পাশাপাশি দুইটি কক্ষে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে উপস্থিত থাকিয়া যাহারা শুনিতেছিল, প্রত্যেকের চক্ষুগুলিই বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। শ্যামলী তাড়াতাড়ি মুখখানা ঘুরাইয়া পিছনের দিকে চাহিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল। রত্নেশ্বরও এই সময় সহসা মুখখানা শক্ত করিয়া বলিলেন :

রত্নেশ্বর : শ্যামলী মেয়েটির ত তাহলে অন্তর্দৃষ্টি আছে দেখছি। আজ কালকার দিনে লোক চেনাও বড় সহজ ক্ষমতা নয়।

অবনী : কিন্তু যে মেয়ের মনে এত জোর, সে কি তার চন্দরদার মুখে দুটো কড়া কথা শুনেই অভিমানে চলন্ত মোটরের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মঘাতিনী হবার কল্পনাও করতে পারে ?

চন্দ্রনাথ : সব জেনে শুনে তুমিই বা হঠাৎ একথা কি করে—বললে ? নিজের হাতেই ত তুমি তার সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বেধেছিলে ?

শ্যামলী : অবনী বাবুর কথা আমিও মানি। ও মেয়ে কখনই কথার ঘা খেয়ে ও-ভাবে প্রাণটাকে খোয়াতে যেতে পারে না। বরং সেদিনের গানের একলব্যের মতই তার শিক্ষার জেদ নিয়ে গুরুর সঙ্গে বোঝাপড়া করাতে যাওয়াই তাঁর পক্ষে সম্ভব। নয় কি? আপনিও ত মস্ত এক অরগানাইজার, আপনি কি বলেন?

রত্নেশ্বরের দিকে গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া শ্যামলী তাঁহাকে শেষের কথাগুলি বলিল জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে। রত্নেশ্বরও একটু গম্ভীর হইয়া শ্যামলীর কথার সমর্থনের উদ্দেশ্যেই চন্দ্রনাথের পানে অপাঙ্গে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন :

রত্নেশ্বর : বটেই ত। বিশেষতঃ সেটা সম্ভব হলে চন্দ্রনাথ বাবুকে আর কেঁচেগণ্ডুষ করতে হয় না। অর্থাৎ, শিষ্যাকে গড়ে তোলবার জন্যে আবার নতুন করে কোমর না বেঁধে, একলব্যের মত সাধনাসিদ্ধ শিষ্য পেয়ে লাভাবানই হন!

শ্যামলী : আমার গানগুলিও তাহলে আর রূপকথার দলে পড়ে না— চোখে দেখা বাস্তবকাহিনী হয়ে দেশশুদ্ধ সবাইকে চমকে দেয়। লোকের মুখে মুখে রটে যায়—এযুগেও একলব্যের মত জেদী ছেলে না থাকলেও মেয়ে অন্তত আছে।

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া যে-দৃষ্টিতে এখন এই মেয়েটি চন্দ্রনাথের দিকে তাকাইল—সে দৃষ্টি, চোখের সেই ভঙ্গি—চন্দ্রনাথের চোখে ত অপরিচিত নয়! এতক্ষণ পরে চন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিল, এই ধরণের কথাগুলি শুনিয়া এবং এই রহস্যময় সুপরিচিত দৃষ্টির বিচিত্র আভায় তাহার অন্তরেও চাঞ্চল্য জাগিল। অতি বিস্ময়ে বিহ্বলভাবে চন্দ্রনাথ একবার রত্নেশ্বর, একবার অবনী ও পরক্ষণে আবার রাগিণী দেবীর মুখের দিকে চাহিয়া

তাহাদের কথার অর্থ উপলব্ধি করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে তাহার কণ্ঠ দিয়া ধীরে ধীরে সন্দেহের সুরে অসংলগ্নভাবে প্রশ্ন নির্গত হইল :

চন্দ্রনাথ : এসব কথার অর্থত আমি বুঝতে পারছি না! আমি কি তাহলে···

চন্দ্রনাথের মুখের কথা সমাপ্ত হইতে পারিল না—বাধিয়া গেল নারী কণ্ঠের অতি পরিচিত তীক্ষ্ণহাসির খিল খিল শব্দে। মুখ তুলিয়া চন্দ্রনাথ নীরবে পরিপূর্ণ দৃষ্টি এতক্ষণে নিবদ্ধ করিল বিচিত্র রত্নালঙ্কারে আবৃত এই আশ্চর্য মেয়েটির সুগৌর মুখখানির দিকে। হাসির রেশ থামিলে শ্যামলীও এতক্ষণে তাহার স্বভাবসিদ্ধ স্বরে বিধাইয়া বিধাইয়া বলিতে থাকিল :

শ্যামলী : ভাবতাম, কলকাতায় এসে চন্দরদার জড়তা কেটে গেছে, ইন্দ্রাণীর মত চালিয়াত মেয়ের সংস্পর্শে অন্তত চটপটে হয়ে উঠেছেন! কিন্তু এখন দেখছি, শিষ্যিকে মই দিয়ে উঁচুতে তুলে দিলেও, নিজে ঠিক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছেন!····

কথাগুলি বলিতে বলিতেই এক ঝটকায় সুকৌশলে শ্যামলী মুখের অলঙ্কারগুলি নিশ্চিহ্ন করিতেই, চন্দ্রনাথ অতি বড় উল্লাসে চমৎকৃত হইয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিয়া উঠিল :

চন্দ্রনাথ : শ্যামলী—তুমি শ্যামলী! রাগিণী দেবী নও···তুমি···তুমি...,

চন্দ্রনাথের কথায় বাধা দিয়া শ্যামলী বলিতে লাগিল অসঙ্কুচিত স্বরে :

শ্যামলী : আচ্ছা, এখন ত শ্যামলী পোড়ারমুখীর ওপরে খুব দরদ দেখছি! ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসেছ তার আবদার রক্ষা করবে। আসলে কিন্তু তার পণটিই ভুলে গেছ! যদি মনে থাকত তোমার—গানের আসরে একলব্যকে দেখেই সব ধাঁধা কেটে

যেত। জেদ করে বলেছিলাম মনে নেই—তুমি গান না শেখালেও, তোমার ভাঁড়ারে যত পুঁজি আছে, সব শিখে নিয়ে তোমাকে দেউলে করে দেব? তুমি অবিশ্যি গ্রাহ্য করনি; কিন্তু তখন থেকেই চলতে থাকে—এই নতুন একলব্যের সাধনা। জানো, তুমি যে গান গাইতে, আড়াল থেকে আমি তা কণ্ঠস্থ করতাম; তোমার খাতা থেকে স্বরলিপি তুলে নিযে সাধতাম—তোমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে মনে মনে গাইতাম তোমার প্রত্যেক গান—এই ছিল আমার সাধনা। অথচ, এক মঙ্গলদা ছাড়া আর কেউ বাড়িতে জানত না। আমার জেদ আমি রেখেছি। তোমার সমস্ত পুঁজি উজোড় করে নিয়েও—আরো অনেক পুঁজি আমি পেয়েছি। এ আমার সাধনার ধন; কিন্তু উপলক্ষ তুমি; তাই তুমিই আমার গানের গুরু। এখন আমার শিক্ষা, দীক্ষা, বিদ্যা, নাম, খ্যাতি, যশ—সবই তোমার পায়ে অঞ্জলি দিয়ে আমি আবার হলাম সেই শ্যামলী।

সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলী নত হইয়া চন্দ্রনাথের পদতলে নিজের মাথাটি নত করিল। চন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্র হস্তে তাহার অবনত শিরটি তুলিয়া সস্নেহে গাঢ় স্বরে বলিল:

চন্দ্রনাথ: আশ্চর্য! কিন্তু আমি যেন এখনো অন্ধকারে রয়েছি। একি সত্য? আমি কি জেগে আছি? কিম্বা স্বপ্ন দেখছি?

এই সময় উভয় কক্ষের মধ্যবর্তি ফোল্‌ডিং করা বড় বড় দরজাগুলি এক সঙ্গে উন্মুক্ত হইতেই কক্ষ মধ্যে উচ্চাসনে উপবিষ্ট পট্টবস্ত্র পরিহিত রামময়ের প্রসন্ন ও প্রশান্ত মূর্ত্তি প্রথমেই সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। বিস্ময়ের উপর এই অভাবনীয় বিস্ময়জনক ব্যাপারে চমৎকৃত চন্দ্রনাথ

নিষ্পলক নয়নে তাকাইয়া এই অপ্রত্যাশিত মানুষটির কথাগুলি শুনিতে লাগিল। তিনি বলিলেন :

রামময় : স্বপ্নের মত হলেও এ ঘটনা সত্য, চন্দ্রনাথ। আমার শেষের সঞ্চয় তোমাকে দেবার জন্যই ডেকেছিলাম। কিন্তু তোমার স্থলে তোমারই প্রতিনিধিরূপে শ্যামলী উপস্থিত হলো আমার কাছে। সর্ব সঞ্চয় ওকেই সমর্পণ করে আমি হয়েছি ধন্য।

চন্দ্রনাথ : আমিও এতক্ষণে নিঃসন্দেহ হলাম গুরুদেব! এখন আমি সব বুঝতে পেরেছি। দর্পহারী মানুষের দর্প রাখেন না—শ্যামলী তার সাধনার বলে আমার দর্পচূর্ণ করেছে—এতেই আমার আনন্দ।

রামময় : এখন মায়ের আশীর্বাদ নাও চন্দ্রনাথ—তোমরা দুজনেই।

দীর্ঘকাল পরে একেবারে চোখের সামনে মহীয়সী মায়ের মূর্তি দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল চন্দ্রনাথ। কিছুক্ষণ পরে অস্ফুটস্বরে ডাকিল :

চন্দ্রনাথ : মা!···আমাকে কি ক্ষমা করতে পারবে মা?

শ্যামলী : মা' ছাড়া মন খুলে সব ভুলে ক্ষমা করতে আর কে পারেন? এসো, আমরা দুজনে আগে মায়ের আশীর্বাদ নিই।

চন্দ্রনাথের দুর্বল হাতখানি সবল বাহুতে ধরিয়া তাহাকে লইয়া শ্যামলী মহামায়া দেবীর সম্মুখে গিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল :

শ্যামলী : মাসিমা! আমি পণ করেছিলাম, যেমন করেই হোক আপনার ছেলেকে উদ্ধার করে আপনার হাতে দেব। ভগবান আমার সে মুখ রেখেছেন। এখন আপনি প্রসন্ন মনে আশীর্বাদ করুন।

কথার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রনাথকে লইয়া শ্যামলী ভূমিষ্ঠ হইয়া মহামায়া

দেবীকে প্রণাম করিল। তিনিও সস্নেহে উভয়ের মস্তকে ও গণ্ডে দক্ষিণ হাতের অঙ্গুলির পরশ দিয়া সেই অঙ্গুলি ওষ্ঠপুটে তুলিয়া চুম্বন করিলেন। তাহার পর গদগদস্বরে বলিলেন :

মহামায়া : চন্দ্রকে তুমিই উদ্ধার করেছ মা, চন্দ্র তোমার—আমি ওকে তোমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। তুমি স্বধু নিজের পণ রক্ষা করনি মা, এই সঙ্গে তিন বন্ধুর স্বপ্নকে সত্য করলে। তাঁদেরও আশীর্বাদ তুমি পাবে।

চন্দ্রাবতী ও গীতা এই সময় দুই দিক দিয়া রামময়কে ধরিয়া—ধীরে ধীরে প্রসন্নময়ী জননীর সন্নিকটে নতমুখে দণ্ডায়মান তরুণ-তরুণীর সম্মুখে আসিলেন। চন্দ্রনাথ ও শ্যামলী গুরুদেব ও চন্দ্রাবতীকে প্রণাম করিল। রামময় মহামায়া দেবীর কথার সূত্র ধরিয়া উদাত্তকণ্ঠে বলিলেন।

রামময় : সেই তিন বন্ধুর একজন অতীতের সাক্ষী হয়েই এখানে স্বস্তিবাচন করবার জন্যে উপস্থিত হয়েছে—আর দুজন ওপর থেকে আশীর্বাদ বর্ষণ করছেন।....শ্রীমতী শ্যামলী রাগিণী-রূপিণী হয়ে তাঁর সাধনার সংগ্রামে যেমন হয়েছেন বিজয়িনী, দাম্পত্য জীবনেও ঐ নামেই হোন তিনি গরিবিনী। রাগ-প্রিয়া বলে নয়, গুণবতী ভার্যাও—রাগিণী।....যা কান্তা পতিরতা গুণযুতা, সা কামিনী—**রাগিণী**।

নমস্কার।